

Contributor

Ahmed Nazir

Project Rupkotha

Recommended eBook Reader

Android
***Lithium: EPUB Reader**(Recommended)
* Moon+ Reader Pro

PC
*** Microsoft's own Browser** (Recommended)
[no need any software]
* SumatraPDF

Apple
*** iBooks**

Windows Phone
*** Tucan Reader**

:

Android ব্যবহারকারীদের জন্য অনেকগুলো অ্যাপস আছে Playstore-এ (play.google.com)। যেমন : eReader Prestigio, Universal Book Reader, AlReader, Moon+ Reader Pro, FBReader, Lithium: EPUB Reader ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি ডাউনলোড করে নিয়ে খুব সহজে ইপাব বই পড়া যায়। তবে আমাদের পরামর্শ হলো, আপনি যদি ইপাব বইয়ে কাগজের বইয়ের আবহ পেতে চান তাহলে Lithium: EPUB Reader ব্যবহার করুন। এটি খুব হালকা ও চমৎকার ফিচার সমৃদ্ধ।

Windows Phone **:**

আপনারা যারা Windows Phone ব্যবহার করছেন তারা অ্যাপস স্টোর থেকে Tucan Reader

লিখে সার্চ দিন।

:

কম্পিউটারে Microsoft EDGE Browser ই যথেষ্ট।অযথা কোন Software Install করার প্রয়োজন নাই ।

Sumatra PDFও একটি পিডিএফ রিডার। এটা পিডিএফ রিডার হলেও এর সাহায্যে ePUB এবং Mobi ফাইল পড়া যায়।।

এছাড়া আপনি FBReader ব্যবহার করতে পারেন। এই সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে আপনি ePUB ও Mobi ফাইল কম্পিউটারে পড়তে পারবেন।

উপরের সফটওয়্যার দুটো ছাড়াও Adobe Digital Editions ব্যবহার করে ইপাব পড়া যায়। তবে এক্ষেত্রে বাংলা ইপাবে বাংলা ফন্ট Embed করা থাকতে হবে। নইলে লেখা পড়া যাবে না।

Amazon Kindle Tab :

বর্তমানে কিন্ডেল ফায়ার Android OS এর Customized ভার্সন। ফলে এটিতে যেমন Android APK ব্যবহার করা যায়, তেমনি Amazon Store থেকেও অ্যাপস ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যায়। আপনি যদি কিন্ডেলে Android Apps ব্যবহার করতে চান তবে উপরে Android Apps তালিকা থেকে যেকোনো একটি অ্যাপের অফলাইন APK ডাউনলোড করে নিন। আর যদি Amazon থেকে ডাউনলোড করতে চান, তবে eLibrary Manager Basic এই অ্যাপটি ব্যবহার করুন।

আর আপনি যদি Kindle এর অন্যান্য ভার্সন ব্যবহার করে থাকেন তবে লাইব্রেরি থেকে বই ডাউনলোডের সময় Mobi ফাইলটি ডাউনলোড করুন। Mobi ফাইল Kindle Paperwhite কিংবা এই ধরনের অন্যান্য ডিভাইসে কোনো রকম সফটওয়্যার ছাড়াই পড়তে পারবেন। এছাড়া বই পড়ার অন্যান্য ডিভাইস যেমন : Kobo, Sony Reader, PocketBook Reader ইত্যাদি রিডারেও Mobi ফাইল কোনো রকম সফটওয়্যার ছাড়াই পড়া যাবে। ক্ষেত্র বিশেষে ডিভাইসভেদে ফন্ট নাও সাপোর্ট করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে করার কিছু নেই।

Apple :

iPhone কিংবা iPad এ ইপাব বই পড়ার জন্য iBooks অ্যাপ ব্যবহার করুন।

Acknowledgment

About Contributor
Ahmed Nazir

More Books

একটি মহৎ আন্দোলন যার লক্ষ্য ৫০,০০০ বাংলা বইকে ইবুকে রুপান্তর করা

rupkotha

About Rupkotha

Be Volunteer

Database
eBanglaLibrary

" ,

"

About Contributor

Hi,

আমি একটা । শুনতে অবাক লাগছে, তাই না। আমাকে বানিয়েছে Ahmed Nazir . আমার কাজ eBanglaLibrary এর মত ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তা ইপাব বই তৈরিতে সাহায্য করা। আমি তো আমার ঠিকভাবেই করছি। তবে আমারো কিছু ভুল হয়। (আমাকে কে বানিয়েছে দেখতে হবে না!!!) Mr. Nazir কে বলেছি,আমার বানানো ইপাবটি যেন একবার দেখে ঠিক করে। খুব অল্প সময়ের কাজ। কিন্তু তার মত অলস আর একটিও দেখি নাই। যদি বইতে কোন ভুল থাকে তাহলে তার দায় মিস্টার নাজিরের।

আমার তো সংশোধনের ক্ষমতা নেই। তাই কোন ভুল পেলে বা পরামর্শ বা কোন অনুরোধ থাকলে দয়া করে Ahmed Nazir এর সাথে যোগাযোগ করুন ।

suggestions are welcome

- Ahmed Nazir
- **Email**

( )
।
।
।
Github ।
,
।

–

বাংলা দেশের বহুপ্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায়, সেকালে ময়ূরাক্ষী নদীর একটি সখী-নদী ছিল; কজঙ্গলের পর্বতসানু হইতে নিঃসৃত হইয়া নদীটি কর্ণসুবর্ণ নগরের নিকট ময়ূরাক্ষীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। তারপর দুই সখী একসঙ্গে কিছুদূর দক্ষিণে গিয়া ভাগীরথীর স্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় নদীটি এখন আর নাই; হয়তো মজিয়া শুকাইয়া গিয়াছে, হয়তো অন্য নামে অন্য খাতে বহিতেছে। তাহার পুরাতন নামও মানুষের স্মৃতি হইতে মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ হইতে অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বে এই নদীর নাম ছিল ময়ূরী, চলিত কথায় মৌরী নদী। গৌড়বঙ্গের মহাসমৃদ্ধ রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল ময়ূরাক্ষী, মৌরী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে।

মৌরী নদী ময়ূরাক্ষী অপেক্ষা ক্ষীণা। বর্ষায় তাহার জল দুকূল ছাপাইয়া যায়, কিন্তু ব্যাপগমে আবার জলধারা শীর্ণ ও স্বচ্ছ হইয়া খাতের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসে। তখন আর তাহার বুকে বড় নৌকা চলে না, তাহার তীররেখার পাশে পাশে মানুষের পদচিহ্ন-মসৃণ পথ জাগিয়া ওঠে।

এই পদাঙ্কচিহ্নিত রেখা ধরিয়া উজান পথে গমন করিলে মৌরীর তীরে ছোট ছোট গ্রাম দেখা যায়। রাজধানী হইতে যত দূরে যাওয়া যায় গ্রামের সংখ্যা ততই বিরল হইয়া আসে। অবশেষে কর্ণসুবর্ণ হইতে অনুমান বিংশ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে একটি গ্রামে আসিয়া পথ শেষ হয়। ইহাই শেষ গ্রাম, ইহার পর আর গ্রাম নাই।

গ্রামটি আভীরপল্লী; নাম বেতসগ্রাম। ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্বেকার গৌড়দেশের এক প্রান্তে মৌরী নদীর তীরে এই ক্ষুদ্র গ্রামের কয়েকটি নরনারীকে লইয়া এই কাহিনী।

আভীরপল্লীর বেতসগ্রাম নামটি সার্থক। নদী ও গ্রামের ব্যবধানস্থলটুকু ঘন বেতসবনে পূর্ণ। নদীর পূর্বতীরে উচ্চ বাস্তুভূমির উপর গ্রাম প্রতিষ্ঠিত, গ্রাম হইতে বেতসবনের ভিতর দিয়া নদীতে যাইতে হয়। নদীর সরসতায় পুষ্ট বেতসলতাগুলি পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া ঊর্ধ্বে বিতান রচনা করিয়াছে; যেন এক একটি

নিভৃত কুটির কক্ষ। মধ্যাহ্নেও এই কুঞ্জ-কুটিরগুলির অভ্যন্তরে সূর্যের তাপ প্রবেশ করে না; ভূমিতলে স্খলিত পত্রের কোমল আস্তরণ সুখশয্যা রচনা করে।

এই বঞ্জুল-কুঞ্জগুলি গ্রামের বিরাম নিকেতন। এখানে বালক-বালিকারা লুকোচুরি খেলা করে; ক্লান্ত কিষাণ দ্বিপ্রহরে নিদ্রাসুখ উপভোগ করে; কিশোরী সখীরা গলা ধরাধরি করিয়া মনের কথা বিনিময় করিতে যায়; কদাচিৎ কন্দর্পপীড়িত যুবকযুবতী গোপনে সংকেতকুঞ্জে অভিসার যাত্রা করে। প্রকৃতির কোলে সহজ মধুর মন্থর জীবনযাত্রা; জটিলতা নাই, আড়ম্বর নাই, উদ্বেগ নাই। মহাকাল এখানে অতি মৃদুচ্ছন্দে পদপাত করেন।

গ্রামের পশ্চিমদিকে যেমন বঞ্জুলবন ও মৌরী নদী, দক্ষিণদিকে তেমনি ইক্ষু ও ধানের ক্ষেত। ধান্য ইক্ষু গোধন এই তিনটি গ্রামের প্রধান সম্পদ। ধান্য হইতে যে চাউল হয় তাহা গ্রামেই থাকে। বাঙালী চিরদিন অন্নভোজী জীব; ভাত তাহার অন্ন, ভাত তাহার পানীয়। বাঙালীই প্রথম ভারতে ভাত হইতে তীব্র পানীয় প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল।

তারপর গোধন হইতে আসে ঘৃত নবনী; আর ইক্ষু হইতে গুড়। এই গুড়ই দেশের প্রাণবস্তু; গুড় হইতেই দেশের নাম গৌড়। আভীরগণ ঘৃত নবনী ও গুড় ভারে বহন করিয়া মৌরীর তীরপথ ধরিয়া ভিন্ন গ্রামে যায়, কখনও বা কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত উপস্থিত হয়। নগরে কড়ি কার্ষাপণ দ্রক্ষের বিনিময়ে পণ্য বিক্রয় করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসে। কেহ বধূর জন্য রূপার কর্ণফুল আনে, কেহ বা শিশুর জন্য রঙীন ক্রীড়াপুত্তলি লইয়া আসে। এইভাবে বহির্জগতের সহিত সূক্ষ্ম যোগসূত্র রাখিয়া বেতসগ্রামের নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রা চলিতে থাকে।

গ্রামের উত্তরে বাথান; সম্মিলিত ধেনুপালের আশ্রয়। ইহার পর কিছুদূর হইতে জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশই পলাশ, অন্যান্য বৃক্ষও আছে। নিবিড় তরুশ্রেণী বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া কজঙ্গলের পার্বত্য উষরতায় লীন হইয়া গিয়াছে। অত দূরে গ্রামের কেহ যায় না। মেয়েরা পলাশবনে যায় লাক্ষাকীটের সন্ধানে; লাক্ষাকীট হইতে আলতা হয়। লাক্ষার রসে চরণ রঞ্জিত করিয়া সন্ধ্যাকালে গোপকন্যারা বাথানে গো-দোহন করে; তারপর কলসী কক্ষে ঘরে ফিরিয়া আসে।

গ্রামের পূর্বদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমতল প্রান্তর—মাঠের পর মাঠ, তৃণাঞ্চিত শ্যামল চারণভূমি। এখানে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত শষ্পরণনিরত গোধন বিচরণ করে, বেণুকহস্ত রাখাল বালক খেলা করে।

এই ত্রিপ্রান্তর মাঠের পূর্বতম সীমায় উদ্বেলতরঙ্গময়ী ভাগীরথী উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত। তখন ইহাই ছিল জাহ্নবীর মূল ধারা, পদ্মা ছিল সংকীর্ণ উপশাখা মাত্র। এই পথে উত্তর ভারতের বাণিজ্য সমুদ্রে যাইত। চম্পা মুগগিরি পাটলিপুত্র, এমন কি বারাণসী হইতে পণ্যভারমন্থর বাণিজ্যতরী শুভ্র পাল তুলিয়া জাহ্নবীর স্রোতে দুলিতে দুলিতে ভাসিয়া যাইত। বাংলার নৌবাহিনী বন্দরে বন্দরে পাহারা দিত, শুল্ক আদায় করিত।

স্থলপথেও উত্তর ভারতের সহিত বাংলার যোগ ছিল। গঙ্গার পশ্চিম তীরের সমান্তরালে অশ্মাচ্ছাদিত রাজপথ তাম্রলিপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ণসুবর্ণের পাশ দিয়া উত্তরে চলিয়া গিয়াছিল, উদুম্বরি পার হইয়া কজঙ্গলের গিরিবুযহ ভেদপূর্বক অযোধ্যা পর্যন্ত গিয়াছিল। এই পথে সার্থবাহ অন্তর্বণিকেরা যাতায়াত করিত, তীর্থযাত্রীরা পদব্রজে পুণ্য আহরণে বাহির হইত; কচিৎ চীনদেশ হইতে আগত পরিব্রাজক বুদ্ধের স্মৃতিপূত

লীলাস্থলগুলি দেখিয়া বেড়াইতেন।

কিন্তু মৌরীতীরের ক্ষুদ্র ঘোষপল্লী হইতে এই নাগরিক বৈভবপ্রবাহ বহু দূরে।

একদিন হেমন্তের পূর্বাহ্নে বেতসগ্রামে ইক্ষুপর্ব আরম্ভ হইয়াছিল। আকাশে সোনালী রৌদ্র, বাতাসে মধুর কবোষ্ণতা। শালিধান্য ইতিপূর্বে ক্ষেত হইতে মরাইয়ে উঠিয়াছে। আজ প্রথম আখ মাড়াই আরম্ভ।

গ্রামের মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত মাঠ। এই মাঠটিকে গ্রামের যৌথ কুটির-প্রাঙ্গণ বলা চলে; খড়-ছাওয়া মাটির কুটিরগুলি তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আছে। এই মাঠের কেন্দ্রস্থলে আজ ইক্ষুযন্ত্র বসিয়াছে। ইক্ষুযন্ত্রের দেবতা পণ্ডাসুর পূজা পাইয়াছেন। তারপর গ্রামের ছেলে-বুড়া স্ত্রীপুরুষ আনন্দে মাতিয়াছে।

কৃষাণগণ ক্ষেত্র হইতে আঁটি আঁটি ইক্ষুদণ্ড আনিয়া পূর্বেই স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়াছিল; সেই ইক্ষু এখন নিষ্পেষিত হইয়া তরল রসের আকারে বাহির হইয়া আসিতেছে। রমণীরা কলসীতে রস ধরিতেছে, আর সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া পান করিতেছে। মাটির ভাণ্ডিকায়, নারিকেল ও বিশ্বফলের খোলায় স্নিগ্ধ সফেন রস লইয়া সকলে পরস্পরকে দিতেছে, নিজেরাও গলাধঃকরণ করিতেছে। আজিকার রস হইতে গুড় হইবে না; সকলে কেবল রস পান করিয়া আনন্দ করিবে। যুবতীরা নাচিবে, প্রৌঢ়ারা অশ্লীল গান গাহিবে, পুরুষেরা ঢোল ডুকি বেণু বাজাইয়া যথেচ্ছা মাতামাতি করিবে। আজ কাহারও ঘরে হাঁড়ি চড়ে নাই।

আগামী কল্য হইতে রীতিমত গুড় প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হইবে। ইক্ষুযন্ত্রের চারিপাশে সারি সারি আখা জ্বলিবে; আখার উপর অগভীর বৃহৎ কটাহে মেয়েরা রস পাক করিবে। রস গাঢ় হইয়া শেষে সোনার বর্ণ ধারণ করিবে। ইহাই বাংলা দেশের খাঁটি সোনা। বাংলার গ্রামে গ্রামে। এই সোনা উৎপন্ন হইয়া অর্ধেক পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে এবং ধাতব স্বর্ণ হইয়া ফিরিয়া আসে।

বেতসগ্রামের অধিবাসী শতাধিক পরিবারের মধ্যে অধিকাংশই গোপ জাতি; কিন্তু কর্মকার কুম্ভকার তন্তুবায় প্রভৃতি অন্য জাতিও আছে। সকলেই ভূমিজীবী; অবসরকালে জাতিধর্ম পালন করে। গ্রামে জাতিভেদ বেশি প্রখর নয়, সকলে একত্র পানাহার করে; তবে বিবাহের সময় জাতি দেখিতে হয়। তাহাতেও খুব বেশি কড়াকড়ি নাই; কদাচিৎ অসবর্ণ সংযোগ ঘটিয়া গেলে গ্রামপতিরা ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া বা দুই চারি পণ দণ্ড লইয়া ক্ষান্ত হন, কঠিন শাস্তির বিধান নাই। এইরূপ শৈথিল্যের কারণ, যে-সময়ের কথা সে সময়ে জাতের বন্ধন বাঙালীর সর্বাঙ্গে এমন নাগপাশ হইয়া বসে নাই। বিশেষত এই প্রান্তিক পল্লীতে উচ্চবর্ণের কেহ বাস করে না। যাহারা বাস করে তাহাদের শ্যামল দেহে আর্য রক্তের সংস্রব যেমন অতি অল্প, তাহাদের মনে আর্যনীতির প্রভাবও তেমনি শিথিলমূল; বৈদিক সংস্কার এখনও তাহাদের প্রাণে শিকড় গাড়িতে পারে নাই।

গ্রামের বাহিরে অশ্বত্থামূলে যে দেবস্থান আছে সেখানে দুইটি দেবতার প্রস্তর মূর্তি পাশাপাশি দণ্ডায়মান রহিয়াছে দেখা যায়। একটি চক্ৰস্বামী বিষ্ণুর বিগ্রহ, অন্যটি শাক্যমুনি বুদ্ধের মূর্তি। গ্রামবাসীরা তিলতুলসী দিয়া চক্ৰস্বামীর অর্চনা করে, দুগ্ধতণ্ডুল দিয়া শাক্যমুনির সন্তোষ বিধান করে; কাহারও প্রতি পক্ষপাত নাই। এই দেবস্থানের যিনি স্বয়ংবৃত পূজারী তাঁহার নাম চাতক ঠাকুর। তিনি ব্রাহ্মণ কি বৌদ্ধ তাহা কেহ জানে না; তাঁহার বয়স ও জাতি দুই-ই রহস্যের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। কিন্তু চাতক ঠাকুরের কথা পরে

হইবে।

আজিকার উৎসব হইতে ইতর প্রাণীরাও বাদ পড়ে নাই। গ্রামস্থ ছাগলের পাল ইক্ষুদণ্ডের সবুজ পাতাগুলি চিবাইতেছে। আকাশে অসংখ্য কাক ও শালিক পাখি কলরব করিয়া উড়িতেছে, এবং সুবিধা পাইলেই ভাণ্ডে চঞ্চু ডুবাইয়া কিঞ্চিৎ নেশা করিয়া লইতেছে। বেলা যত বাড়িতেছে, উৎসবকারী মানুষগুলির নেশায় তত পাক ধরিতেছে। গ্রামের মহত্তর ও প্রবীণগণ মাঠের একস্থানে দল পাকাইয়া বসিয়াছেন, পাশে কয়েকটি সফেন রসের কলস। তাঁহারা রসাস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুন্টি ও কড়ি খেলিতেছেন। পণ রাখিয়া হারজিত চলিতেছে। মাঝে মাঝে হর্ষধ্বনি উঠিতেছে। মাঠের অন্য অংশে যুবতীরা হাত ধরাধরি করিয়া একটি রসপূর্ণ কুম্ভের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। যুবতীরা সকলেই বিবাহিতা; তাহাদের মধ্যে যাহারা সন্তানবতী তাহারা সন্তান কাঁখে করিয়াই নাচিতেছে। অদূরে যুবকেরা বাহ্বাস্ফোট করিয়া পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, মল্লক্রীড়া করিতেছে, যুবতীদের লক্ষ্য করিয়া রঙ্গ-কৌতুক করিতেছে। চারিদিকে সঙ্কোচহীন প্রাণখোলা মদবিহ্বলতা। আজিকার দিনে ইহাই চিরাচরিত রীতি।

এই সার্বজনীন মদবিহ্বলতায় গ্রামের দুইটি নারী কেবল যোগদান করে নাই; গোপা ও তাহার কন্যা রঙ্গনা। মাঠের উত্তরপ্রান্তে তাহাদের কুটির; অন্যান্য কুটিরের মতই বেতের চঞ্চালীতে মাটির লেপ দেওয়া খড়-ছাওয়া ক্ষুদ্র কুটির। গোপা কুটিরের দেহলিতে বসিয়া তুলার পিঞ্জা হইতে টাকুতে সূতা কাটিতেছিল। আর রঙ্গনা গৃহকর্মের ছলে বারবার গৃহের ভিতর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে ভিতরে আনাগোনা করিতেছিল। তাহার মন ও কৌতূহলী দৃষ্টি পড়িয়া ছিল মাঠের ঐ রঙ্গলীলার দিকে।

গোপার বয়স প্রায় চল্লিশ। দেহের গঠন কৃশ এবং দৃঢ়; গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। মুখের ডৌল ভাল, চোখ দুটি বড় বড়। কিন্তু মুখে চোখে তীক্ষ্ণ কঠিনতা; ওষ্ঠাধরের সূক্ষ্ম রেখা দৃঢ়সংবদ্ধ। গোপা যৌবনকালে সুন্দরী ছিল; কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সেই শ্রী কমনীয়তায় রূপান্তরিত হয় নাই, বরং কর্কশ কঠোর শ্রীহীনতায় পরিণত হইয়াছে। যাহারা বিশ বছর আগে গোপার যৌবনশ্রী দেখিয়াছিল তাহারা বলাবলি করিত, গোপা এক সময় নারী ছিল— এখন যেন পুরুষ হইয়া গিয়াছে। কথাটা মিথ্যা নয়; যে স্ত্রীলোকের ঘরে পুরুষ নাই তাহার প্রকৃতি পুরুষভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে ইহা স্বাভাবিক। উপরন্তু গোপার চরিত্রে নারীসুলভ নমনীয়তা কোনও কালেই ছিল না।

গোপা যৌবনকালে সুন্দরী ছিল, তাহা গ্রাম্য আদর্শে। কিন্তু তাহার মেয়ে রঙ্গনাকে দেখিলে গ্রাম্য নাগরিক কোনও আদর্শই মনে থাকে না, কেবল বিস্ময়োৎফুল্ল হইয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। মায়ের মতই দীঘল কৃশাঙ্গী; কিন্তু সবাঙ্গে রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। মাথার আকুঞ্চিত কেশ হইতে পায়ের রক্তিমাভ নখ পর্যন্ত যেন কালিদাসের শকুন্তলা রূপোচ্চয়েন বিধিনা মনসা কৃতানু। গায়ের রঙ কেবল দুধে-আলতা মিশাইয়াই সৃষ্ট হয় নাই, তাহার সহিত কাঁচা সোনাও মিশিয়াছে।

বেতসগ্রামে এই বিদ্যুল্লতার মত সুন্দরী মেয়ে কোথা হইতে আসিল? গ্রামে এমন গায়ের রঙ তো আর কাহারও নাই। এখানে গায়ের রঙ অধিকাংশই ঘনশ্যাম অথবা উজ্জ্বল শ্যাম; দুই চারিটি নবদূবশি্যাম, কদাচিৎ এক-আধটি গোধূমবর্ণ। এই গ্রামের মেয়ে রঙ্গনা এমন অপূর্ব পাণ্ডুশ্রী কোথায় পাইল?

প্রশ্নটি কেবল আলঙ্কারিক প্রশ্ন নয়; একদিন এই প্রশ্ন গ্রামের সকল স্ত্রী-পুরুষকে উচ্চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সে যাক। এত রূপ লইয়াও রঙ্গনার এখনও বিবাহ হয় নাই। গ্রামের নিয়ম, কন্যার যৌবন-

উন্মেষ হইলেই বিবাহ হইবে। কিন্তু রঙ্গনা পূর্ণযৌবনা হইয়াও এখনও

অবিবাহিতা।

রঙ্গনা বারবার ঘর-বাহির করিতেছিল, আর তাহার সভৃষ্ণ চক্ষু দুটি ছুটিয়া যাইতেছিল ঐ মাঠের দিকে যেখানে তাহারই সমবয়স্কা মেয়েরা পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া নূপুর কঙ্কণ বাজাইয়া নৃত্য করিতেছে। রঙ্গনার চোখের দৃষ্টি হইতে মনে হইতেছিল সে বুঝি এখনি ছুটিয়া গিয়া ওই নৃত্যাবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িবে; কিন্তু আবার অভিমানে অধর দংশন করিয়া সে ঘরের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহার যৌবনভরা মনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদ যেন ঐখানে পুঞ্জিত হইয়া আছে; কিন্তু ওখানে তাহার যাইবার উপায় নাই।

গোপা সূতা কাটিতে কাটিতে মেয়ের এই অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহার কঠিন দৃষ্টি মাঝে মাঝে মাঠের দিকে যাইতেছিল; অধরের দৃঢ়বদ্ধ রেখা বাঁকিয়া উঠিতেছিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে আবার টাকুতে মন দিতেছিল।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। আকাশের দিকে একবার দৃষ্টি তুলিয়া গোপা ডাকিল—রাঙা!

রঙ্গনা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোপা বলিল—তোর ঘরের কাজ সারা হল?

রঙ্গনা বলিল— হাঁ মা।

তবে নদীতে যা। নেয়ে জল নিয়ে আসবি।

যাই মা।

রঙ্গনা কলসী আনিতে ঘরের ভিতর গেল। তাহার একটা চাপা নিশ্বাস পড়িল। যে যখন কলসী কাঁখে কুটির হইতে বাহির হইল তখন গোপাও তাহার পানে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল।

—

কুটির হইতে বাহির হইয়া রঙ্গনা মাঠের দিকে গেল না, যদিও মাঠের ভিতর দিয়াই নদীতে যাইবার সিধা পথ। সে কুটিরের পিছন দিক ঘুরিয়া নদীর পানে চলিল। মাঠের ভিতর দিয়া যাইলে সকলে তাহাকে দেখিতে পাইবে, হয়তো কেহ কিছু বলিবে। তাহাতে কাজ নাই।

চলিতে চলিতে রঙ্গনার কালো চোখ দুটি ছলছল করিতে লাগিল। আবার একটি নিশ্বাস পড়িল।

ক্রমে সে বেতসবনের কাছে আসিয়া পৌঁছিল। এই দিকটা বেতসবনের শেষ প্রান্ত, তেমন ঘন নয়। এখানে ওখানে দুই চারিটা ঝোপ, যত নদীর দিকে গিয়াছে তত ঘন হইয়াছে।

এইখানে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে একটি নিভৃত বেতসকুঞ্জ ছিল; এটি রঙ্গনার নিজস্ব, আর কেহ ইহার সন্ধান জানিত না। পাখির খাঁচার মত চারিদিকে জীবন্ত শাখাপত্র দিয়া ঘেরা নিরালা একটি স্থান; এই স্থানটিকে সযত্নে পরিষ্কৃত করিয়া রঙ্গনা কুটির কক্ষের মতই তক্তকে ঝকঝকে করিয়া রাখিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে যখন ঘরে মন টিকিত না বা হাতে কাজ থাকিত না তখন সে চুপি চুপি এই কুঞ্জে আসিত। কয়েকটি খড়ের আঁটি আগে হইতে কুঞ্জে সঞ্চিত ছিল, তাহাই বিছাইয়া শয়ন করিত। নির্জন দ্বিপ্রহরে পত্রান্তরাল-নির্গলিত সবুজ আলো উপর হইতে ঝরিয়া পড়িত; রঙ্গনা সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া যৌবনের কল্পকুহকময় স্বপ্ন দেখিত। কখনও একজোড়া মৌটুসী পাখি আসিয়া শাখাপত্রের মধ্যে খেলা করিত; কখনও দূর আকাশে শঙ্খচিল ডাকিত। এইভাবে তাহার নিঃসঙ্গ তন্দ্রামন্থর মধ্যাহ্ন কাটিয়া যাইত।

আজ রঙ্গনা মাতার আদেশ অনুযায়ী নদীতে না গিয়া প্রথমে তাহার কুঞ্জে আসিয়া ক্লান্তভাবে কলস নামাইয়া বসিল। মনের মধ্যে যখন অভিমান ও অভীপ্সার মল্লযুদ্ধ চলিতে থাকে তখন শরীর অকারণেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। রঙ্গনা দুই হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মাঠ এখান হইতে অনেকটা দূরে, তবু নৃত্যপরা যুবতীদের কণ্ঠোত্থিত ঝুমুর গান বংশীর সহযোগে তাহার কানে আসিতে লাগিল—

ও ভোমরা সুজন, তুমি কাছে এস না

আমার রসের কলস উছলে পড়ে
কাছে এস না।

রঙ্গনা চক্ষু মুদিয়া ভাবিতে লাগিল— কেন! কেন আমি ওদের একজন নই? কেন সবাই আমাকে দূরে ঠেলে রাখে? কেন আমার বিয়ে হয়নি? কেন আমার মা সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে? কেন? কেন?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে রঙ্গনার জন্মকথা বলিতে হয়।

আঠারো বছর আগে গোপার স্বামী দারুক বেতসগ্রামের অধিবাসী ছিল। গোপার বয়স তখন একুশ-বাইশ; দারুকের বয়স ত্রিশ। কিন্তু তাহাদের সন্তান হয় নাই। এই লইয়া স্ত্রী-পুরুষে কলহ লাগিয়া থাকিত। দারুক রাগী মানুষ, গোপাও অতিশয় প্রখরা; উভয়ে উভয়কে দোষ দিত। গাঁয়ের লোক হাসিতে হাসিতে তামাসা দেখিত।

একদিন বসন্ত কালের প্রভাতে দাম্পত্য কলহ চরমে উঠিয়াছিল। প্রতিবেশীরা কুটির সম্মুখে সমবেত হইয়া বাগযুদ্ধ উপভোগ করিতেছিল এবং শব্দভেদী সমর কখন দোর্দণ্ড রণে পরিণত হইবে উদগ্রীবভাবে তাহারই প্রতীক্ষ করিতেছিল, এমন সময় তাহাদের দৃষ্টি অন্যদিকে আকৃষ্ট হইল। দেখা গেল, গো-রথে আরোহণ করিয়া একজন আগন্তুক গ্রামে প্রবেশ করিতেছে।

গ্রামে বহির্জগৎ হইতে বড় কেহ আসে না, উদ্দীপনা উত্তেজনার অবকাশ বড় অল্প। সুতরাং গ্রামের যে-যেখানে ছিল সকলে গিয়া গো-রথ ঘিরিয়া দাঁড়াইল; স্ত্রীপুরুষ, বালক-বালিকা, কুকুর-বিড়াল, কেহই বাদ গেল না। এমন কি দারুকও দাম্পত্য কলহ ধামাচাপা দিয়া মাঠে আসিয়া জুটিল।

মাঠের মাঝখানে গো-রথ থামাইয়া যিনি অবতরণ করিলেন তিনি একজন রাজপুরুষ, নাম কপিলদেব। অতি সুন্দর আকৃতি, বলদৃপ্ত তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দেহ। পরিধানে যোদ্ধাবেশ, মস্তকে উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণ, কটিদেশে তরবারি। পরমদৈবত শ্রীমন্মহারাজ শশাঙ্কদেবের পক্ষ হইতে ইনি সৈন্য সংগ্রহে বাহির হইয়াছেন।

গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক তখন হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন। রাজ্যবর্ধনের অপমৃত্যুর ফলে উত্তর ভারতে যে আগুন জ্বলিয়াছিল তাহা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। হর্ষবর্ধন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন পৃথিবী গৌড়শূন্য করিবেন, গৌড়-পিশুন শশাঙ্কের রাজ্য ছারখার না করিয়া তিনি নিরস্ত হইবেন না। বছরের পর বছর যুদ্ধ চলিয়াছে; শশাঙ্কের কান্যকুজ পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যসীমা ক্রমশ পূর্বদিকে হটিয়া আসিতেছে। যুদ্ধে ক্রমাগত সৈন্যক্ষয় হইতেছে; তাই নিত্য নূতন সৈন্যের প্রয়োজন। গৌড় রাজ্যের প্রতি গ্রামে প্রতি জনপদে রাজপুরুষগণ পরিভ্রমণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে।

বেতসগ্রামে ইতিপূর্বে কেহ সৈন্য সংগ্রহে আসে নাই, কপিলদেবই প্রথম। কপিলদেবের আকৃতি যেমন নয়নাভিরাম, বচন-পটিমাও তেমনি মনোমুগ্ধকর। তিনি সমবেত গ্রামিকমণ্ডলিকে নিজ আগমনের উদ্দেশ্য সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। গৌড়-গৌরব শশাঙ্কদেব উত্তর ভারতে অগণিত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন, রণদুর্মদ গৌড়সৈন্যের পরাক্রমে আর্যাবর্ত থরথর কম্পমান। যে সকল বীর গৌড়বাসী যুদ্ধে যাইতেছে তাহারা বহু নগর লুণ্ঠন করিয়া স্বর্ণ রৌপ্য মণিমাণিক্য লইয়া ঘরে ফিরিতেছে। এস, কে যুদ্ধে যাইবে— কে অক্ষয়কীর্তি অর্জন করিবে? তে নির্যন্তু ময়া সহৈকমনসো যেষাং অভীষ্টং যশঃ।

প্রথমেই দারুক লাফাইয়া উঠিয়া বলিল— আমি যুদ্ধে যাব।

আরও দুই চারিজন নবীন যুবক তাহার সহিত যোগ দিল। কপিলদেব তাহাদের বলিয়া দিলেন— কোথায় গিয়া রাজসৈন্যদের সহিত মিলিত হইতে হইবে। কপিলদেব নিজে তাহাদের সহিত যাইবেন না, আজ রাত্রে গ্রামে বিশ্রাম করিয়া কল্য প্রাতে কর্ণসুবর্ণে ফিরিয়া যাইবেন।

দারুক লাফাইতে লাফাইতে নিজ কুটিরে ফিরিয়া গিয়া সদর্পে পিঠে ঢাল বাঁধিল, হাতে সুদীর্ঘ বংশদণ্ড লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যাত্রাকালে গোপাকে শাসাইয়া গেল— যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আর একটা বিয়ে করব। দেখি তখন ছেলে হয় কিনা—

গোপা খরশান চক্ষে চাহিল। তাহার জিহ্বায় যে কথাটা উদ্গত হইয়াছিল তাহা সে অধর দংশন করিয়া রোধ করিল। দারুক বীরপদক্ষেপে চলিয়া গেল।

কপিলদেব গ্রামে রহিলেন। গ্রামের মহত্তর সসম্মানে রাজপুরুষকে স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করিলেন। দধি দুগ্ধ ছাগবৎস প্রভৃতি চর্ব্যচুষ্যেরও প্রচুর আয়োজন হইল। রাজপুরুষ মহাশয় কিছুই অবহেলা করিলেন না।

অন্যান্য গুণাবলির সঙ্গে রাজপুরুষ মহাশয়ের আর একটি সদ্গুণ ছিল, সুন্দরী রমণীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হইত। গোপাকে তিনি দেখিয়াছিলেন; তাঁহার অভিজ্ঞ চক্ষের মানদণ্ডে গোপার রূপ-যৌবন তুলিত হইয়াছিল। অবশ্য সামান্যা পল্লীবধূ নগরকামিনীর বিলাস-বিভ্রম কোথায় পাইবে? কিন্তু মধুর অভাব গুড়ের দ্বারা পূরণ করিতে হয়, এরূপ প্রবাদবাক্য আছে। সুতরাং চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? রাজকার্যে ভ্রাম্যমাণ সৈন্য-সংগ্রাহকের মাঝে মাঝে চিত্তবিনোদনেরও তো প্রয়োজন আছে।

সেদিন অপরাহ্নে গোপা নিজের দ্বার-পিণ্ডিকায় বসিয়া তুলার পাঁজ কাটিতেছিল। তাহার অন্তরের ক্রোধ এখনও শান্ত হয় নাই। দারুক তাহাকে মিথ্যা দোষ দিয়া চলিয়া গিয়াছে— ইহার প্রতিশোধ যদি সে লইতে পারিত! কিন্তু সে কী করিবে? নারী তো আর যুদ্ধে যাইতে পারে–

একটি মধুর কণ্ঠস্বর তাহার উত্তপ্ত চিন্তার উপর যেন কোমল করাঙ্গুলি বুলাইয়া দিল— সুচরিতে, তোমার কাছে আমি বড়ই অপরাধী–

গোপা চমকিয়া মুখ তুলিল। দেখিল, কান্তিমান রাজপুরুষ স্মিতমুখে কুটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। গোপা জড়সড় হইয়া চক্ষু নত করিল।

অনাহূত কপিলদেব দেহলীর এক প্রান্তে বসিলেন। দক্ষিণ হইতে ঝিরি ঝিরি বাতাস দিতে আরম্ভ করিয়াছে, গোপার কর্ণে তালপত্রের লঘু অবতংস দুলিতেছে। কপিলদেব স্নিগ্ধকণ্ঠে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কর্তব্যের অনুরোধে মানুষকে কত অপ্রীতিকর কাজ করিতে হয়, কত সুখের সংসারে বিচ্ছেদ ঘটাইতে হয়। গ্রামবধূরা স্বভাবতই পতিপ্রাণা হইয়া থাকে—

এই কথা শুনিয়া গোপা অধরের ঈষৎ ভঙ্গি করিয়া ভ্রূকুটি করিল, কপিলদেব তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি তৃপ্ত মনে অন্য কথা পাড়িলেন। নগরের নানা কথা; গ্রাম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন। গোপা প্রথমে নীরব রহিল, তারপর একাক্ষর উত্তর দিল; শেষে দুই একটি কথা বলিল।

তারপর তাহাদের চক্ষু এক সময় পরস্পর আবদ্ধ হইয়া গেল। চোখে চোখে যে কথার বিনিময় হইল তাহা জীবনের আদিমতম কথা, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না।

কপিলদেব গ্রামে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রত্যুষেই গো রথে আরোহণপূর্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু গ্রামের সতর্ক চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কপিলদেব যে গভীর রাত্রে গোপার কুটিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা একজন বিনিদ্র প্রতিবেশীর চক্ষু এড়ায় নাই। কথাটা কিন্তু কানাঘুষার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল, প্রকাশ্যে কেহ গোপার নামে কোনও রটনা করিতে সাহস করিল না। প্রমাণ তেমন বলবান নয়; গোপা বড় মুখরা; তাহার নামে এরূপ অপবাদ দিলে সেও ছাড়িয়া কথা কহিবে না।

ইহার পর তিন মাস কাটিয়া গেল। গোপার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে সে নিজেই তাহা সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করিল। কাহারও দোষ ধরিবার উপায় ছিল না, তবু গ্রামের কৌতুক-কৌতূহলী রসনা আর একবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। রসিক ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল— ভাগ্যে রাজপুরুষ আসিয়া দারুককে যুদ্ধে পাঠাইয়াছিল তাই তো দারুকের বংশরক্ষা হইল।

দারুক আর যুদ্ধ হইতে ফিরিল না। তাহার সঙ্গীদের মধ্যে একজন ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, মুগগিরির যুদ্ধে দারুক মরিয়াছে। গোপা হাতের শঙ্খ ভাঙ্গিয়া কপালের সিন্দুর মুছিল।

তারপর যথাসময়ে, দারুক যুদ্ধে যাইবার নয় মাস পরে, গোপা এক কন্যা প্রসব করিল। এই ঘটনার জন্য গ্রামবাসীরা প্রস্তুত ছিল, সুতরাং ইহা লইয়া অধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টির কথা নয়। কিন্তু জানা গেল, সদ্যপ্রসূত কন্যাটির গাত্রবর্ণ দুগ্ধফেনের ন্যায় শুভ্র! ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? দারুকের বর্ণ ছিল ধান-সিদ্ধ করা হাঁড়ির তলদেশের ন্যায়, গোপাকেও বড় জোর উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে। তবে কন্যা এমন গৌরাঙ্গী হইল কেন? গোপার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ বড়ই গুরুতর হইয়া উঠিল। এত বড় প্রমাণ হাতে পাইয়া কেহই চুপ করিয়া রহিল না।

কন্যা জন্মিবার একুশ দিন পরে গ্রামের মহত্তর মহাশয় গোপার কুটির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গোপা কুটিরের মধ্যে কন্যা কোলে লইয়া বসিয়া ছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন— সকলে জানতে চাইছে তোমার মেয়ে এমন ফরসা হল কি করে?

গোপা মুখ কঠিন করিয়া বলিল— আমি দেবস্থানে রাঙা ডাব মানত করেছিলাম, তা রাঙা মেয়ে হয়েছে।

মহত্তর মহাশয় বয়সে প্রবীণ, তিনি একটু হাসিলেন। বলিলেন— গোপা-বৌ, আমরা তোমাকে বেশি শাস্তি দিতে চাই না। যা হবার হয়েছে। তুমি পাঁচ কাহন দণ্ড দিলে আর কেউ কিছু বলবে না।

কিন্তু দণ্ড দিলেই প্রকারান্তরে অপরাধ স্বীকার করা হয়। গোপা শক্ত হইয়া বলিল—আমি এক কানাকড়ি দণ্ড দেব না।

মহত্তর বিরক্ত হইলেন। না দাও সমাজে পতিত হবে। তোমার জারজ সন্তানের বিয়ে হবে না। বলিয়া চলিয়া আসিলেন।

ইহার পর সমস্ত গ্রাম গোপার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। গোপা যদি গ্রামের শাসন মানিয়া লইত তাহা হইলে তাহার অপরাধ কেহ মনে রাখিত না, দুদিন পরে ভুলিয়া যাইত। এমন তো কতই হয়। কিন্তু গোপা দণ্ড দিল না; সে ভাঙ্গিবে তবু মচকাইবে না। গ্রামের লোক তাহার স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিল। নষ্ট স্ত্রীলোকের এত তেজ কিসের!

এরূপ অবস্থায় এক নিঃসহায় রমণীর গ্রামে বাস করা কঠিন হইত। কিন্তু দেবস্থানের পূজারী চাতক ঠাকুর দয়ালু লোক ছিলেন; অনাথা স্ত্রীলোক যাহাতে অনাহারে না মরে তিনি সেদিকে দৃষ্টি রাখিলেন। তাঁহার প্রভাবে গাঁয়ের লোকের রাগও কিছু পড়িল। কিন্তু গোপার সহিত গায়ে পড়িয়া কেহ সদ্ভাব স্থাপন করিতে আসিল না। গোপাও শক্ত হইয়া রহিল।

গোপার মেয়ে বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। ফুলের মত সুন্দর টুকটুকে মেয়েটির চাতক ঠাকুরই নাম রাখিলেন— রঙ্গনা। কিন্তু রঙ্গনার সহিত গ্রামের ছেলেমেয়েরা খেলা করে না; তাহারা খেলা করিতে চাহিলে তাহাদের বাপ-মা তাড়না করে। রঙ্গনা কাঁদে, মায়ের কোলে আছড়াইয়া পড়ে। গোপা মেয়েকে বুকে চাপিয়া গলদশ্রুনেত্রে তিরস্কার করে— ওরা তোর সমান নয়। তুই ওদের সঙ্গে খেলবি না।

রঙ্গনা যখন কিশোরী হইল তখন সে নিজেই সমবয়স্কদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতে শিখিল। গ্রামে তাহার সমবয়স্কা যত মেয়ে আছে সকলকে সে চেনে, সকলের নাম জানে; কিন্তু কাহারও সহিত মেশে না। কদাচিৎ নদীর ঘাটে কোনও মেয়ের সঙ্গে দুএকটা কথা হয়, তাহার বেশি নয়। অন্য মেয়েরাও রঙ্গনার সহিত মিলিতে উৎসুক; তাহার রূপের জন্য অনেকেই তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিতা, তবু রঙ্গনা তাহাদের আকর্ষণ করে। সে কেন তাহাদের একজন নয়, কিশোরীরা তাহা ভাল করিয়া জানে না। রঙ্গনাকে লইয়া নিত্য তাহাদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা হয়, কিন্তু নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া কেহই তাহার সহিত সখিত্ব স্থাপন করিতে সাহস করে না।

রঙ্গনার সমবয়স্কদের একে একে বিবাহ হয়। বিবাহে নৃত্যগীত উৎসব হয়। কিন্তু রঙ্গনা তাহাতে যোগ দিতে পারে না। রঙ্গনার বিবাহের কথাও কেহ তোলে না। গ্রামের দুই চারিজন অবিবাহিত যুবক দূর হইতে তাহার পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বটে, কিন্তু বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার সাহস কাহারও নাই। আর, রঙ্গনার সহিত গুপ্ত প্রণয়ের কথা কেহ ভাবিতেই পারে না; গোপার তীক্ষ্ণ চক্ষু ও শাণিত রসনাকে সকলেই ভয় করে।

এইভাবে শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া রঙ্গনা যৌবনে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। শৈশবে নিঃসঙ্গতার বেদনা শিশুই জানে। কৈশোরে সঙ্গিসাথীর অভাব মর্মপীড়াদায়ক। কিন্তু নিঃসঙ্গ যৌবনের অন্তর্দাহ বড় গভীর যন্ত্রণাময়।

–

বেতসকুঞ্জে দণ্ডার্ধকাল বসিয়া থাকিয়া রঙ্গনা উঠিল। আবার কলসী কাঁখে নদীর পানে চলিল।

হেমন্তের মৌরী নদী নিজের খাতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বেশি চওড়া নয়, কিন্তু স্রোতের টান আছে; অদূর পর্বতগুহা হইতে যে দুরন্ত চঞ্চলতা লইয়া বাহির হইয়াছিল তাহা এখনও শান্ত হয় নাই। স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ জল, তল পর্যন্ত সূর্যকিরণ প্রবেশ করিয়াছে; তলদেশে শুভ্র নুড়িগুলি ঝিমি করিতেছে। দুই দিকের উপলবিকীর্ণ তীরভূমি সমতল নয়; কোথাও প্রক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড মাথা তুলিয়া আছে, কোথাও প্রবণ বেলাভূমি ক্রমাবনত হইয়া নদীতে মিশিয়াছে।

এইরূপ একটি বেলাভূমিতে বেতসগ্রামের স্নান-ঘাট। বাঁধানো ঘাট নয়, নুড়ি বিছানো স্বাভাবিক ঘাট। কিন্তু আজ ঘাটে কেহ নাই; এ সময় যাহারা ঘাটে আসিত তাহারা নৃত্যগীতে মত্ত।

রঙ্গনা আসিয়া কলস পূর্ণ করিয়া ঘাটে রাখিল, তারপর স্নান করিতে জলে নামিল। এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া সে অন্যমনস্কভাবে চুলের বিননি খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে আহ্বান আসিল — রাঙা মেয়ে! রাঙা মেয়ে!

চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া রঙ্গনা দেখিল— দক্ষিণ দিক হইতে নদীর তীর ধরিয়া চাতক ঠাকুর আসিতেছেন। তাঁহার এক হাতে কয়েকটি সনাল পদ্ম, অন্য হাতে পদ্মপাতার একটি ঠোঙা।

চাতক ঠাকুরের বয়সের যদিও কেহ হিসাব রাখে না তথাপি তাঁহার দেহষ্টি এখনও অটুট ও কর্মক্ষম আছে। বেণুবংশের ন্যায় শীর্ণ দীর্ঘ আকৃতি, গাত্রবর্ণ শুষ্ক তালপত্রের ন্যায়। সুদূর অতীতে মাথায় ও মুখে হয়তো চুল ছিল, এখন একটিও নাই। তুণ্ড সম্পূর্ণ দন্তহীন। তবু কুঞ্চিত রেখাঙ্কিত মুখে একটি অনির্বচনীয় প্রশান্ত শ্ৰী আছে। অঙ্গে বস্ত্রাদির বাহুল্য নাই, কটিতটে কেবল একটি কষায়বর্ণ বস্ত্র জড়ানো; তাহাও

হাঁটু পর্যন্ত। সেকালে স্ত্রীপুরুষ কাহারও কটিবাস হাঁটুর বেশি নীচে নামিত না; তবে মেয়েরা বসনাঞ্চল দিয়া ঊর্ধ্বাঙ্গ আবৃত করিত। আগুলফলম্বিত শাটী পরিধানের রীতি ছিল না।

রঙ্গনা চুলগুলি হাত-ফের দিয়া জড়াইতে জড়াইতে তীরের দিকে ফিরিল— ঠাকুর! কোথায় গিয়েছিলেন?

চাতক ঠাকুর রঙ্গনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রসন্ন হাসিয়া বলিলেন— তোর জন্য কি এনেছি দ্যাখ। মৌরলা মাছ! বলিয়া পদ্মপাতার ঠোঙা খুলিয়া দেখাইলেন।

রঙ্গনার মুখেও হাসি ফুটিল। মৌরী নদীতে মাছ আছে; কিন্তু যে ধরে সেই খায়, বিতরণ করে না। রঙ্গনার ভাগ্যে মৌরলা মাছ বড় একটা জুটিয়া ওঠে না। অথচ তখনকার দিনে মোরল মচ্ছ সহযোগে ওগগরা ভত্তা অতি উপাদেয় ভোজন বিলাস বলিয়া পরিগণিত হইত। বহু শতাব্দী পরেও রসনা-রসিক কবিরা কদলী-পত্রের তপ্ত ভাত, গব্য ঘৃত, মৌরলা মাছ ও নালিতা শাকের গুণ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইতেন।

চাতক ঠাকুরের হাত হইতে ঠোঙা লইয়া রঙ্গনা কলসীর পাশে রাখিল, হাসিমুখে বলিল— মাছ আনতে গিয়েছিলেন?

চাতক ঠাকুর বলিলেন— মাছ আনতে যাই নি। ভোরবেলা উঠে ভাবলাম, আজ পর্বদিন, ঠাকুরদের পায়ে পদ্মফুল দেব, যাই দক্ষিণের বিল থেকে পদ্মফুল তুলে আনি। তিন কোশ বৈ তো নয়। গিয়ে দেখি জলগাঁয়ের জেলেরা মাছ ধরছে। তারাই পদ্মফুল তুলে দিলে, আর চারটি মৌরলা মাছও দিলে। তা ভাবলাম, নিয়ে যাই, রাঙা মেয়ে খাবে।

অদ্ভুত মানুষ এই দেবস্থানের পূজারী; ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া এক হাতে দেবতার ফুল অন্য হাতে মৌরলা মাছ লইয়া ফিরিয়াছেন।

চাতক ঠাকুর যে সহজ সাধারণ মানুষ নয়, সত্যই একজন অদ্ভুত মানুষ, তাহা শুধু বেতসগ্রামের লোক নয়— দক্ষিণের আরও পাঁচখানা গ্রামের লোক জানিত। উপরন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার উপর দেবতার ভর হইত; তখন তিনি দেবাবিষ্ট হইয়া অতি আশ্চর্য বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেন। এই প্রত্যক্ষ দর্শনের কাহিনী শুনিয়া গ্রামবাসীরা অবাক হইয়া যাইত। প্রবীণ ব্যক্তিরা বলিত, ঠাকুরের বায়ু-রোগ আছে, থাকিয়া থাকিয়া বায়ু কুপিত হয়।

ঠাকুরের বায়ু কুপিত হওয়ার কথা রঙ্গনা মায়ের মুখে শুনিয়াছিল কিন্তু কখনও চোখে দেখে নাই। আজ আকস্মিকভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়া গেল।

চাতক ঠাকুর প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিলেন, যাই, দেবস্থানে ফুল চড়াই গিয়ে। –মৌরলা মাছের কী রাঁধবি?

রঙ্গনা জানিত মাছের প্রতি ঠাকুরের লোভ নাই, তিনি নিরামিষাশী। সে সলজ্জ কণ্ঠে বলিল— মা যা বলবে তাই রাঁধব।

টক্ রাঁধিস্। বলিয়া রঙ্গনার প্রতি সস্নেহে স্মিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি পা বাড়াইয়াছেন এমন সময় একটি ব্যাপার ঘটিল। একটা সোনাপোকা কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া রঙ্গনার সীমন্তের উপর বসিল; কালো চুলের মাঝখানে সোনাপোকাটা জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। রঙ্গনা জানিতে পারিল না, কিন্তু চাতক ঠাকুর স্থিরদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, তিনি স্বপ্নবিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন— তোর সিঁথেয় সিঁদুর কেন রে, রাঙা মেয়ে?

সিঁদুর! রঙ্গনা চমকিয়া চুলের উপর হাত রাখিতে গেল, অমনি সোনাপোকা ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল। রঙ্গনা উড্ডীয়মান পতঙ্গটাকে উজ্জ্বল চক্ষে লক্ষ্য করিয়া হসিয়া উঠিল— সোনাপোকা!

চাতক ঠাকুর কথা না বলিয়া চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে একটি প্রস্তরপট্টের উপর বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার হস্তপদের স্নায়ুপেশী ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। কাচের ন্যায় নিষ্পলক চক্ষু যেন কোন্ সুদূর মরীচিকার দৃশ্য দেখিতেছে এমনিভাবে শূন্যে বিস্ফারিত হইয়া রহিল।

রঙ্গনা চাতক ঠাকুরের এই দেবাবেশ দেখিয়া প্রথমে ভয় পাইল; তারপর সতর্কভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে জানিত এ সময়ে কথা কহিতে নাই, ঠাকুরকে জাগাইবার চেষ্টা করাও বিপজ্জনক।

চাতক ঠাকুর যতক্ষণ অদৃশ্য লোকের স্বপ্ন দেখিতেছেন এই অবকাশে আমরা তাঁহার অতীত সম্বন্ধে দু একটা কথা বলিয়া লই।

অনুমান ষাট বছর আগে, গ্রামের বর্তমান বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা যখন বালক বালিকা ছিল, তখন একদিন চাতক ঠাকুর কোথা হইতে বেতসগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই বগলে দুইটি প্রস্তরমূর্তি। ঠাকুরের চেহারা একটু ক্ষেপাটে গোছের, কিন্তু সাৎত্বিক প্রকৃতি বলিয়া মনে হয়।

বেতসগ্রাম চিরদিন অতিথি বৎসল; গ্রামের তাকালিক প্রবীণ ব্যক্তিরা চাতক ঠাকুরকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তৎকালে নিজের কি পরিচয় দিয়াছিলেন, কোথা হইতে আসিতেছেন, কোন বর্ণ, কী গোত্র — এ সকল কথা এখন আর কাহারও স্মরণ নাই। তাঁহার বয়সের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই; চেহারা দেখিয়া মনে হইয়াছিল মধ্যবয়স্ক।

যা হোক, চাতক ঠাকুর গ্রামে রহিয়া গেলেন। দেবস্থানের অশ্বত্থ বৃক্ষতলে তখন কেবল একটি ধ্বজা প্রোথিত থাকিত, ওই ধ্বজার মূলেই গ্রামের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদিত হইত। চাতক ঠাকুর তাঁহার আনীত মূর্তি দুটি ধ্বজার দুই পাশে বসাইয়া পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মূর্তি দুটির একটি বুদ্ধমূর্তি এবং অন্যটি বিষ্ণু বিগ্রহ—সেজন্য কাহারও আপত্তি হইল না। বরং একসঙ্গে এক জোড়া দেবতা পাইয়া গ্রামবাসীরা উৎফুল্ল হইল। সে সময় উপাস্য দেবতা লইয়া বেশি বাছ-বিচার ছিল না; পূজার পাত্র যা-হোক একটা থাকিলেই হইল। অধিকন্তু ন দোষায়। যাহার যেটা ইচ্ছা পূজা করিবে।

তারপর বছরের পর বছর কাটিয়া গিয়াছে; চাতক ঠাকুরের আগমন কালে যাহারা বয়স্ক ছিল তাহারা মরিয়া গিয়াছে; আরও দুই পুরুষ কাটিয়াছে। চাতক ঠাকুরের কিন্তু ক্ষয়ব্যয় নাই, তিনি তাঁহার শিলা-বিগ্রহের মতই অবিনশ্বররূপে বিরাজ করিতেছেন। গ্রামবাসীরা মাঝে মাঝে তাঁহার বয়স সম্বন্ধে জল্পনা করে। কেহ বলে তাঁহার বয়স আশী; কেহ বলে শটকে পুরিয়া গিয়াছে। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসেন, উত্তর দেন

না; নিজের বয়স কত তাহা তিনি নিজেই জানেন কিনা সন্দেহ। বস্তুত নিজের সম্বন্ধে তাঁহার মন সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি তিন পুরুষ ধরিয়া গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের সুখ-দুঃখের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; রোগে এমন সেবা করিতে আর দ্বিতীয় নাই। দুই চারিটি শিকড়-বাকড় মুষ্টিযোগও জানেন এবং প্রয়োজন হইলে প্রয়োগ করেন। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে কোনও ভাবনা-চিন্তা নাই। দেবস্থানের পূজা, দিনান্তে দুটি তণ্ডুল এবং হাসিমুখে নির্লিপ্তচিত্তে গ্রামবাসীদের সকল কাজে সাহচর্য—ইহাই তাঁহার জীবন।

গ্রামবাসীরা সস্নেহে বলে—আমাদের পাগলা ঠাকুর। মাঝে মাঝে বায়ু কুপিত হয় বটে কিন্তু এমন আপনভোলা মানুষ হয় না।

বায়ু-রোগই হোক আর দেবাবেশই হোক, মৌরীর ঘাটে প্রায় একদণ্ড কাল হচেতন অবস্থায় বসিয়া থাকিবার পর চাতক ঠাকুরের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল; তাঁহার চোখের দৃষ্টি আবার সহজ হইল। রঙ্গনা এতক্ষণ দুই চক্ষে উৎকণ্ঠা ভরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তিনি তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া ক্ষীণ হাসিলেন। রঙ্গনা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিল। চাতক ঠাকুর স্খলিতপদে গিয়া নদীর জলে মুখ প্রক্ষালন করিলেন, মাথায় জল দিলেন। তারপর আবার শিলাপট্টে আসিয়া বসিলেন। এই একদণ্ড সময়ের মধ্যে তাঁহার শারীরিক শক্তি যেন সমস্ত নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

রঙ্গনা তাঁহার পাশে বসিয়া সংহত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল— ঠাকুর! কী হয়েছিল?

চাতক ঠাকুর ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর আস্তে আস্তে বলিলেন— তোর চুলে সোনাপোকা বসেছিল; আমার মনে হল সিঁদুর ডগড়গ করছে। সেইদিকে চেয়ে রইলাম। তারপর দেখতে দেখতে সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, নদী ঘাট কিছু রইল না। তার বদলে দেখলাম—দেখলাম—

কী দেখলেন? দেখলাম যুদ্ধ হচ্ছে হাজার হাজার লোক অস্ত্র নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করছে। আহত মানুষের কাতরানি, হাতি-ঘোড়ার ছুটোছুটি—আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর উড়ছে, গঙ্গম্ শব্দে রণভেরী বাজছে— ভয়ঙ্কর যুদ্ধ

রঙ্গনা চাতক ঠাকুরের মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিয়াছে, যুদ্ধ তাহার অপরিচিত নয়। সে বলিল —কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে?

চাতক ঠাকুর বলিলেন,—তা জানি না। ঐ দিকে উত্তর দিকে। দুই পাশে পাহাড়, একদিকে প্রকাণ্ড নদী, আর একদিকে জঙ্গল; তার মাঝখানে যুদ্ধ হচ্ছে।

তারপর?

অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলল। দক্ষিণ দিকের দল হটে যেতে লাগল। দেখলাম, একজন অশ্বারোহী উল্কার বেগে বেরিয়ে এল— ঘোড়া ছুটিয়ে এই দিকে পালিয়ে আসতে লাগল। সাদা ঘোড়ার পিঠে প্রকাণ্ড-শরীর আরোহী, তার কপালে তলোয়ারের কাটা দাগ, রক্ত ঝরছে। সাদা ঘোড়া

আর আরোহী জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আর কি দেখলেন?

ক্রমে যুদ্ধ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দক্ষিণের দল পালাতে লাগল, বিজয়ী দল তাদের তাড়া করল। দেখতে দেখতে রণস্থল শূন্য হয়ে গেল, কেবল মরা মানুষ হাতি ঘোড়া পড়ে রইল।

আর কিছু দেখলেন না?

চাতক ঠাকুর চকিত হইয়া একবার আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে দৃষ্টিপাত করিলেন, তারপর উদ্বিগ্ন স্বরে বলিলেন— আর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। শূন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আকাশের পানে চোখ তুলে দেখি, উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে প্রকাণ্ড একটা মেঘ ছুটে আসছে, কালবোশেখীর কালো মেঘ। মেঘ যখন আরও কাছে এল তখন দেখলাম, মেঘ নয়—ধুলোর ঝড়। যেন ঐদিকের কোনও মরুভূমিতে ঝড় উঠেছে, তাই ধুলোবালি উড়ে আসছে। চক্ষের নিমেষে আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল, সূর্যের আলো নিভে গেল। আর কিছু দেখতে পেলাম না; অন্ধকারে অন্ধের মত বসে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে চোখের সহজ দৃষ্টি ফিরে এল।

শুনিতে শুনিতে রঙ্গনার চক্ষু-তারকা বিস্ফারিত হইয়াছিল, সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—এর মানে কি ঠাকুর?

চাতক ঠাকুর বলিলেন— তা জানি না, রাঙা মেয়ে। কিন্তু মনে হয় বড় দুর্দিন আসছে। ঐ যে মরুভূমিতে ঝড় উঠেছে, এ ঝড়ের ঝাপটা আমাদের গায়েও লাগবে, আমাদের ঘরের মক্কাও উড়ে যাবে। কিছুক্ষণ নতমুখে নীরব থাকিয়া তিনি উদ্বিগ্ন চক্ষু তুলিয়া রঙ্গনার পানে চাহিলেন— কিন্তু তোর সিঁথেয় সিঁদুর দেখলাম কেন রে রাঙা মেয়ে? তোর কি তবে বিয়ের ফুল ফুটেছে! কোথা থেকে বর আসবে? কোন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজপুত্তুর আসবে? বলিয়া তিনি স্নেহকম্পিত করাঙ্গুলি দিয়া রঙ্গনার চিবুক তুলিয়া ধরিলেন।

সলজ্জে ঘাড় ফিরাইয়া রঙ্গনা দেখিল, তাহার মা কখন অলক্ষিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে লজ্জায় আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গোপা বলিল— তোর দেরি হচ্ছে দেখে এলাম। তুই এখন ঘরে যা। আমি ঠাকুরের সঙ্গে দুটো কথা বলব।

রঙ্গনা কলসী আর মৌরলা মাছের ঠোঙা লইয়া চলিয়া গেল। গোপা তখন প্রস্তরপট্টের উপর বসিয়া বলিল— ঠাকুর, কি কথা বলছিলেন রাঙাকে, আমায় বলুন। ওর কি বিয়ের ফুল ফুটেছে? কবে কোথায় কার সঙ্গে বিয়ে হবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। আপনি কী জানতে পেরেছেন বলুন।

চাতক ঠাকুর তখন দিব্য চক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ গোপাকে শুনাইলেন। শেষে বলিলেন–রাঙা মেয়ের চুলে সোনাপোকা বসেছিল, ঠিক সিঁদুরের মত। দেখাচ্ছিল; তাই ভাবছি ওর বুঝি সিঁদুর পরবার সময় হয়েছে— দেবতারা তাই ইশারায় জানিয়ে দিলেন।

গোপা ব্যাকুল হইয়া বলিল— কিন্তু কি করে হবে ঠাকুর? গ্রামের কোনও ছেলে কি? কিন্তু তাই বা কি

করে হবে? মোড়লদের ভয়ে গাঁয়ের ছেলেরা যে ওর পানে চোখ তুলে তাকায় না। নইলে আমার রাঙার মত মেয়ে—

চাতক ঠাকুর ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন— গাঁয়ের কেউ নয়। এ যে সোনাপোকা, গোপা-বৌ। সারা গায়ে সোনা জড়ানো। কোথা থেকে রাজপুত্তুর আসছে কে জানে? মহাভারতের গল্প শুনেছ তো! শকুন্তলা বনের মধ্যে মুনির আশ্রমে থাকত; কোথা থেকে হঠাৎ এলেন রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করতে। রাঙা মেয়েরও তেমনি দুষ্মন্ত আসবে। তুমি ভেবো না।

গোপা চাতক ঠাকুরের পায়ের উপর নত হইয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল— ঠাকুর, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

—

সেদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে উৎসবকারীরা ক্লান্ত দেহে এবং ঈষৎ মদমত্ত অবস্থায় স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। মাঠের মাঝখানে ইক্ষুযন্ত্রটি নিঃসঙ্গভাবে দণ্ডায়মান ছিল; কেবল কয়েকটা কাক ও শালিক পাখি তখনও আখের ছিবড়ার মধ্যে মাদকদ্রব্য অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল।

গোপা ও রঙ্গনা আপন কুটিরে ছিল। বেলা পড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া গোপা মেয়েকে ডাকিল— রাঙা, আয় তোর চুল বেঁধে দিই।

রঙ্গনা মায়ের সম্মুখে আসিয়া বসিল। গোপা তাহার চুলে তেল দিল, কাঁকই দিয়া চুল আঁচড়াইয়া সযত্নে বেণী রচনা করিল। তারপর কানড় সাপের ন্যায় দীর্ঘ বেণী জড়াইয়া জড়াইয়া কবরী বাঁধিয়া দিল। পক্ক তাল ফলের ন্যায় সুপুষ্ট কবরী রঙ্গনার মাথায় শোভা পাইল।

চুল বাঁধিয়া গোপা নিজের আঁচল দিয়া রঙ্গনার মুখখানি অতি যত্নে মুছিয়া দিয়া ললাটতটে খদিরের টিপ পরাইয়া দিল, স্নেহক্ষরিত চক্ষে অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দেখিয়া গণ্ডে একটি চুম্বন করিল।

রঙ্গনা মায়ের এমন স্নেহার্জ কোমলভাব কখনও দেখে নাই, সে লজ্জা পাইল। সে কেমন করিয়া জানিবে তাহার মায়ের মনের মধ্যে কী হইতেছে। গোপার মন আশায় আকাঙ্খায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার যেন আর ত্বর সহিতেছিল না। কবে আসিবে রঙ্গনার বর? এখনি আসে না কেন? চাতক ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি সে কেবলই মনে মনে দেবতার উদ্দেশে বলিতেছিল— ঠাকুর, আমাকে যত ইচ্ছে শাস্তি দাও, কিন্তু রাঙা যেন সুখী হয়!

মাতার পদধূলি মাথায় লইয়া রঙ্গনা সলজ্জ চক্ষু তুলিল—মা, পলাশবনে আস্তা-পোকা খুঁজতে যাই?

গোপা বলিল তা যা। ঘটি নিয়ে যাস, একেবারে বাথান থেকে দুধ দুয়ে ফিরবি।

রঙ্গনা ঘটি লইয়া পলাশবনের দিকে চলিল। আজ পূর্বাহে চাতক ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর হইতে তাহার মনেও যেন কোন মধুর ভবিতব্যতার বাতাস লাগিয়াছে। মন উৎসুক উন্মুখ, প্রাতঃকালের বিষণ্ণ বিরসতা আর নাই।

বনে প্রবেশ করিয়া রঙ্গনা দেখিল, সেখানে আরও কয়েকটি গ্রাম্যযুবতী উপস্থিত হইয়াছে; তাহারাও দোহনপত্র লইয়া আসিয়াছে, বাথানে গো-দোহন করিয়া ঘরে ফিরিবে। কারণ, উৎসব উপলক্ষে আর সব কাজ বন্ধ রাখা চলে, গো-দহন না করিলে নয়। যুবতীদের সকলেরই একটু প্রগল্ভ অবস্থা, ইক্ষুরসের প্রভাব এখনও দূর হয় নাই। তাহারা রঙ্গ-রসিকতার ছলে পরস্পরের গায়ে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে; স্থলঞ্চলা হইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। তাহাদের মধ্যে যে চটুল বাক্-চাতুর্যের বিনিময় হইতেছে তাহাতে আদিরসের ব্যঞ্জনাই অধিক।

রঙ্গনা তাহাদের দেখিয়া একটু থতমত হইল। কিন্তু পলাশবন বিস্তীর্ণ স্থান, সে তাহাদের এড়াইয়া অন্যদিকে গেল। যুবতীরা রঙ্গনাকে দেখিয়াছিল; তাহারা চোখ ঠারাঠারি করিয়া নিম্নকণ্ঠে হাস্যালাপ আরম্ভ করিল।

তাহাদের ভাঙা ভাঙা হাসির শব্দ রঙ্গনার কানে আসিতে লাগিল। উহারা যে তাহার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছে তাহা বুঝিয়া রঙ্গনার গাল দুটি উত্তপ্ত হইল; কিন্তু সে তাহাদের ছাড়িয়া বেশি দূরেও যাইতে পারিল না। এই সমবয়স্কা যুবতীদের প্রতি তাহার মনে কোনও বিদ্বেষ ভাব ছিল না; বরং তাহাদের সহিত মিশিয়া তাহাদের সঙ্গসুখ লাভ করিবার গভীর ক্ষুধা তাহার অন্তরে ছিল, কিন্তু তবু উপচিকা হইয়া তাহাদের সমীপবর্তিনী হইবার হঠতাও তাহার ছিল না। সারাজীবনের একাকিত্ব তাহাকে ভীরু করিয়া তুলিয়াছিল।

লাক্ষাকীটের অন্বেষণে বিমনাভাবে এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একটা সোনাপোকা দেখিয়া রঙ্গনা উৎফুল্ল নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। আবার সোনাপোকা! সুবর্ণদেহ পতঙ্গটা বোধহয় রাত্রির জন্য আশ্রয় খুঁজিতেছিল; সে একটা বৃক্ষকাণ্ডে বারবার আসিয়া বসিতেছিল, আবার উড়িয়া যাইতেছিল। তাহার সোনালী অঙ্গে আলোর ঝিলিক খেলিতেছিল।

রঙ্গনা কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্তর্পণে স্কন্ধ হইতে আঁচল নামাইয়া হাতে লইল, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল। সোনাপোকা বা কাঁচপোকা দেখিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয় না— এমন মেয়ে সেকালে ছিল না, একালেও নাই।

রঙ্গনা আঁচল হাতে লইয়া গাছের নিকটবর্তিনী হইতেই সোনাপোকাটা উড়িয়া গেল; কিন্তু বেশি দূর গেল না, কাছাকাছি ঘুরিতে লাগিল। রঙ্গনার মনে হইল, যে সোনাপোকা আজ সকালে তাহার চুলে বসিয়াছিল এ সেই সোনাপোকা। সে মহা উৎসাহে তাহার পিছনে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

যুবতীরা দূর হইতে সোনাপোকা দেখিতে পাইতেছিল না, কেবল রঙ্গনার ছুটাছুটি দেখিতেছিল। কিছুক্ষণ দেখিবার পর একটি যুবতী বলিল— রঙ্গনা এমন ছুটোছুটি করছে কেন ভাই? দ্যাখ দ্যাখ—ঠিক যেন বাথানিয়া গাই। (বাথানিয়া গাই—যৌবনতপ্তা গাভী)

রসিকতা শুনিয়া অন্য যুবতীরা হাসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। আর একজন বলিল,–তা হবে না? অত

বড় আইবুড়ো মেয়ে!

ওদিকে রঙ্গনা আরও কিছুক্ষণ সোনাপোকার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অবশেষে তাহাকে আঁচল চাপা দিয়া ধরিয়া ফেলিল। চোখে মুখে উচ্ছল আনন্দ, আঁচলসুদ্ধ সোনাপোকাকে মুঠির মধ্যে লইয় কানের কাছে আনিয়া শুনিল, মুঠির ভিতর হইতে আবদ্ধ সোনাপোকার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন আসিতেছে।

এই সময় তাহার চোখে পড়িল, যুবতীরা অদূরে আসিয়া কৌতূহল সহকারে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। রঙ্গনা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, ছুটিয়া তাহাদের কাছে গিয়া কলোচ্ছল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল— ও ভাই, দ্যাখো আমি সোনাপোকা ধরেছি!

যুবতীরা কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল। তারপর, যে মেয়েটি বাথানিয়া গাইয়ের রসিকতা করিয়াছিল সে কথা কহিল। তাহার নাম মঙ্গলা; যুবতীদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা বাক্-চটুলা। মঙ্গলা বলিল— ওমা সত্যি? তা ভাই, তুমি তো সোনাপোকা ধরবেই, তোমার তো আর আমাদের মত গুবরে পোকার বরাত নয়। একটু দেরিতে ধরেছ, এই যা। তা কেমন সোনাপোকা ধরলে দেখি। সত্যি সোনাপোকা বটে তো?

রঙ্গনা এই বাক্যের ব্যঙ্গার্থ বুঝিল কিনা বলা যায় না; সে মঙ্গলার কাছে গিয়া তাহার কানের কাছে সোনাপোকার মুঠি ধরিল, বলিল–হ্যাঁ, সত্যি সোনাপোকা, এই শোনো না।

মঙ্গলা মুঠির মধ্যে গুঞ্জন শুনিল। আরও কয়েকটি যুবতী কান বাড়াইয়া দিল; তাহারাও শুনিল। মঙ্গলা বলিল— গুন্ গুন্ করছে বটে। তা সোনাপোকা না হয়ে ভোমরাও হতে পারে। –হ্যাঁ ভাই, সোনাপোকা ভেবে একটা কেলে-কিষ্টে ভোমরা ধরনি তো?

না, সোনাপোকা। বলিয়া রঙ্গনা যেন সকলের প্রতীতি জন্মাইবার জন্যই অতি সাবধানে মুঠি একটু খুলিল। সোনাপোকা এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, ভোঁ করিয়া বাহির হইয়া তীরবেগে অন্তর্হিত হইল।

রঙ্গনা বলিল—ঐ যাঃ!

যুবতীরা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। মঙ্গলা বলিল— হায় হায়, এত কষ্টে সোনাপোকা ধরলে তাও উড়ে গেল। ধরে রাখতে পারলে না? এর চেয়ে আমাদের গুরে পোকাই ভাল, তারা উড়ে পালায় না। কি বলিস ভাই? বলিয়া সখীদের প্রতি কটাক্ষ করিল।

সখীরা মুখে আঁচল দিয়া হাসিল। রঙ্গনার মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। এতক্ষণে সে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিল, ইহারা তাহাকে লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করিতেছে। তাহার চোখ দুটি মাটিতে নত হইয়া পড়িল। স্খলিত আঁচলটি ধীরে ধীরে স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইয়া সে গমনোদ্যত হইল।

মঙ্গলা কহিল— দুঃখ কোরো না ভাই, তোমার কপালে আবার সোনাপোকা আসবে। যার অমন রূপ, তার কি সোনাপোকার অভাব হয়?

রঙ্গনা তাহার প্রতি বিহ্বল দৃষ্টি তুলিয়া বলিল— কী বলছ ভাই তুমি? আমি বুঝতে পারছি না।

বলছি, গাঁয়ের কাউকে তো আর তোমার মনে ধরবে না। তোমার জন্যে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্তুর আসবে। বলিয়া ব্যঙ্গভরে হাসিতে হাসিতে মঙ্গলা বাথানের দিকে চলিয়া গেল। অন্য যুবতীরাও তাহার সঙ্গে গেল।

রঙ্গনা কিছুক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তারপর একটু রাগ হইল। সে মনে মনে বলিল— আসবেই তো রাজপুত্তুর!

রঙ্গনার অদৃষ্টদেবতা অন্তরীক্ষ হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া বোধহয় একটু করুণ হাসিলেন। যে ব্যঙ্গোক্তি অচিরাৎ সত্য-রূপ ধরিয়া দেখা দেয়, যে-কামনা সফলতার ছদ্মবেশ পরিয়া আবির্ভূত হয়, তাহার প্রকৃত মূল্য অদূরদর্শী মানুষ কেমন করিয়া বুঝিবে?

অতঃপর রঙ্গনা কিয়ৎকাল বৃক্ষশাখায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে বৃক্ষতল ছায়াচ্ছন্ন হইল। এতক্ষণে অন্য মেয়েগুলা গো-দোহন শেষ করিয়া নিশ্চয় বাথান হইতে চলিয়া গিয়াছে। রঙ্গনা নিজের দোহনপাত্রটি মাটি হইতে তুলিয়া লইয়া বাথানের দিকে পা বাড়াইয়াছে এমন সময় পিছন দিকে একটা শব্দ শুনিয়া সচকিতে ফিরিয়া চাহিল।

উত্তর দিকের তরুচ্ছায়ার ভিতর দিয়া এক পুরুষ শ্বেতবর্ণ অশ্বের বল্গা ধরিয়া আসিতেছে। বিশালকায় পুরুষ; তাহার পাশে ক্লান্ত স্বেদাক্ত অশ্বটিকে খর্ব মনে হয়। পুরুষের দেহে বর্ম চর্ম, কটিবন্ধে অসি, মস্তকে লৌহ শিরস্ত্রাণ; কিন্তু বেশবাসের পারিপাট্য নাই। কপালে ক্ষতরেখার উপর রক্ত শুকাইয়া আছে। রঙ্গনা ও পুরুষ পরস্পরকে একসঙ্গে দেখিতে পাইল। পুরুষ থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

দুইজনে কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল। তারপর পুরুষ অশ্বের বল্গা ছাড়িয়া দিয়া রঙ্গনার দিকে অগ্রসর হইল। রঙ্গনার বুকের মধ্যে তুমুল স্পন্দন আরম্ভ হইয়াছিল। সে সম্মোহিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে পড়িল, চাতক ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে বিশালকায় পুরুষ রণক্ষেত্র হইতে উল্কার বেগে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। এ কি সেই অশ্বারোহী?

পুরুষ রঙ্গনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; রঙ্গনাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তাহার মুখমণ্ডল বিশদ হাস্যে ভরিয়া গেল। সে সহজ মার্জিত কণ্ঠে বলিল— আমার ভাগ্য ভাল যে একলা তোমার দেখা পেলাম। কাছেই বোধহয় গ্রাম আছে, কিন্তু গ্রামে যাবার আমার ইচ্ছা। নেই। আমি রণক্লান্ত যোদ্ধা, আমাকে কিছু খাদ্য পানীয় দিতে পার?

রঙ্গনা মোহাচ্ছন্নের ন্যায় চাহিয়া রহিল; তারপর মুখ হইতে আপনি বাহির হইয়া আসিল— তুমি কি রাজপুত্তুর?

পুরুষের চক্ষে সবিস্ময় প্রশ্ন উঠিল। তারপর সে ঊর্ধ্বে মুখ উৎক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। প্রাণখোলা কৌতুকের হাসি। মানুষটি যে স্বভাবতই মুক্তপ্রাণ, তাহা তাহার হাসি হইতে প্রতীয়মান হয়। অবশেষে সহসা হাসি থামাইয়া সে বলিল— আমার পরিচয় কি কপালে লেখা আছে? ভেবেছিলাম পরিচয় দেব না। কিন্তু তুমি ধরে ফেলেছ। তবে একটু ভুল করেছ, আমি রাজপুত্র বটে, কিন্তু আপাতত রাজা।

এই পুরুষের সহজ বাভঙ্গি এবং অকপট কৌতুকহাস্য শুনিয়া রঙ্গনা অনেকটা সাহস পাইয়াছিল, প্রথম সাক্ষাতের বিহ্বলতাও আর ছিল না। তবু বিস্ময় অনেকখানি ছিল। সে পুরুষের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল–রাজা!

পুরুষ বলিল—হ্যাঁ, গৌড়দেশের রাজা। আমার নাম—মানবদেব।

কিন্তু–গৌড়দেশের রাজার নাম তো শশাঙ্কদেব।

মানব নীরবে কিছুক্ষণ রঙ্গনার সরল সুন্দর মুখখানি দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল— মহারাজ শশাঙ্কদেব আজ আট মাস হল দেহরক্ষা করেছেন। আমি তাঁর পুত্র। তুমি বোধহয় বিশ্বাস কর

অবিশ্বাস করার মত মনের অবস্থা রঙ্গনার নয়। বিশেষত গ্রামে রাজা-রাজড়ার খবর কয়জন রাখে? কোন রাজা মরিল, কে নুতন রাজা হইল— এ সকল সংবাদ গ্রামাঞ্চলে বহু বিলম্বে আসে, আসিলেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে না। রঙ্গনা জন্মাবধি শুনিয়াছে শশাঙ্কদেব রাজা; রাজা যে মরিতে পারে, এ সম্ভাবনা তাহার মনে আসে নাই। এখন মানবের শালপ্রাংশু আকৃতির দিকে চাহিয়া তাহার মনে তিলমাত্র সংশয় রহিল না। সে যুক্তকরে বলিল— মহারাজের জয় হোক।

রাজাকে জয় হোক বলিয়া সম্ভাষণ করিতে হয় ইহা সে চাতক ঠাকুরের কাছে পৌরাণিক গল্প শুনিবার কালে শিখিয়াছিল।

মানব হাসিল। বলিল—জয় আর হল কৈ? আজ তো পরাজয় হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছি। ভাগ্যে জয়ন্ত ছিল— নইলে— বলিয়া মানব তাহার জয়ন্ত নামক রণঅশ্বের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল, কিন্তু অশ্বকে দেখিতে পাইল না। তৃষ্ণার্ত অশ্ব অদূরে জলের আঘ্রাণ পাইয়া নদীর দিকে গিয়াছে।

রঙ্গনার দিকে ফিরিয়া মানব বলিল— পরাজিতকে সকলে ত্যাগ করে, জয়ন্তও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন তুমি ভরসা। তোমার নাম কি?

রঙ্গনা নাম বলিল। মানব স্মিত-প্রশংস দৃষ্টি তাহার সর্বাঙ্গে বুলাইয়া হঠাৎ গাঢ়স্বরে বলিল— তোমার মত রূপসী রাজ-অবরোধেও বিরল। কপালে সিঁদুর দেখছি না; এখনও কি বিয়ে হয়নি?

নেত্র অবনত করিয়া রঙ্গনা মাথা নাড়িল। মানব বলিল— তোমাকে যত দেখছি ততই আশ্চর্য লাগছে, এই সুদূর জনপদে তুমি কোথা থেকে এলে জানি না, কিন্তু মনে হয় তোমার হৃদয় তোমার দেহের মতই কোমল। আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, আজ রাত্রির জন্য আমাকে রক্ষা কর।

রঙ্গনার মনে পড়িল তাহার রাজপুত্র ক্ষুৎপিপাসাতুর। চকিতে মুখ তুলিয়া সে বলিল—তুমি এখানে থাকো, আমি এখনি তোমার জন্যে দুধ দুয়ে আনছি। বলিয়া দোহনপাত্র লইয়া সে ছুটিয়া গেল।

যতক্ষণ দেখা গেল মানব সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, এ কি পলাশবনের বনলক্ষ্মী! তারপর

বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া সে নিজের ভাগ্য চিন্তা করিতে লাগিল।

আজ হইতে ঠিক আট মাস পূর্বে গৌড়কেশরী শশাঙ্কদেব বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। শশাঙ্ক একদিকে যেমন দুর্ধর্ষ বীর ছিলেন অন্যদিকে তেমনি অসামান্য কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন; ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি এক হাতে পূর্ববঙ্গের রাজ্যগৃধ্নু নৃপতিবৃন্দকে এবং অন্য হাতে প্রতিহিংসাপরায়ণ হর্ষবর্ধনের বিপুল রাজশক্তিকে রুখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় শত্রু গৌড়রাজ্যে পদার্পণ করিতে পারে নাই।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মানব গৌড়ের সিংহাসনে বসিল। মানবের বয়স ত্রিশ বৎসর। পিতার মতই সে দুর্মদ বীর, তাহার বিপুল দেহে সিংহের পরাক্রম। কিন্তু তাহার স্বভাব উন্মুক্ত ও সরল, মনের কথা সে গোপন রাখিতে পারে না; ছলচাতুরী তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যতদিন সে যুবরাজ ছিল ততদিন পিতার অধীনে সৈনাপত্য করিয়াছে, অসীম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু মন্ত্রণাসভায় তাহার বুদ্ধি বিকাশ লাভ করে নাই। তাই সিংহাসন লাভের পরেও তাহার প্রকৃতিগত স্বধর্ম পরিবর্তিত হইল না। যে-মন্ত্রিগণ শশাঙ্কের জীবিতকালে মাথা তুলিতে পারেন নাই, তাঁহারা এখন মাথা তুলিয়া পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিলেন; রাজ্যের কল্যাণচিন্তা ভুলিয়া আপন আপন শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টায় তৎপর হইলেন। রাজপুরুষদের মধ্যে ঘরে ঘরে চক্রান্ত চলিতে লাগিল। রাজ্যের মর্মকোষে কীট প্রবেশ করিল।

শত্রুপক্ষ এতবড় সুযোগ উপেক্ষা করিল না। কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্মা গোপনে হর্ষবর্ধনের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, তিনি সসৈন্যে গৌড়ের উত্তর প্রান্ত আক্রমণ করিলেন।

কজঙ্গলের শিলা-বন্ধুর উপত্যকায় ভাস্করবর্মার সহিত মানবের যুদ্ধ হইল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষার বিষ সেনাপতিদের মনেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। দ্বিপ্রহর পর্যন্ত যুদ্ধ চলিবার পর মানব ইঝিল যুদ্ধে জয়ের আশা নাই। রক্তাক্ত দেহে সে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিল। এখন তাহার একমাত্র ভরসা শত্রুর আগে কর্ণসুবর্ণে পৌঁছিয়া আর একবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

আজ দ্বিপ্রহরে রণক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া সে দক্ষিণ দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু কজঙ্গল হইতে কর্ণসুবর্ণ বহু দূর, অশ্বপৃষ্ঠেও দুই দিনের পথ। মানব পলাশবনের ভিতর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভগ্নদেহে ক্ষুৎপিপাসার্ত অবস্থায় বেতসগ্রামের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

সম্মুখে রাত্রি, পশ্চাতে শত্ৰু আসিতেছে। এই উভয় সংশয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে মানব নিজ ভাগ্য চিন্তা করিতেছে— অতঃপর অদৃষ্ট-শক্তি তাহাকে কোন পথে লইয়া যাইবে? ভবিষ্যতের গর্ভে কোন্ রহস্যের সূণ লুক্কায়িত আছে?–ভাবিতে ভাবিতে তাহার অধরে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। রঙ্গনার পুষ্পপেলব যৌবন-লাবণ্য তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল।

–

পূর্ণ দুগ্ধপাত্র লইয়া রঙ্গনা যখন ফিরিয়া আসিল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে, আকাশে শুক্লা নবমীর চন্দ্র কিরণজাল প্রস্ফুটিত করিয়া সূর্যের অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। পলাশবনের মধ্যে আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা।

রঙ্গনা দুগ্ধপাত্র মানবের সম্মুখে ধরিল; মানব দুই হাতে পাত্র লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার কানায় ওষ্ঠ-সংযোগ করিল। পাত্রটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, একটি ছোটখাটো কলসী বলা চলে। মানব এক চুমুকে তাহা নিঃশেষ করিয়া রঙ্গনাকে ফিরাইয়া দিল।

রঙ্গনা রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করিল— আর কিছু খাবে?

মানব হাসিয়া বলিল— ক্ষুধার কি শেষ আছে? কিন্তু থাক, আপাতত এই যথেষ্ট। তোমাকে কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাব?

মানব হাত ধরিয়া রঙ্গনাকে কাছে টানিয়া লইল। রঙ্গনার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল, দেহ রোমাঞ্চিত হইল। মানব গাঢ়স্বরে বলিল— আমার আজ কিছু নেই, আমি পলাতক। দুদিন আগে যদি তোমার দেখা পেতাম, প্রাণভরে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে পারতাম।

রঙ্গনা উত্তর দিতে পারিল না, অধোমুখে রহিল। মুগ্ধা পল্লীযুবতী নাগরিক সভাসৌজন্য কোথায় শিখিবে? কিন্তু তাহার স্নিগ্ধ নীরবতা মানবের বড় মিষ্ট লাগিল। সে ধীরে ধীরে কথা বলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সে রঙ্গনাকে বাচাতুর্যে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিল না। বরং একটি সমধর্মী মানুষ পাইয়া তাহার অন্তরের সরলতা যেন সাগ্রহে বাহির হইয়া আসিল। দুইজনে বৃক্ষশাখায় হেলান দিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে জল্পনা করিতে লাগিল। মানব অধিকাংশ কথা বলিল, রঙ্গনা তন্ময় হইয়া শুনিল। মানব যে-যে প্রশ্ন করিল, রঙ্গনা সরলভাবে তাহার উত্তর দিল।

এইভাবে এক দণ্ড অতীত হইবার পর মানব চকিত হইয়া বলিল— সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, তুমি গৃহে যাও।

আর তুমি?

আমি গাছতলায় রাত কাটিয়ে দেব।

রঙ্গনা আঙ্গুলে বস্ত্রাঞ্চল জড়াইতে লাগিল।

তুমি আমাদের কুটিরে চল না কেন? রাত্রে সেখানেই থাকবে।

মানব একটু ইতস্তত করিয়া শেষে মাথা নাড়িল।

না। আমার পিছনে শত্রু আসছে, হয়তো আজ রাত্রেই গ্রামে এসে পৌঁছবে। আমি গ্রামে থাকলে ধরা পড়বার ভয় আছে।

রঙ্গনা তর্জনী দংশন করিল, তারপর চকিত উৎফুল্ল চক্ষু তুলিল।

তুমি আমার কুঞ্জে থাকবে? আমার কুঞ্জের কথা কেউ জানে না।

তোমার কুঞ্জ!

রঙ্গনা তাহার নিভৃত বেতসকুঞ্জের কথা বলিল। শুনিয়া মানব বলিল—এ ভাল। চল, তোমার কুঞ্জে রাত কাটাব।

রঙ্গনা মানবকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। পলাশবনের বাহিরে অনিমেষ জ্যোৎস্না; দুজনে মৌরীর তীরে উপস্থিত হইল। মানব বলিল—একি, এ যে নদী! আমি স্নান করব। কিন্তু আগে তোমার কুঞ্জ দেখি।

কুঞ্জ দেখিয়া মানব দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

কি সুন্দর তোমাদের জীবন! কেন আমরা নগরে থাকি, রাজ্যের জন্য কাড়াকাড়ি করি? মানুষের যত অনিষ্টের মূল নাগরিক জীবন। ইচ্ছা করে চিরদিন তোমার এই কুঞ্জে কাটাই।

অস্ফুটস্বরে রঙ্গনা বলিল— কাটাও না কেন?

মানব বলিল—উপায় নেই, কর্মফল ভোগ করতে হবে। কিন্তু আবার আমি আসব। তোমাকে ভুলতে পারব না।

রঙ্গনাও বলিতে চাহিল, আমিও তোমাকে ভুলতে পারব না—কিন্তু লজ্জায় তাহা বলিতে পারিল না।

বলিল—তোমার কপাল কেটে গেছে—লাগছে না? এস, বেঁধে দিই।

মানব বলিল—ও কিছু নয়, তলোয়ারের আঁচড় লেগেছিল। আপনি সেরে যাবে।

তবে তুমি স্নান করে এস।

তুমি চলে যাবে না?

না।

মানব অল্পকাল মধ্যেই স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিল; বর্ম চর্ম শিরস্ত্রাণ কুঞ্জের বাহিরে নামাইয়া রাখিল। ইতিমধ্যে রঙ্গনা খড় বিছাইয়া শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে, কুঞ্জদ্বারে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মানব চারিদিকে চাহিল। আকাশে জ্যোৎস্না ফিন্ ফুটিতেছে; সুদূরপ্রসারিত বেতসবনের শাখাপত্র মৃদু মর্মর-ধ্বনি করিয়া কাঁপিতেছে। কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই। মানবের মনে হইল, ইহজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে কোন্ এক অর্ধ বাস্তব মায়াপুরীতে উপনীত হইয়াছে। এখানে আর কেহ নাই, শুধু সে আর রঙ্গনা।

মানব রঙ্গনার হাত ধরিয়া ঈষৎ স্খলিতস্বরে বলিল—রঙ্গনা!

কি বলছ?

না, কিছু না— মানব নিশ্বাস ফেলিল— তুমি এবার ঘরে যাও। কাল সকালে একবার তোমার দেখা পাব কি?

রঙ্গনা বলিল— আজ রাত্রেই আমি আবার আসব। তোমার খাবার নিয়ে আসব।

সহসা রঙ্গনার দুই স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া মানব নত হইয়া তাহার চোখের মধ্যে চাহিল—

রঙ্গনা, তুমি আমার বৌ হবে?

রঙ্গনা তাহার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া পালাইয়া গেল।

গ্রামের কুটিরগুলিতে দীপ নিভিয়া গিয়াছে; দিনের মাতামাতির পর গ্রামবাসীরা ক্লান্তদেহে শয্যা আশ্রয় করিয়াছে। কেবল গোপা আপন কুটির দ্বারে দাঁড়াইয়া উৎকণ্ঠাভরা চক্ষে বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। তাহার উৎকণ্ঠা ক্রমে আশঙ্কায় পরিণত হইতেছিল, এমন সময় রঙ্গনা ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিল; গোপা কোনও প্রশ্ন করিবার পূর্বেই একবার মা বলিয়া ডাকিয়া মাতার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধের মধ্যে মুখ লুকাইল।

গোপা অনুভব করিল রঙ্গনার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া সে রঙ্গনাকে

লইয়া মেঝেয় বসিল। ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বলিতেছে, উনানের উপর ভাত চড়ানো রহিয়াছে। গোপা কন্যার চিবুক ধরিয়া মুখ দেখিল, তারপর বলিল—এবার বল্ কি হয়েছে।

রঙ্গনা কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল মুখ নীচু করিয়া ভয়-ভঙ্গুর হাসিতে লাগিল। গোপা তখন একটি একটি প্রশ্ন করিয়া সব কথা বুঝিয়া লইল।

সব শুনিয়া গোপা কিছুক্ষণ বিভ্রান্তভাবে উনানের আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল। কী করিবে সে এখন? এমন অচিন্তনীয় অবস্থা যে কল্পনা করাও যায় না। চাতক ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিবে? কিন্তু তিনি যদি বাধা দেন? রাজপুত্র যদি আসিল, এমনভাবে আসিল?

ভাবিতে ভাবিতে গোপা যন্ত্রবৎ বলিল— রাঙা, দ্যাখ ভাত হল কিনা।

রঙ্গনা উঠিয়া গেল। গোপা মৃন্ময় মূর্তির মত বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বাহিরে সে নিশ্চল, কিন্তু ভিতরে যেন আগ্নেয়গিরির আন্দোলন চলিতেছে।

রঙ্গনা ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া ফেন গালিল।

সহসা গোপা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। না না, সময় নাই, অধিক চিন্তা করিবার সময় নাই। রঙ্গনার জীবনে যে শুভলগ্ন আসিয়াছে তাহা ভ্রষ্ট হইয়া না যায়। আজিকার রাত্রি আর ফিরিয়া আসিবে না, রাজপুত্র চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না—

ঘরের কোণে একটি পুরাতন বেনির্মিত পেটরা ছিল। গোপা তাহার তলদেশ হইতে দুইটি শোলার মালা বাহির করিল। তুচ্ছ শোলার টুকরা দিয়া গাঁথা দুটি মালা; গোপার নিভিয়া যাওয়া যৌবনের স্মৃতি। এক রাত্রির স্মৃতি। গোপার দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। কিন্তু সময় নাই; স্মৃতির মালা গলায় পরিয়া কাঁদিবার সময় নাই। আর একটি অভাবনীয় রাত্রি উপস্থিত হইয়াছে। হয়তো আজিকার রাত্রি উনিশ বছর আগের আর একটি রাত্রির সমাবর্তন তিথি— কালচক্র এক পাক ঘুরিয়া আসিয়াছে।

গোপা রঙ্গনাকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার কানে কানে দ্রুত হ্রস্ব কণ্ঠে উপদেশ দিতে লাগিল; যে-সকল কথা মেয়েকে আজ পর্যন্ত বলে নাই তাহা বলিল। লজ্জা করিল না, লজ্জার সময় কৈ? তারপর ছুটিয়া গিয়া ভাত বাড়িতে বসিল।

দুপুরের রান্না মৌরলা মাছ ছিল। তপ্ত ভাতে ঘি ঢালিয়া গোপা পাত্র রঙ্গনার হাতে দিল। রঙ্গনার মণিবন্ধ হইতে শোলার মালা দুটি ঝুলিতেছে; সে দুই হাতে আহার্যের পাত্র লইয়া চুপিচুপি কুটির হইতে বাহির হইল।

বিচিত্র অভিসার যাত্রা। কাব্যে পুরাণে, এরূপ অভিসারের কথা লেখে না। কিন্তু ইহাই হয়তো সত্যকার অভিসার।

বেতসকুঞ্জে তৃণশয্যায় মানব ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাথার উপর চাঁদ বেতসকুঞ্জের বিরলপত্র শীর্ষ

হইতে ভিতরে উঁকি দিতেছিল, মানবের ঘুমন্ত মুখ ও প্রশস্ত নগ্ন বক্ষের উপর ক্রীড়া করিতেছিল, তাহার বাহুতে সোনার অঙ্গদের উপর ঝিকমিক্ করিতেছিল।

রঙ্গনা নিঃশব্দে কুঞ্জে প্রবেশ করিল, মানবের পাশে বসিয়া তাহার জ্যোৎস্না-নিষিক্ত সুপ্ত মুখ দেখিতে লাগিল। রাজপুত্র—আমার রাজপুত্র! রঙ্গনার বুকের মধ্যে শোণিতনৃত্যের উন্মাদনা, রোমে রোমে হর্ষোল্লাস; মাথার কবরী আপনি শিথিল হইয়া পিঠের উপর এলাইয়া পড়িল। সে সন্তর্পণে অতি লঘুভাবে একটি আতপ্ত করতল মানবের বুকের উপর রাখিল।

মানব চমকিয়া উঠিয়া বসিল। রঙ্গনাকে দেখিয়া তাহার মুখে একটি তামুগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে রঙ্গনাকে দুই হাতে বুকে টানিয়া লইয়া জড়িত স্বরে বলিল— আমার বৌ!

চক্ষু মুদিয়া রঙ্গনা নিস্পন্দ হইয়া রহিল; বিপুল রভসরসের প্লাবনে তাহার সম্বিৎ ডুবিয়া গেল। লজ্জার বাহ্য বিভ্রম-বিলাস সে শেখে নাই, শিথিলদেহে অনুভব করিল মানব তাহার অধরে চুম্বন করিতেছে। আতপ-তাপিতা ধরণী যেমন ঊর্ধ্বমুখী হইয়া বৃষ্টির চুম্বন গ্রহণ করে তেমনিভাবে রঙ্গনা মানবের চুম্বন গ্রহণ করিল।

মানব চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে গদগদ কণ্ঠে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। ক্রমে রঙ্গনার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল; সহজ অশিক্ষিত লজ্জাও জাগরূক হইল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল—ছেড়ে দাও।

মানব বলিল— না, ছাড়ব না। তুমি আমার বৌ।

বৌ! রঙ্গনার মনে পড়িল, মা শিখাইয়া দিয়াছিল কি কি বলিতে হইবে। সে চোখ খুলিয়া মানবের মুখের পানে চাহিল। মানবের মুখ দেখিয়া আবার সব গোলমাল হইয়া গেল। কিন্তু না, মা বলিয়া দিয়াছে, কথাগুলি বলিতেই হইবে।

রঙ্গনা চুপিচুপি বলিল—তোমার তো আরও বৌ আছে।

মানব রঙ্গনাকে ছাড়িয়া দিয়া গম্ভীর চক্ষে তাহার পানে চাহিল। শেষে বলিল— আছে। কিন্তু তারা আমার রানী, মনের মানুষ নয়।

মনের মানুষ কে?

তুমি। তোমাকেই এতদিন খুঁজেছি, পাইনি।

আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে?

না। এখন কোথায় নিয়ে যাব? যদি রাজ্য রক্ষা করতে পারি, ফিরে এসে তোমায় নিয়ে যাব। শপথ করছি।

অতঃপর রঙ্গনার শেখানো বুলি ফুরাইয়া গেল। মা আরও অনেক কথা শিখাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহা আর সে মনে করিতে পারিল না। কি হইবে মনে করিয়া? তাহার রাজপুত্র ক্ষুধিত তৃষিত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছে। ব্যাকুল অনুরাগে রঙ্গনার নিশ্বাস দ্রুত বহিল। সে কম্পিতহস্তে একটি শোলার মালা রাজপুত্রের গলায় পরাইয়া ছিল।

অন্য মালাটি মানব রঙ্গনার গলায় দিল।

মোহ-বিহ্বল রাত্রি; নব-অনুভবের বিস্ময়-পুলক-ভরা বাসকরজনী। দুজনে দুজনের মুখে অন্ন দিল, চুম্বন দিল। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। একসঙ্গে আকুলতা ও চটুলতা, লজ্জা ও প্রগল্ভতা। তন্দ্রা ও প্রমীলায় মেশামেশি, ঘুমে জাগরণে জড়াজড়ি।

রাত্রি নিবিড় হইল। চাঁদ অস্ত গেল।

প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গিয়া মানব ও রঙ্গনা কুঞ্জের বাহিরে আসিল। পূর্বাকাশে ঊষা ঝলমল করিতেছে। পাখি ডাকিতেছে।

মানব দেখিল অদূরে নদীতীরে তাহার অশ্ব শষ্পহরণ করিতেছে; তাহার পৃষ্ঠে কম্বলাসন, মুখে বঙ্গ যেমন ছিল তেমনি আছে। প্রভুকে দেখিতে পাইয়া জয়ন্ত মৃদু হ্রেষাধ্বনি করিল।

মানব ম্লান হাসিয়া বলিল— আমার বাহনও উপস্থিত। তবে যাই, রাঙা-বৌ।

রঙ্গনা তাহার বাহু জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল— কবে ফিরে আসবে?

মানব রঙ্গনাকে দুই হাতে বুকের কাছে তুলিয়া মুখে মুখ রাখিয়া বলিল— যেদিন শত্রুকে রাজ্য থেকে দূর করব, সেদিন তোমাকে নিতে আসব। যদি রাজ্য যায় আর বেঁচে থাকি, তাহলেও তোমার কাছে ফিরে আসব।

কণ্ঠলগ্না রঙ্গনা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আসবে?

আসব। শপথ করছি।

রঙ্গনাকে নামাইয়া দিয়া মানব নিজ বাহু হইতে অঙ্গদ খুলিয়া তাহার বাহুতে পরাইয়া দিল, বলিল—এই অঙ্গদ নাও। যতদিন না ফিরে আসি, এটিকে দেখো; আমায় মনে পড়বে।

তারপর রঙ্গনার সোনাপোকা উড়িয়া গেল। জয়ন্তের পৃষ্ঠে চড়িয়া মানব চলিয়া গেল। রঙ্গনা অশ্রুবিধৌত মুখে দাঁড়াইয়া বিলীয়মান অশ্বারোহীর পথের পানে চাহিয়া রহিল। মানবের বৃহৎ অঙ্গদ তাহার বাহু হইতে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছিল, সে তাহা খুলিয়া একবার বুকে চাপিয়া ধরিল, তারপর আঁচলে বাঁধিয়া ঘরের দিকে চলিল।

নিশান্তের পাণ্ডুর চন্দ্রমা।

–

দিবা অনুমান এক প্রহর সময়ে ইক্ষুযন্ত্রের আখ মাড়াই কার্য সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় একদল সৈন্য হুম হুম শব্দ করিয়া বেতসগ্রামে ঢুকিয়া পড়িল। গ্রামের পুরুষেরা ভয় পাইল বটে, কিন্তু পলায়ন করিল না। যুবতী মেয়েরা কতক আখের ক্ষেতে, কতক বেতসবনে লুকাইল। গত ত্রিশ বছর ধরিয়া যে যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছে তাহাতে শত্রুসৈন্য একবারও গৌড়ের মাটিতে পদার্পণ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু নানা লোকের মুখে নানা লোমহর্ষণ কাহিনী শুনিয়া গ্রামবাসীদের মনে বিজয়োন্মত্ত সৈন্যদলের স্বভাব-চরিত্র আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে একটা বিভীষিকাপূর্ণ ধারণা জন্মিয়াছিল।

সৈন্যদল কিন্তু সংখ্যায় বেশি নয়; মাত্র কুড়ি পঁচিশজন পদাতিক, হাতে ঢাল সড়কি। ইহারা ভাস্করবর্মার দলের সৈন্য। গতকল্য যুদ্ধ জিতিয়া ভাস্করবর্মা সদলবলে কর্ণসুবর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, ইহারা সেই বিশাল বাহিনীর একটি বিচ্ছিন্ন প্রশাখা।

সৈন্যদল প্রথমেই জানিতে চাহিল, গৌড়ের রাজা বা তৎস্থানীয় কেহ গ্রামে লুকাইয়া আছে কিনা। গ্রামবাসীরা একবাক্যে বলিল, রাজা-গজা কেহ এখানে নাই। অনুসন্ধান করিবার ছুতায় কিছু লুঠপাট করিবার ইচ্ছা সৈনিকদলের ছিল; কিন্তু তাহারা দলে ভারী নয়। গ্রামবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তো বটেই, উপরন্তু বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট। সৈনিকদের অস্ত্র আছে সত্য, কিন্তু অমন দুই চারিটা সড়কি বল্লম গ্রামেও আছে। সুতরাং তাহারা কোনও প্রকার উপদ্রব করিতে সাহস করিল না, প্রত্যেকে একটি একটি ইক্ষুদণ্ড লইয়া চিবাইতে চিবাইতে প্রস্থান করিল।

সৈন্যদল চলিয়া যাইবার পর গুড়নির্মাণ কার্য স্বভাবতই শ্লথ হইয়া পড়িল। সকলে জটলা করিয়া জল্পনা করিতে লাগিল; কোথায় যুদ্ধ হইয়াছে? ইহারা কোন্ রাজার সৈন্য? বাহিরের শত্রু ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, এখন আত্মরক্ষার উপায় কি? গৌড়ের রাজা কি রাজ্য ছাড়িয়া পলাতক?

মধ্যাহ্নকালে গোপা অলক্ষিতে দেবস্থানে গেল। কুটির-চক্রের বাহিরে নির্জন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে দেবস্থান, পাশেই চাতক ঠাকুরের একচালা। গোপা দেখিল, ঠাকুর অশ্বত্থ বৃক্ষের একটি উদ্গাত শিকড়ে মাথা রাখিয়া

ঊর্ধ্বমুখে শয়ান রহিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ।

গোপা আসিলে চাতক ঠাকুর উঠিয়া বসিলেন। দুই একটা অন্য কথার পর গোপা গত রাত্রির ঘটনা বলিল।

চাতক ঠাকুর অবহিত হইয়া শুনিলেন। গোপা নীরব হইলে তিনি একবার চোখ তুলিয়া তাহার পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। গোপা তাঁহার চোখের প্রশ্ন বুঝিয়া নীরবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। ঠাকুর তখন দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন— একথা চেপে রাখা চলবে না। গাঁয়ের সকলকে জানিয়ে দেওয়া ভাল।

গোপা বুঝিল, ঠাকুর কি ভাবিয়া একথা বলিলেন। সে বলিল— আপনি যা ভাল বোঝেন।

ঠাকুর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন— আমি যা দেখেছিলাম তা মিথ্যে নয়। কিন্তু ভেবেছিলাম একরকম, হল আর একরকম। যাক, যা হবার তাই হয়েছে। সব তো মনের মত হয় না, গোপা-বৌ। হয়তো ভালই হবে, রাঙার রাজপুত্তুর ফিরে আসবে। কিন্তু

কিন্তু কি ঠাকুর?

আমার মন বলছে বড় দুঃসময়ে আসছে। শুধু তোমার আমার নয়; আমরা তো খড়-কুটো। সারা দেশের দুঃসময়। ঝড় উঠেছে; রাজার সিংহাসন ভেঙে পড়বে, মন্দিরের চূড়া খসে পড়বে। সব ওলট-পালট হয়ে যাবে–

ভীত হইয়া গোপা বলিল— দীনদুঃখীদের কি হবে ঠাকুর?

ঠাকুর বলিলেন— যদি কেউ রক্ষা পায়, দীনদুঃখীরাই পাবে। জানো গোপা-বৌ, যখন কালবোশেখী আসে তখন তালগাছ শালগাছ ভেঙে পড়ে, কিন্তু বেতসলতার মত যারা নুয়ে পড়ে তারা বেঁচে যায়।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে কয়েকজন গ্রামবৃদ্ধ মহত্তর মহাশয়ের কুটিরমণ্ডপে পাটি পাতিয়া বসিয়াছিলেন। প্রাতঃকালের আকস্মিক সৈন্যসমাগমের আলোচনা হইতেছিল, এমন সময় চাতক ঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। আলাপ আলোচনা চলিতে লাগিল।–আজ শশাঙ্কদেব বাঁচিয়া নাই, তাই শত্রুর এত সাহস। …মানব কি সত্যই যুদ্ধে হারিয়া পলায়ন করিয়াছে?…কোথায় লুকাইয়া আছে?

চাতক ঠাকুর একটু কাশিয়া বলিলেন— মানবদেব কাল রাত্রে আমাদের গ্রামে লুকিয়ে ছিলেন।

সকলে উচ্চকিত হইয়া উঠিলেন। নানাবিধ উত্তেজিত প্রশ্নের উত্তরে চাতক ঠাকুর সংক্ষেপে ঘটনা বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন—কাল রাত্রে রাঙার সঙ্গে মানবদেবের বিয়ে হয়েছে। আজ ভোরে তিনি কানসোনায় ফিরে গেছেন।

আবার তুমুল তর্ক উঠিল। চাতক ঠাকুর স্মিতমুখে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। অবশেষে এক বৃদ্ধ সন্দিগ্ধভাবে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি এত কথা জানলে কোথা থেকে ঠাকুর? রাজা রাঙাকে বিয়ে করেছে তুমি চোখে দেখেছ?

চাতক ঠাকুর শান্তস্বরে একটি মিথ্যা কথা বলিলেন—আমিই বিয়ে দিয়েছি।

সে-রাতের দেবস্থানে ফিরিবার পথে ঠাকুর গোপাকে চুপি চুপি বলিয়া গেলেন— গোপা-বৌ, রাঙার সিঁথেয় সিঁদুর দিও। আর যদি কেউ জানতে চায়, বোলো আমি রাঙার বিয়ে দিয়েছি।

রঙ্গনা সীমন্তে সিন্দুর পরিল। যেন সোনার কমলে রক্ত-চন্দনের ছিটা। রঙ্গনাকে কেন্দ্র করিয়া সারা গ্রামে উত্তেজনার ঘূর্ণাবর্ত বহিয়া গেল। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি রঙ্গনার দিকে, সকলের চটুল রসনায় রঙ্গনার কথা। কিন্তু রঙ্গনার কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, সে যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন আছে। বরং গোপা গ্রামীণ-গ্রামীণাদের ঔৎসুক্য ও কৌতূহল দেখিয়া গর্বিত অবজ্ঞায় ঘাড় বাঁকাইয়া ভ্রূকুটি করে; কিন্তু রঙ্গনার গর্বও নাই, অভিমানও নাই। সে তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় নদীতে স্নান করিতে যায়; মেয়েদের কৌতুক কানাকানি তাহার কর্ণে প্রবেশ করে, কিন্তু অন্তর স্পর্শ করে না। তাহার সূক্ষ্ম অন্তঃ-প্রকৃতি যেন গ্রামের পরিবেশ ছাড়িয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে, জড় দেহটাই পিছনে পড়িয়া আছে।

একটি একটি করিয়া দিন কাটে, পক্ষ কাটে, মাস কাটিয়া যায়। হেমন্ত গিয়া হিম আসে, হিমের শেষে বসন্ত। রঙ্গনা নিজ দেহের অভ্যন্তরে নূতন জীবনের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করে। তাহার দেহ-মন ভরিয়া বিপুল হৃদয়াবেগ উথলিয়া উঠে। সে চুপি চুপি মানবের অঙ্গদটি পেটরা হইতে বাহির করিয়া বুকে চাপিয়া ধরে।

কিন্তু মানব ফিরিয়া আসে না; তাহার কোনও সংবাদও নাই। বহির্জগতের সহিত বেতসগ্রামের যোগাযোগ অতি অল্প; সেই যে একদল শত্রু-সৈন্য আসিয়াছিল, তারপর বাহির হইতে আর কেহ আসে নাই। গ্রামিকেরা কেহ কেহ কদাচ বাহিরে গিয়া কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনে। সে সংবাদও পাকা খবর নয়, জনশ্রুতি মাত্র। কর্ণসুবর্ণ পর্যন্ত যাইবার সাহস কাহারও নাই; সেখানে নাকি মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে, রক্তের স্রোত বহিতেছে। কোনও এক ভাস্করবর্মা নাকি গৌড়দেশ গ্রাস করিয়াছে। মানবদেবের কথা কেহ জানে না; সে মরিয়াছে। কি বাঁচিয়া আছে তাহাও অজ্ঞাত।

এ সকল কথা রঙ্গনার কানে পৌছায় না; কে পৌছাইবে? চাতক ঠাকুর জানেন, কিন্তু তিনি। নীরব থাকেন। মাঝে মাঝে গোপা ব্যাকুল হইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হয়, ঠাকুর তাহার প্রশ্ন এড়াইয়া যান। গোপার বুক দমিয়া যায়। কিন্তু সে নিজের আশঙ্কার কথা রঙ্গনাকে বলে না, আশায় বুক বাঁধিয়া থাকে।

রঙ্গনা প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে বেতসকুঞ্জে গিয়া শুইয়া থাকে। স্বপ্নলসার কল্পনায় নানা ক্রীড়া চলিতে থাকে। সে কল্পনায় শুনিতে পায়, বহু দূর হইতে জয়ন্তের ক্ষুরধ্বনি আসিতেছে...সাদা ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘকান্তি আরোহী...দূর্বা-হরিৎ প্রান্তরের উপর দিয়া অশ্বের মৃদু ক্ষুরধ্বনি ক্রমে। কাছে আসিতেছে...ঐ কুঞ্জের বাহিরে আসিয়া থামিল!— রঙ্গনা চমকিয়া উঠিয়া বসে; বেতস-শাখার ফাঁকে বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করে; আবার নিশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করে।

বেতসকুঞ্জে মন যখন বড় অধীর হয় তখন রঙ্গনা মৌরীর কিনারা ধরিয়া দক্ষিণদিকে যায়। দক্ষিণে গ্রামের সীমান্তে একটি বৃদ্ধ জটিল ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ঘন-শীতল ছায়াতলে বসিয়া অপলক নেত্রে দূরের পানে চাহিয়া থাকে— দূরে মাঠের শেষে বন আরম্ভ হইয়াছে; বনের শেষে নাকি আবার মাঠ আছে, তারপর কর্ণসুবর্ণ নগর। কত বিস্তীর্ণ এই পৃথিবী! এই পৃথিবীর অন্য প্রান্ত হইতে একটি মানুষ কি

আসিবে? কিন্তু সে যে আসিবে বলিয়া গিয়াছিল! কেন আসিবে না? কবে আসিবে?

এইভাবে বসন্ত ফুরাইয়া গেল। রঙ্গনা যখন প্রায় পূর্ণগর্ভা তখন একটি ঘটনা ঘটিল, রঙ্গনার জীবনের যাহা দৃঢ়তম অবলম্বন ছিল তাহা হঠাৎ খসিয়া গেল।

গোপা একদিন অপরাহ্বে শিকড়-বাকড়ের অন্বেষণে গ্রামের বাহিরে মাঠের দিকে গিয়াছিল। মাঠে এক বেদিয়া রমণীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বেদিয়ারা সাপ ধরে যত্রতত্র সাপের খেলা দেখাইয়া বেড়ায়, জাঙ্গলিক বিষবৈদ্যের কাছে সাপের বিষ বিক্রয় করে; আবার তুকতাক মন্ত্রৌষধি জানে, গুপ্তচরের কাজও করে। বেদেনীর সহিত গোপার অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা হইল। কি কথা হইল তাহা কেহ জানিল না। সন্ধ্যার সময় গোপা কুটিরে ফিরিয়া আসিল।

রঙ্গনা লক্ষ্য করিল না, তাহার মায়ের মুখ কালীবর্ণ, হাত-পা কাঁপিতেছে। গোপা আহার না করিয়াই শুইয়া পড়িল। স্বভাবতই সে আজকাল কম কথা বলে, আজ একটিও কথা বলিল না।

গভীর রাত্রে গোপার ত্রাস দিয়া জ্বর আসিল। প্রচণ্ড তাপ, গা পুড়িয়া যাইতেছে, চক্ষু জবা ফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। এই মরণান্তক জ্বর আর নামিল না। দুই দিন অঘোর অচৈতন্য থাকিবার পর গোপার প্রাণবিয়োগ হইল। মরণের পূর্বে কিন্তু সে একবার মুখ খুলিল না, একটি বাক্য নিঃসরণ করিল না। বেদেনীর মুখে যে ভয়ঙ্কর সংবাদ সে শুনিয়াছে তাহার ইঙ্গিত পর্যন্ত দিল না।

গ্রামবাসীরা মৃত্যু-মুহূর্তে বিবাদ-বিসংবাদ মনে রাখিল না, মৌরীর তীরে লইয়া গিয়া গোপার অন্ত্যেষ্টি করিল। তাহার দেহ ভস্ম হইয়া মৌরীর জলে মিশিল। গোপার জীবন-জ্বালা জুড়াইল।

গ্রামের কেহ কেহ গোপাকে বেদেনীর সহিত মাঠে কথা কহিতে দেখিয়াছিল, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল— বেদেনীই তুকতাক করিয়া গোপাকে মারিয়াছে। মৃত্যুর যে অন্য কারণ থাকিতে পারে তাহা কেহ ভাবিল না। গোপার জন্য অবশ্য কেহ শোক করিল না, কিন্তু রঙ্গনার প্রতি অনেকেরই মন সদয় হইল। গ্রামের বিবাদ ছিল গোপার সঙ্গে, কারণ গোপা ছিল মুখরা-প্রখরা। রঙ্গনার স্বভাব মায়ের মত নয়; সে নমনীয়া, মৃদু-স্বভাবা। সে অপরূপ রূপসী, তার উপর রাজবধূ। হোক এক রাত্রির বধূ, তবু রাজবধূ। কে বলিতে পারে, হয়তো মানবদেব কোন দিন ফিরিয়া আসিবে, রঙ্গনাকে চতুর্দোলায় তুলিয়া লইয়া যাইবে। গ্রামবাসীদের মন তাহার প্রতি প্রসন্ন হইল। গোপা যেন মরিয়া তাহাকে জাতে তুলিয়া দিয়া গেল।

মাতার মৃত্যুর পর দুই দিন রঙ্গনা ভূমিশয্যা ছাড়িয়া উঠিল না। চাতক ঠাকুর আসিলেন; স্বয়ং রন্ধন করিয়া তাহাকে খাওয়াইলেন। স্নিগ্ধস্বরে দুই চারিটি কথা বলিলেন।

মা কারও চিরকাল থাকে না, রাঙা। স্বামীর কথা ভাব। তোর পেটে যে আছে তার কথা ভাব।

রঙ্গনা মনে বল পাইল। মা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঠাকুর আছেন। না, সে সাহস হারাইবে না, হাল ছাড়িয়া দিবে না। যে-জন আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিবে। অনাগত জীবন-কণিকার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

রঙ্গনার জীবনযাত্রা আবার পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। কুটিরে সে একা। কিন্তু ক্রমে তাহাও অভ্যাস হইয়া গেল। পূর্বে মাতার আদেশে কাজ করিত; এখন নিজেই রন্ধন করে, নদীতে জল আনিতে যায়; সন্ধ্যায় চুল বাঁধে, সিঁথি ভরিয়া সিঁদুর পরে। আর প্রতীক্ষ করে—

চাতক ঠাকুর সময়ে অসময়ে আসিয়া তাহার দেখাশুনা করেন, গল্প করেন, জাতক-পুরাণের উপাখ্যান বলেন। রাত্রে সহার দেহলীতে আসিয়া শয়ন করেন।

এইভাবে নিদাঘও শেষ হইতে চলিল।

সূর্য আদ্রা নক্ষত্রের সংক্রমণ করিলে, একদিন সায়াহ্নে আকাশের দক্ষিণ হইতে কালো কালো মেঘ উঠিয়া আসিল। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দ্রুত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। কুটির দেহলীতে রঙ্গনা তখন চুল বাঁধিয়া পিত্তলের থালিকা মুখের কাছে ধরিয়া সীমন্তে সিন্দুর পরিতেছে, চাতক ঠাকুর অদূরে বসিয়া এক কৌতুককর কাহিনী বলিতেছেন, এমন সময় দশদিক ধাঁধিয়া নীল বিদ্যুৎ ঝলকিয়া উঠিল, পরক্ষণেই বিকট বজ্রনাদে আকাশ যেন ফাটিয়া পড়িল। রঙ্গনা হঠাৎ ভয় পাইয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িল।

বজ্রের হুঙ্কারধ্বনি প্রশমিত হইলে তীব্র ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল; তখন রঙ্গনা মাটি হইতে পাংশু-পাণ্ডুর মুখ তুলিল, একবার ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে ঠাকুরের পানে চাহিল, তারপর টলিতে টলিতে উঠিয়া কুটির কক্ষে প্রবেশ করিল।

ঠাকুর তাহার ভয়-বিস্ফারিত দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। তিনি বৃষ্টির মধ্যে ছুটিয়া গিয়া আশেপাশের কুটির হইতে দুই জন স্ত্রীলোককে ডাকিয়া আনিলেন।

দুইদণ্ড মধ্যে রঙ্গনা সন্তান প্রসব করিল; বজ্র-বিদ্যুতের হুড়কধ্বনির মধ্যে শিশু কণ্ঠের ক্ষীণ কাকুতি শুনা গেল। ঠাকুর দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন, উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কী হল, ছেলে না মেয়ে?

বন্ধ দ্বারের ওপার হইতে একটি স্ত্রীলোক বলিল— ছেলে।

আহ্লাদে ঠাকুরের মন ভরিয়া উঠিল। তিনি দুই হস্ত সহর্ষে ঘর্ষণ করিতে করিতে নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—ভাল ভাল! আহা ভাল হয়েছে। রাজার ছেলে, বজ্রের ভেরী বাজিয়ে এসেছে। ওর নাম রাখলাম—বজ্র। শশাঙ্কদেবের পৌত্র, মানবদেবের পুত্র বজ্রদেব। ওর মায়েরও নাম রেখেছিলাম, আবার ওর নাম রাখলাম। আহা বেঁচে থাক, মার কোল জুড়ে থাক।

আকাশে ঘন দুর্যোগ; ধরণীপৃষ্ঠে বৃষ্টির লাজাঞ্জলি বর্ষণ। মেঘের বিতানতলে মর্দলঝল্লরীর রণবাদ্য বাজিতেছে, আবার তড়িল্লতার নৃত্যবিলাস চলিয়াছে। সদ্যোজাত শিশুর অদৃষ্টদেবতা যেন জন্মকালেই তাহার ললাটে ভবিতব্যের তিলক পরাইয়া দিলেন।

–

স্থির জলাশয়ের মাঝখানে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে তরঙ্গচক্র উত্থিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; শৈবালদল তালে তালে নাচিতে থাকে, কুমুদ কহ্লার দুলিয়া দুলিয়া হাসে। তারপর আবার শান্ত হয়।

বজ্রের জন্ম-সংবাদ তেমনি ক্ষুদ্র বেতসগ্রামে আন্দোলন তুলিল বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। রাজ-সমাগম এবং রঙ্গনার বিবাহের ইতিহাস ইতিপূর্বেই পুরানো হইয়া গিয়াছে, বজ্রের জন্মেও অপ্রত্যাশিত নূতনত্ব কিছু নাই। তাই এই ঘটনা লইয়া গ্রামের জল্পনা কল্পনা শীঘ্রই শান্ত হইল।

গোপার মৃত্যুর পর গ্রামরমণীদের মন রঙ্গনার প্রতি অনুকূল হইয়াছিল; কিন্তু একটি কারণে এই অনুকূলতা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল না। যে মেয়েরা রঙ্গনার সঙ্গে সখিত্ব স্থাপন করিতে আসিল, রঙ্গনা তাহাদের সহিত সরলভাবে হাসিয়া কথা কহিল, তাহাদের ছেলে দেখাইল, লজ্জিত নতমুখে তাহাদের রঙ্গ-পরিহাস গ্রহণ করিল; কিন্তু তবু গ্রামের মেয়েরা অনুভব করিল রঙ্গনার গোটা মনটা যেন উপস্থিত নাই; যেন প্রত্যক্ষ জগতের সহিত তাহার নাড়ির যোগ ছিঁড়িয়া গিয়াছে; সর্বদাই যেন সে অন্যমনস্ক হইয়া আছে, উৎকর্ণ হইয়া আছে, দূরাগত পদধ্বনি শুনিবার চেষ্টা করিতেছে। যখন সে একাগ্র তন্ময় হইয়া ছেলের পানে চাহিয়া থাকে তখনও মনে হয় সে ছেলেকে দেখিতেছে না, ছেলের মুখে চোখে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আর একজনের পরিচয়-চিহ্ন খুঁজিতেছে। গ্রামের মেয়েরা বুঝিল রঙ্গনা থাকিয়াও নাই। রঙ্গনার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ শিথিল হইয়া পড়িল। পূর্বেকার বিদ্বেষভাবে ফিরিয়া আসিল না বটে, কিন্তু অন্তরঙ্গ হইবার চেষ্টাও

আর রহিল না। হংসী যেমন জলে বাস করিয়াও জলের নয়, রঙ্গনা তেমনি নির্লিপ্তভাবে গ্রামে রহিল।

বজ্র বড় হইতে লাগিল। মাতৃক্রোড় হইতে কুটির-কুট্টিমে নামিল, সেখান হইতে প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ হইতে গ্রামের মাঠে-ঘাটে। মাতৃস্তন ছাড়িয়া গো-দুগ্ধ, তারপর অন্ন। বজ্রের প্রকৃতি যে সাধারণ শিশু হইতে পৃথক, তাহা তাহার জন্মকাল হইতে লক্ষিত হইয়াছিল। সে বেশি কাঁদে না, আঘাত লাগিলে বা ক্ষুধা পাইলেও কাঁদে না। যখন কথা বলিতে শিখিল, তখনও অধিক কথা বলে না, যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলে। সে চঞ্চল নয়, চুপ করিয়া একস্থানে বসিয়া থাকে এবং অন্য শিশুদের ছুটাছুটি লক্ষ্য করে, কিন্তু অকারণে ছুটাছুটি করে

না। যখন একাকী থাকে তখন একদৃষ্টে একদিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে, কি চিন্তা করে তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা যায়। না।

অথচ সে মেধাবী; তাহার মন সর্ববিষয়ে সজাগ ও সচেতন। দেহের দিক দিয়া যেমন সমবয়স্ক বালকদের তুলনায় অধিক বৃদ্ধিশীল, মনের দিক দিয়াও তেমনি। বজ্রের যখন পাঁচ বছর বয়স, চাতক ঠাকুর তখন তাহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। গ্রামের কেহই লিখিতে পড়িতে জানিত না, চাতক ঠাকুরও না। মুখে মুখে শিক্ষা। চাতক ঠাকুর তাহাকে মুখে মুখে অঙ্ক শিখাইলেন; কড়া গণ্ডা পণ, যোগ বিয়োগ হরণ পূরণ। বজ্র দ্রুত শিখিল এবং যাহা শিখিল তাহা মনে করিয়া রাখিল।

চাতক ঠাকুর যখন বজ্রকে শিক্ষা দিতেন রঙ্গনা কাছে বসিয়া থাকিত। কখনও গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তর মন দিয়া শুনিত, কখনও সব ভুলিয়া তন্ময় দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত।

বজ্রের বয়স সাত-আট বছর হইলে চাতক ঠাকুর তাহাকে ছিপ দিয়া মাছ ধরিতে শিখাইলেন। বজ্র একেই আত্মসমাহিত শান্তস্বভাব বালক, সে ছিপ লইয়া সারাদিন মৌরীর তীরে বসিয়া থাকিত; সন্ধ্যার সময় মাছ লইয়া হাসিমুখে মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইত। ইহার পর এমন একদিনও যাইত না যেদিন রঙ্গনাকে নিরামিষ খাইতে হইত। কোনও দিন পুঁটি-খয়রা, কোনও দিন শোলের পোনা, কোনও দিন মৌরলা।

মাছ ধরা ছাড়া আর একটি কাজও বজ্র ভালবাসিত, সাঁতার কাটা। সাঁতার কাটিতে কেহ তাহাকে শিখায় নাই, সে নিজেই শিখিয়াছিল। একদিন সে মৌরীর তীরে একাকী খেলা করিতে করিতে উঁচু পাড় হইতে জলে পড়িয়া যায়। সাহায্য করিবার কেহ নাই, সে নিজেই হাত-পা ছুঁড়িয়া তীরে উঠিয়াছিল। তারপর সাঁতার শেখা তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই। ইচ্ছা হইলেই সে সাঁতার কাটিয়া মৌরী এপার ওপার হইত, বলিষ্ঠ বাহুর তাড়নে নদীর জল তোলপাড় করিত।

ভিল্ল জাতীয় এক বনচর মাঝে মাঝে গ্রামে আসিত। উত্তরের জঙ্গল হইতে হরিণ বা ময়ূর মারিয়া গ্রামে লইয়া আসিত; মাংসের বিনিময়ে গুড় ও তণ্ডুল লইয়া যাইত। মসীকৃষ্ণ দেহের বর্ণ, পরিধানে পশুচর্ম, কেশের মধ্যে কঙ্কপত্র, মুখে সরল হাসি। ধনুক কাঁধে লইয়া সে যেদিন বজ্রের সম্মুখে দাঁড়াইল, বজ্র অপলক নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। বজ্রের বয়স তখন নয়-দশ বৎসর, ভিলকে সে পূর্বে কখনও দেখে নাই।

ভিল একটি হরিণ মারিয়া আনিয়াছিল। গ্রামের কয়েকজন হরিণ কিনিয়া লইল, পরিবর্তে ভিলকে গুড় ও শস্য দিল।

ভিল যখন ফিরিয়া চলিল বজ্রও তাহার পিছন পিছন চলিল। গ্রামের উত্তরে বাথান পার হইয়া ভিল পলাশবনে প্রবেশ করিল, তখনও বজ্র তাহার পিছন ছাড়িল না। ভিল তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল, হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কি চাও?

বজ্ৰ বলিল— তুমি কি করে হরিণ মারো?

ভিল হাসিয়া উঠিল—এই তীরধনুক দিয়ে।

তীরধনুক কিছুক্ষণ উৎসুক চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বজ্ৰ বলিল— ও দিয়ে হরিণ মারা যায়? ভিল আবার হাসিল। শুভ্রকান্তি বলিষ্ঠ দেহ বালককে তাহার ভাল লাগিল। সে বলিল—মারা যায়। দেখবে?

অদূরে উচ্চ বৃক্ষচুড়ে একগুচ্ছ ফুল ফুটিয়া ছিল। ভিল ধনুতে তীর সংযোগ করিয়া পুষ্পগুচ্ছের প্রতি লক্ষ্য করিল; আকৃষ্ট ধনু হইতে টঙ্কার শব্দে তীর ছুটিয়া গেল। রক্তবর্ণ কিংশুকগুচ্ছ মাটিতে পড়িল।

ভিল ফুলের গুচ্ছটি বজ্রের হাতে দিল, তারপর নিজের তীর তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বনের পথে চলিল। কিছুদূর গিয়া ভিল দেখিল তখনও বজ্র তাহার পশ্চাতে আসিতেছে। সে বলিল— আবার কি?

বজ্ৰ বলিল— আমাকে শেখাবে?

ভিল বলিল—শেখাতে পারি। কিন্তু তুমি আমায় কি শেখাবে?

বজ্র চিন্তা করিয়া বলিল— আমি তোমাকে বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরতে শেখাব। ভিল হৃষ্ট হইয়া বলিল— আচ্ছা। এবার আমি তাড়াতাড়ি আসব। তোমার জন্যে নতুন তীরধনুক তৈরি করে আনব।

কিংশুকগুচ্ছটি লইয়া বজ্র ছুটিতে ছুটিতে কুটিরে ফিরিয়া আসিল। এত আহ্লাদ ও উত্তেজনা তাহার জীবনে এই প্রথম। মাকে সম্মুখে পাইয়া সে দুই বাহু দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। রঙ্গনা তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল—কি রে!

লজ্জা পাইয়া বজ্র একটু শান্ত হইল; মায়ের চুলে রাঙা ফুলগুলি পুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল— আমি তীরধনুক শিখব।

রঙ্গনা ছেলের মুখখানি দুই হাতে ধরিয়া বিস্ময়-বেদনাভরা চোখে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মানব চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু যেন সম্পূর্ণ চলিয়া যায় নাই; নিজের খানিকটা রঙ্গনার কাছে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছে। আবার সে আসিবে, যত বিলম্বেই হোক আবার সে ফিরিয়া আসিবে। রঙ্গনার প্রতীক্ষা বিফল হইবে না।

যারা সংসারী তাহাদের যৌবন অধিক দিন থাকে না। কিন্তু রঙ্গনা সংসারের ফাঁদে ধরা দেয়। নাই, নিজের অন্তরের কল্পলোকে বাস করিয়াছে; তাই কালের নখরাঘাত তাহার অঙ্গে লাগে নাই। এখনও তাহাকে দেখিলে মনে হয়, সে নববধূ; অনাঘ্রাত পুষ্প, অনাস্বাদিত মধু। দশ বৎসর পূর্বের সেই একটি হৈমন্তী রজনী যেন তাহার রূপ-যৌবনকে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে, দেহে মনে সে আর একটি দিনও বাড়ে নাই।

কিন্তু কালচক্র ঘুরিতেছে। কাহারও পক্ষে মন্থর, কাহারও পক্ষে দ্রুত। রঙ্গনার প্রতীক্ষায় এখন আর ত্বরা নাই, অধীরতা নাই। কিন্তু বজ্রের জীবনে এই প্রথম এক নূতন আকর্ষণ আসিয়াছে, তাহার স্থির স্বভাবকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কৈশোরের স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতায় সে সারাদিন বনের কিনারায় ঘুরিয়া বেড়ায়; মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া ভাবে, কাল নিশ্চয় ভিল আসিবে।

প্রায় এক মাস পরে ভিল আসিল। নূতন তীরধনুক পাইয়া বজ্রের আনন্দের সীমা নাই। ভিল তাহাকে হাতে ধরিয়া তীর ছুঁড়িতে শিখাইল; কি করিয়া তীরের পিছনে পুঙ্খ লাগাইয়া তীরের গতি সিধা করিতে হয় তাহা

দেখাইয়া দিল। পরিবর্তে বজ্ৰ ভিলকে বঁড়শি দিল এবং নদীতে মাছ ধরিবার কৌশল শিখাইল। দিনের শেষে বিদ্যার আদান-প্রদান সম্পূর্ণ হইলে ভীল মহামূল্য বঁড়শি লইয়া চলিয়া গেল। আর বজ্র সে-রাত্রে তীরধনুক পাশে লইয়া শয়ন করিল।

অতঃপর বজ্র উত্তরের বনে মৃগ অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। ক্রমে তাহার লক্ষ্য স্থির হইল; সে ময়ূর মারিল, হরিণ মারিল, উড়ন্ত পাখি তীর দিয়া মাটিতে ফেলিতে সমর্থ হইল। তারপর ভিল যখন মাঝে মাঝে আসিত, বজ্রের অব্যর্থ লক্ষ্যবেধ দেখিয়া প্রশংসা করিত, আরও নূতন কৌশল শিখাইয়া দিত।

এইরূপ বিচিত্র পথে বজ্রের শিক্ষাদীক্ষা অগ্রসর হইল। দেহ ও মন দ্রুত পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু ইষদগম্ভীর সঙ্গাকাঙ্খাহীন শান্ত স্বভাবের পরিবর্তন হইল না।

বজ্রের যখন বারো বছর বয়স তখন একটি ব্যাপার ঘটিল। গ্রামে মধু নামে এক বালক ছিল; কুচ্চশিখর বৃহত্মাণ্ড কৃষ্ণকায় বালক, বয়সে বজ্র অপেক্ষা দুই এক বৎসরের জ্যেষ্ঠ। মধুর স্বভাব অতিশয় দুরন্ত ও কলহপ্রিয়; তাহার পিতা তাহাকে শাসন করিতে পারিত না। মধু তাহার সমবয়স্ক ও কনিষ্ঠ বালক-বালিকাদের উপর অশেষ দৌরাত্ম করিত। তাহার দেহও বয়সের অনুপাতে বলিষ্ঠ, কেহ তাহার সহিত আঁটিয়া উঠিত না।

বজ্রের সহিত গ্রামের কোনও বালকেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, মধুরও ছিল না। মধু মনে মনে বজ্রকে ঈর্ষা করিত, কিন্তু তাহাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিত না। দূর হইতে নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে বর্জকে ব্যঙ্গভরে রাজপুত্তুর বলিয়া উল্লেখ করিত। বজ্র কদাচিৎ শুনিতে পাইলেও তাহা গায়ে মাখিত না। রাজপুত্র সম্বোধনে কোনও গ্লানির ইঙ্গিত আছে তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

মধুর অত্যাচার উৎপীড়নের বিশেষ পাত্রী একটি মেয়ে ছিল, তাহার নাম গুঞ্জা। গুঞ্জা মধুর দূরসম্পর্কের ভগিনী, শৈশবে পিতামাতাকে হারাইয়া সে মধুদের গৃহেই আশ্রয় পাইয়াছিল। গুঞ্জার বয়স সাত বৎসর, কিন্তু তাহাকে দেখিলে আরও অল্পবয়স্ক মনে হইত। ক্ষীণাঙ্গী, মলিন, তামার ন্যায় বর্ণ; মুখখানি তরতরে, চোখ দুটি বড় বড় ভাসা-ভাসা। কিন্তু চোখে সর্বদাই প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক। এই পরপালিতা অনাদৃতা মেয়েটিকে মধু নানাভাবে নিগ্রহ করিত। সে ছিল মধুর আজ্ঞাকারিণী দাসী; রাগ হইলে মধু তাহাকে মারিত, চুল ছিঁড়িয়া দিত। গুঞ্জা নীরবে সহ্য করিত; মধুর ক্রোধ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার কেহ ছিল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা মধু তাহার অনুচর বালক-বালিকাদের লইয়া মৌরীর উঁচু পাড়ের উপর খেলা করিতেছিল। হঠাৎ কি কারণে ঝগড়া হইল; মধু গুঞ্জাকে সম্মুখে পাইয়া মারিতে আরম্ভ করিল, তারপর তাহার চুল ধরিয়া টানিতে টানিতে পাড়ের কিনারায় লইয়া গিয়া ঠেলা দিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল।

বজ্র অদূরে মৌরীর জলে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া ছিল। সে জলে লাফাইয়া পড়িয়া গুঞ্জাকে টানিয়া তুলিল। গুঞ্জার একটা হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে; ভয়ে ও যন্ত্রণায় মূর্ছিতপ্রায় অবস্থা। সে এক হাতে বজ্রের গলা জড়াইয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বজ তাহাকে তুলিয়া লইয়া পাড়ের উপর উঠিয়া আসিল। দলের ছেলেমেয়ে অধিকাংশই পলাইয়াছিল, দুই একজন মাত্র ছিল। বজ্র গুঞ্জাকে মাটিতে নামাইয়া মধুর দিকে অগ্রসর হইল। তাহার গৌরবর্ণ মুখ লাল

হইয়া উঠিয়াছে, দেহের স্নায়ুপেশী কঠিন। সে মধুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

মধু হটিল না, ক্ষুদ্র আরক্ত চোখে হিংস্রতা ভরিয়া বিদ্রুপ করিল— রাজপুত্তুর! রাজপুত্তুর!

বজ্ৰ মধুর গালে একটি বজ্রসম চড় মারিল।

তারপর যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহাকে মল্লযুদ্ধ বলা চলে, আবার ষাঁড়ের লড়াই বলিলেও অন্যায় হয় না। মধু বয়সে বড়, তার উপর বন্য স্বভাব; সে নখদন্ত দিয়া শ্বাপদের ন্যায় লড়াই করিল, বজ্রের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বজ্রের সহিত পারিল না। বজ্রের দেহে পিতৃদত্ত অটল শক্তি ছিল, তাহাই জয়ী হইল। একদণ্ড যুদ্ধের পর মধু ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়া আর উঠিল না, তাহার দেহে আর নড়িবার শক্তি নাই। বজ্র তখন যুদ্ধের মান্ধতায় জ্ঞানশূন্য, সে মধুর একটা পা ধরিয়া টানিতে টানিতে নদীর পাড়ের দিকে লইয়া চলিল। উদ্দেশ্য জলে ফেলিয়া দিবে।

ইতিমধ্যে গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিল, চাতক ঠাকুরও আসিয়াছিলেন। তিনি গিয়া বজ্রের হাত ধরিলেন। বলিলেন–ছেড়ে দাও। যথেষ্ট হয়েছে।

বজ্ৰ মধুকে ছাড়িয়া দিল। চাতক ঠাকুর তাহাকে হাত ধরিয়া সরাইয়া লইয়া গেলেন। গুঞ্জা অদূরে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছিল, তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–কি হয়েছিল?

বজ ও গুঞ্জা ঘটনা বিবৃত করিল। সকলে শুনিয়া বজ্রের সাধুবাদ করিল। মধুর দুঃশীল দুর্দান্ত স্বভাবের জন্য কেহই তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিল না, তাহার শাস্তিতে সকলে সন্তুষ্ট হইল।

গুঞ্জার কান্না কিন্তু থামে না। চাতক ঠাকুর তাহাকে ও বর্জকে লইয়া দেবস্থানে গেলেন; বুড়ির গুয়া পান পাতা দিয়া গুঞ্জার ভাঙ্গা হাত বাঁধিয়া দিলেন। হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন—মধুমথন। বজ্র, আজ থেকে তোমার একটা নাম হল মধুমথন।

বজ্র কিন্তু হাসিল না। তাহার রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে কিন্তু মনের উষ্ণতা দূর হয় নাই। সে বলিল —ও আমাকে রাজপুত্তুর বলে কেন?

চাতক ঠাকুর চকিত হইয়া তাহার পানে চাহিলেন, তারপর সহজ সুরে বলিলেন— তুমি রাজার ছেলে, তাই রাজপুত্র বলে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বজ্র প্রশ্ন করিল—আমার পিতা কোথায়?

চাতক ঠাকুর তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—বজ, তুমি এখন ছেলেমানুষ, তোমার পিতৃ-পরিচয় এখন জানতে চেও না। যখন বড় হবে, জানতে পারবে।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল–কবে বড় হব? কতদিনে জানতে পারব?

চাতক ঠাকুর বলিলেন—তোমার যখন কুড়ি বছর বয়স হবে তখন জানতে পারবে। তোমার মা তোমাকে বলবেন।

বজ্র আর প্রশ্ন করিল না; কথাটি মনের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিল।

সন্ধ্যার পর বজ্র গুঞ্জার হাত ধরিয়া নিজ কুটিরে লইয়া গেল; মাকে বলিল— মা, আজ থেকে গুঞ্জা আমাদের কাছে থাকবে।

রঙ্গনা দুই হাত বাড়াইয়া গুঞ্জাকে কোলে টানিয়া লইল। সে রাত্রে রঙ্গনার এক পাশে বজ্র, অন্য পাশে গুঞ্জা শয়ন করিয়া ঘুমাইল।

গুঞ্জা বজ্রের গৃহেই রহিয়া গেল। তাহার মাতুল আপত্তি করিল না; চাতক ঠাকুর ব্যাপারটিকে সহজ ও স্বাভাবিক করিয়া দিলেন।

আদর যত্ন ও ভালবাসা পাইয়া গুঞ্জার শ্ৰী দিনে দিনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাহার ভাঙ্গা হাত জোড়া লাগিল; মলিন তামার মত বর্ণ উজ্জ্বল মার্জিত তাবর্ণে পরিণত হইল, চোখের শঙ্কাকাতর দৃষ্টি দূর হইল।

একদিন কুটির প্রাঙ্গণে বসিয়া বজ্ৰ ধনুকে নূতন ছিলা পরাইতেছিল, গুঞ্জা আসিয়া পিছন হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল; কানে কানে বলিল— মধুমথন।

বজ্র তাহাকে টানিয়া সম্মুখে আনিল–কি বললে?

গুঞ্জা বলিল— আমি তোমাকে মধুমথন বলে ডাকব।

বজ্র হাসিল। বলিল— আমিও তোমাকে অন্য নামে ডাকব, গুঞ্জা বলে ডাকব না।

উৎসুক চক্ষে চাহিয়া গুঞ্জা জিজ্ঞাসা করিল—কি বলে ডাকবে?

গুঞ্জার মেঘবরণ চুল ধরিয়া টানিয়া বজ্র তাহার কানে কানে বলিল— কুঁচবরণ কন্যা।

-

বজ্র যখন তীরধনুক লইয়া উত্তরের বনে শিকার করিতে যাইত তখন গুঞ্জাও কদাচ তাহার সঙ্গে থাকিত। দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া অরণ্যের রৌদ্র ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত, ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিত। গুঞ্জা সঙ্গে থাকিলে শিকার বড় হইত না। গুঞ্জা শিকারে যাইতে ভালবাসে কিন্তু মৃত পশুপক্ষী দেখিলে তাহার কান্না আসে। তাহার কান্না দেখিয়া বজ্র প্রথম প্রথম হাসিত; কিন্তু তারপর তাহার সম্মুখে প্রাণী হত্যা করিতে আর তাহার মন সরিত না।

এইভাবে কৌমার অতিক্রম করিয়া তাহারা একসঙ্গে যৌবনে পদার্পণ করিল। বজ্রের যৌবন-পরিণত দেহ হইল তাহার পিতার দেহের প্রতিকৃতি। তেমনই দীর্ঘ প্রাণসার; বেত্রবৎ সাবলীল। হয়তো আরও একটু সুকুমার; পিতার পৌরুষের উপর মাতার লাবণ্য যেন স্নেহের প্রলেপ দিয়াছে। মাথার গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ স্কন্ধ পর্যন্ত নামিয়াছে, মুখে গুম্ফের সূক্ষ্ম রোমরাজি কজ্জলরেখার ন্যায় মুখের শ্রীবর্ধন করিয়াছে। সে যখন ধনু স্কন্ধে লইয়া দাঁড়াইত, তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইত যে মহাভারতের অর্জুন; যে অর্জুন পাঞ্চাল রাজসভায় মৎস্য চক্ষু বিদ্ধ করিয়াছিল সেই ভস্মাচ্ছাদিত তরুণ বহ্নি।

বজ্রের পাশে গুঞ্জাকে দেখাইত— শুভ্র রাজহংসের পাশে হেমবরণী চক্রবাকীর ন্যায়। শুধু নবযৌবনের শ্রী নয়, মনের সুখ ও ভালবাসা গুঞ্জাকে লাবণ্যময়ী করিয়া তুলিয়াছিল। কৈশোরের নিত্য সাহচর্য যে স্নেহ-প্রগ অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি করিয়াছিল, যৌবনের অভ্যুদয়ে তাহাই নিবিড় আসক্তিতে ঘনীভূত হইয়াছিল। কিন্তু এই আসক্তির বাহ্য প্রকাশ কিছু ছিল না। দুইজনে প্রায় সর্বদা একসঙ্গে থাকিত, দুইজনেই জানিত তাহাদের জীবন পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গিয়াছে; কিন্তু তবু কোনও দিন তাহাদের আচরণে কোনও বিহ্বলতা প্রকাশ পায় নাই। একটিবার কেহ মুখ ফুটিয়া বলে নাই, আমি তোমায় ভালবাসি।

কেবল একবার নিজেদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে আর তাহারা বালক-বালিকা নয়; অকস্মাৎ যৌবনের তীক্ষ্ণতপ্ত মাদকতার স্বাদ পাইয়াছিল।

যৌবন প্রাপ্তির পরেও তাহারা একসঙ্গে শিকার করিতে যাইত। একদিন চৈত্র মাসে তাহারা কিরাতবেশী

দেবমিথুনের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিতেছিল। দ্বিপ্রহরের মন্থর বাতাস তরুচ্ছায়াতলে শীতল আবার আতপতাপে উষ্ণ হইয়া বহিতেছে; পক্ক মধুকের গুরু সুগন্ধ বনভূমিকে আমোদিত করিয়াছে। পত্রান্তরাল হইতে বন-কপোতের ভীরু কূজন বৃন্তচ্যুত পুষ্পপল্লবের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছে। মদালস মধ্যাহ্নে বনপ্রকৃতি যেন তন্দ্রাতুরা।

একটি উচ্চ বৃক্ষতলে আসিয়া বজ্র ও গুঞ্জা দাঁড়াইল। ঊর্ধ্ব হইতে ঘন গুঞ্জনধ্বনি আসিতেছে; উভয়ে মুখ তুলিয়া দেখিল, প্রায় বিশ হাত উচ্চে একটি শাখা হইতে মধুচক্র ঝুলিতেছে; মৌমাছিরা অদূরস্থ মহুয়াগাছ হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, তাহারই গুঞ্জরন।

বজ্র সপ্রশ্ন নেত্রে গুঞ্জার পানে চাহিল, গুঞ্জা স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িল। তখন বজ্র তীরধনুক লইয়া মৌচাক লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। তীর মৌচাক বিদ্ধ করিয়া মধুলিপ্ত দেহে মাটিতে পড়িল। মৌমাছিরা বহু ঊর্ধ্ব হইতে আততায়ীকে লক্ষ্য করিল না, তাই বিশেষ বিচলিত হইল না। গুঞ্জা গাছের পাতা ছিঁড়িয়া পত্রপুট রচনা করিয়া মাটিতে রাখিল। চাক হইতে বিন্দু বিন্দু গাঢ় মধু ক্ষরিত হইয়া তাহাতে পড়িতে লাগিল।

পর্ণপুটে মধু সঞ্চিত হইলে দুজনে তাহা ভাগ করিয়া পান করিল, তারপর তৃপ্ত মনে আবার একদিকে চলিল। শিকার সন্ধানের কোনও ব্যগ্রতা নাই, একসঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ানোই যেন একমাত্র উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিবার পর গুঞ্জা বলিল— এস, কোথাও বসি।

একটি ময়ূর ও দুই তিনটি ময়ুরী এক বৃক্ষের ঘনপল্লব ছায়াতলে বিশ্রাম করিতেছিল, তাহাদের আসিতে দেখিয়া সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর ত্রস্ত কেকাধ্বনি করিয়া বিপরীত দিকে পলায়ন করিল। বজ্র দ্রুত ধনুতে তীর সংযোগ করিয়াছিল, কিন্তু গুঞ্জা তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল— না।

গাছের তলায় দুইটি সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ পড়িয়াছিল, গুঞ্জা তাহা তুলিয়া লইয়া হাসিমুখে বজ্রের হাতে দিল; বজ্র সেই দুটি হইতে চন্দ্রক অংশ ছিঁড়িয়া লইয়া গুঞ্জার দুই কানে দুল দুলাইয়া দিল। স্মিতমুখে বলিল— কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল, তোমার কানেতে কন্যা পিঞ্জের দুল।

কতদিনের পুরানো ছড়া, কাহার জন্য কে রচনা করিয়াছিল কে জানে। কিন্তু মধুমথনের মুখে ঐ ছড়াটি শুনিলে মনে হয় যেন গুঞ্জাকে লক্ষ্য করিয়া উহা রচিত হইয়াছিল। গুঞ্জা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তরুতলে বসিল, সম্মুখে পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠভার এলাইয়া দিল। কুঁচবরণ কন্যা! আর মধুমথন? মধুমথন নামটির স্বাদ যেন চাকভাঙ্গা মধুর মত মিষ্টি, মধুর মাদকতার ন্যায় রক্তস্রোতে প্রবেশ করিয়া অনুরণিত হয়। —মধুমথন!–

বজ্র ধনুর্বাণ মাটিতে ফেলিয়া আলস্য ভাঙ্গিল, তারপর গুঞ্জার ঊরুর উপর মাথা রাখিয়া তৃণশয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল।

এইভাবে কিছুক্ষণ দুইজনে চোখে চোখে চাহিয়া রহিল। শান্ত নিরুদ্বেগ দৃষ্টি, নিস্তরঙ্গ মনের প্রতিবিম্ব। গুঞ্জার একটি হাত বজ্রের কেশগুচ্ছ লইয়া খেলা করিতেছে; একবার গণ্ডে হাত বুলাইয়া একটি ইন্দ্রতুলক মুছিয়া লইল। ক্রমে বজ্রের চক্ষু তন্দ্রায় মুদিয়া আসিল।

গুঞ্জা অর্ধনিমীলিত নেত্র তাহার মুখের পানে নত করিয়া রহিল। সাত বছর ধরিয়া ওই মুখখানি সে অহরহ দেখিয়াছে, কিন্তু নয়ন তৃপ্ত হয় নাই। আজ চৈত্রের কবোষ্ণ মধ্যাহ্নে নির্জন বনের ছায়ান্তরালে বসিয়া একটি কুশাগ্রতুল্য বাসনা তাহার মনে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। মধুমথন বোধহয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ধীর নিশ্বাসের ছন্দে তাহার বক্ষ উঠিতেছে পড়িতেছে; রক্তিম অধরে যেন মধুসিক্ত সরসতা এখনও লাগিয়া আছে। গুঞ্জা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সন্তর্পণে সম্মুখ দিকে নত হইল; নিজ অধর দিয়া অতি লঘুভাবে বজ্রের অধর স্পর্শ করিল।

বজ্র হয়তো জাগিয়াছিল; হয়তো অস্পষ্ট তন্দ্রালোকে বিচরণ করিতেছিল; নিমেষ মধ্যে তাহার দুই বাহু গুঞ্জার কণ্ঠ জড়াইয়া লইল। দীর্ঘকাল তাহাদের অধর দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হইয়া রহিল। তারপর বজ্র চক্ষু মেলিয়া গুঞ্জাকে ছাড়িয়া দিল।

গুঞ্জার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে, অধর পাণ্ডুবর্ণ। সে মুদ্রিত চক্ষে মাথাটি বৃক্ষকাণ্ডে রাখিয়া ঊর্ধ্বমুখীন হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

কুঁচবরণ কন্যা!

গুঞ্জা চক্ষু খুলিল না, কিন্তু তাহার মুখখানি ধীরে ধীরে আরক্তিম হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় একটা কোকিল গাছে আসিয়া বসিল এবং বিস্ময়োফুল্ল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল— কু কু কু!

বজ্র তীরবিদ্ধবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। গুঞ্জাকে পরম বিস্ময়ে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল। গুঞ্জা একবার বজ্রের চোখের পানে চোখ তুলিয়াই আবার নতমুখে বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিল; তাহার মনে হইল তাহার দেহের অস্থিগুলা সব দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বজ্র তাহার হাত দৃঢ় মুষ্টিতে আকর্ষণ করিয়া তরুতল হইতে লইয়া চলিল, ঈষৎ শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল — চল, মার কাছে ফিরে যাই।

এই ঘটনার পর দুজনের মাঝখানে যেন সূক্ষ্ম অথচ রহস্যমধুর লজ্জার একটি আবরণ পড়িয়া গেল, কিন্তু এই আবরণ তাহাদের মাঝে ব্যবধানের সৃষ্টি করিল না, বরং আরও নিবিড়ভাবে উভয়ের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া দুচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে বাঁধিয়া দিল।

বজ্র ও গুঞ্জার অনুরাগ, প্রকাশ্য না হইলেও, গ্রামের কাহারও অবিদিত ছিল না। সকলেই জানিত তাহাদের বিবাহ হইবে। কিন্তু দুইজনেই প্রাপ্ত-যৌবন, অথচ বিবাহের কোনও উদ্যোগ নাই। রঙ্গনা জল আনিতে নদীর ঘাটে যাইলে অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা তাহাকে প্রশ্ন করিত— হ্যাঁ রাঙা, বেটার বিয়ে না দিয়েই তো ঘরে বৌ পেয়েছ। তা এবার বিয়ে দাও। আর কবে দেবে?

রঙ্গনা হাসিয়া বলিত— আমি জানি না, ঠাকুর জানেন। তিনি বললেই দিয়ে দেব।

ঠাকুরকে বলিলে তিনি কিছুক্ষণ অন্য মনে আকাশের পানে চাহিয়া থাকিতেন, বলিতেন—আর দুদিন যাক্।

এইভাবে বজ্রের জন্মের পর উনিশ বছর কাটিয়া গেল। বয়ঃপ্রাপ্তির পর বজ্র যে কেবল শিকার করিয়া বেড়াইত তাহা নয়, প্রয়োজন কালে গ্রামের যৌথ কাজকর্মেও যোগ দিত। নিজের সহজাত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া সকলের সঙ্গে মেলামেশা করিত, মাঠে গিয়া একসঙ্গে কাজ করিত। ধানের সময় ধান রোপণ করিত, আখের সময় আখ মাড়াই কার্যে সহযোগিতা করিত। কিন্তু এই উনিশ বছরে গ্রামের অবস্থা অল্পে অল্পে পরিবর্তিত হইতেছিল। শুধু গ্রাম নয়, সমস্ত দেশের অবস্থাই বহতা নদীর ন্যায় ক্রমশ নিম্নগামী হইয়াছিল।

কোনও দেশের অবস্থাই চিরদিন সমান থাকে না; কালভেদে তাহার পতন-অভ্যুদয় আছে। শশাঙ্কদেবের দীর্ঘ রাজত্বকালে গৌড়দেশে যে সম্পদ-শ্রীর জোয়ার আসিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাতে ভাঁটা পড়িয়াছিল। গৌড়রাজ্য লইয়া বিভিন্ন রাজশক্তির মধ্যে টানাটানি ছেড়াছেড়ি চলিতেছিল। তাহাতেও হয়তো সামগ্রিকভাবে দেশের জনগণের অধিক ক্ষতি হইত না, কিন্তু এই অন্তর্বিপ্লবের সঙ্গে বাহির হইতেও এক প্রচণ্ড আঘাত পড়িয়াছিল। সে সময়ে সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল গৌড়বঙ্গের প্রাণ; এই সাগর-সমুদ্ভবা বাণিজ্য-লক্ষ্মী সাগরে ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। চাতক ঠাকুর দেবাবিষ্ট হইয়া যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা নয়, আরব দেশের মরুভূমিতে সত্যই ঝড় উঠিয়াছিল এবং সেই বাত্যাবিক্ষিপ্ত বালুকণা সমুদ্রের উপর দিয়া উড়িয়া আসিয়া গৌড়দেশের আকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল।

সমগ্র দেশের সহিত ক্ষুদ্র বেতসগ্রামও এই ঘনায়মান দুরদৃষ্টের অংশভাগী হইয়াছিল। গ্রামবাসীরা আর গ্রামের বাহিরে যায় না। কি জন্য যাইবে? গ্রামের গুড় বাহিরে বিক্রয় হয় না। স্বর্ণ রৌপ্যের প্রচলন দেশ হইতে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতেছে; দ্রক্ষ কার্ষাপণ দিয়া কেহ আর সহজে পণ্য কেনে না; কড়ি এখন প্রধান মুদ্রার স্থান অধিকার করিয়াছে। যে লক্ষ্মী নারিকেলফলাম্বুবৎ আসিয়াছিলেন তিনি আবার গজভুক্তকপিত্থবৎ অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইতেছেন।

যেদিন বজ্রের বয়স ঊনিশ পূর্ণ হইল সেদিন সায়ংকালে অকস্মাৎ নিদাঘের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া নীল ঘনঘটার আবির্ভাব হইল। অশনি ও প্রভঞ্জনের রুদ্রতাণ্ডব শুরু হইয়া গেল; যেমন বজ্রের জন্মদিনে হইয়াছিল।

গুঞ্জা সায়ংদোহ করিতে বাথানে গিয়াছিল, সে সেইখানেই আটক পড়িল। বজ্র গিয়াছিল দেবস্থানে— চাতক ঠাকুরের একচালায়। বজ্র ঠাকুরের জন্য কৃষ্ণসারের চর্ম হইতে অজিন প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহাই ভক্তিভরে ঠাকুরকে দিতে গিয়াছিল। তারপর উভয়ে বসিয়া লঘু জল্পনা করিতেছিল; দিনে দিনে দেশের অবস্থা কিরূপ দুর্গতির পথে চলিয়াছে তাহারই আলোচনা হইতেছিল এমন সময় আকাশে দৈত্যদানবের মালসাট আরম্ভ হইল।

বৎসরের এই সময় ঝড়-ঝাপটা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু এই বছর এই প্রথম। চাতক ঠাকুর চকিতে বজ্রের পানে চাহিলেন, মনে মনে কি গণনা করিলেন, তারপর বলিলেন— দিন যায় না ক্ষণ যায়। বজ্র, আজ তোমার উনিশ বছর বয়স পূর্ণ হল।

বজ্র ভুলে নাই। সে ঋজু হইয়া বসিয়া ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল— তাহলে কুড়ি বছর বয়স হয়েছে?

হাঁ, হয়েছে।

তাহলে মাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি?

পারো। কিন্তু জেনে কোনও লাভ নেই বজ্র। বরং—

বজ্র তর্ক করিল না; উঠিয়া দাঁড়াইয়া শুধু বলিল— আমি জানতে চাই।

বৃষ্টিবাত্যা ভেদ করিয়া সে গৃহে ফিরিয়া চলিল।

বর্ষণ থামিয়াছে, বায়ু শান্ত হইয়াছে। সিক্ত প্রকৃতির সর্বাঙ্গে চন্দন-শীতল সরসতা। গুঞ্জা বাথান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। মা ও ছেলে মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আছে; মায়ের চোখে জল। মা ছেলের বাহুতে একটি সোনার অঙ্গদ পরাইয়া দিতেছে। অপূর্ব সুন্দর অঙ্গদ, বজ্রের বাহুতে এমন সুষ্ঠুভাবে লগ্ন হইল যেন তাহার বাহুর পরিমাপেই নির্মিত। রঙ্গনা দরদর-ধারে কাদিতে কাঁদিতে পুত্রের মস্তক বুকে টানিয়া লইল।

বজ্র অবরুদ্ধ স্বরে বলিল— মা, আমি কালই পিতার সন্ধানে বেরুব। যেখান থেকে পারি সংবাদ নিয়ে আসব।

এই দৃশ্য দেখিয়া গুঞ্জার হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে দুগ্ধকলস নামাইয়া তাহাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। স্খলিত স্বরে বলিল— মা, কি হয়েছে?

রঙ্গনা উত্তর দিতে পারিল না, গুঞ্জাকেও বাহু বন্ধনের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া অঝোরে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল।

সে রাত্রে তিনজনের কেহই ঘুমাইল না; অতীত ও ভবিষ্যতের দুরূহ দুর্গম ভাবনায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়া গেল।

রাত্রির প্রভাত হইল; প্রাতঃসূর্যের উদয়ে সদ্যস্নাতা ধরণীর শুচিস্মিত রূপ প্রকাশ পাইল। স্নিগ্ধ বাতাস, প্রসন্ন আকাশ; শুভযাত্রার অনুকূল মুহূর্ত। বজ্র মাতাকে লইয়া দেবস্থানে উপস্থিত হইল; যুগল দেবতার সম্মুখে দণ্ডবৎ হইল; চাতক ঠাকুরের পদধূলি মাথায় লইল। রঙ্গনা পুত্রের কপালে চুম্বন দিল, কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দংশন করিল, তারপর তাহাকে জড়াইয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বজ্র মায়ের কানে কানে বলিল—মা, কেঁদ না। যদি পিতার সন্ধান না পাই আমি একা তোমার কাছে ফিরে আসব।

এমনই আশ্বাস দিয়া আর একজন চলিয়া গিয়াছিল। বিপুল সংসার তাহাকে ফিরাইয়া দেয় নাই। এবার দিবে কি?

রঙ্গনা ও চাতক ঠাকুর মৌরীর ঘাট পর্যন্ত বজ্রের সঙ্গে আসিলেন। তারপর বজ্ৰ নদীর তীর ধরিয়া দক্ষিণমুখে চলিতে আরম্ভ করিল। তাহার মাথায় বাঁধা উত্তরীয়, স্কন্ধে একটি বংশদণ্ড, দণ্ডের প্রান্তে একটি পুঁটুলি বাঁধা। প্রগণ্ডে পিতার অভিজ্ঞান— সোনার অঙ্গদ।

যতক্ষণ দেখা গেল গলদশ্রুনেত্রা রঙ্গনা সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইল না। তারপর চাতক ঠাকুর হাত ধরিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

কিন্তু গুঞ্জা কোথায়? অতি প্রত্যুষে সে কলস লইয়া ঘাটে গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই। কোথায় গেল সে? ঘাটেও তো নাই।

বজ্ৰ হেঁটমুখে চিন্তা করিতে করিতে চলিয়াছে। কত বিচিত্র চিন্তা, কোনও চিন্তাই মনের মধ্যে স্থায়ী হইতেছে না, চঞ্চল জলের উপর সূর্যকিরণের ন্যায় ক্ষণেক নৃত্য করিয়া অদৃশ্য হইতেছে। কাল রাত্রে বজ্র মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার পিতার আকৃতি কেমন ছিল? উত্তরে মা একটি পিত্তলের থালিকা তাহার সম্মুখে ধরিয়াছিল; সেই থালিকার মার্জিত আদর্শে সে নিজের মুখ দেখিয়াছিল। কুড়ি বছর পূর্বে তাহার পিতার মুখও এমনি ছিল…গৌড়রাজ মানবদেবতিনি কি জীবিত আছেন?…কর্ণসুবর্ণ কেমন নগর? বজ্র পূর্বে কখনও গ্রামের বাহিরে যায় নাই—

বেতসবন পিছনে পড়িয়া রহিল, বজ্র গ্রামের সীমান্তে আসিয়া উপনীত হইল। বৃদ্ধ জটিল ন্যগ্রোধ বৃক্ষ গ্রামের সীমা চিহ্নিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৃক্ষটি অধিক উচ্চ নয়, কিন্তু বহু স্তম্ভযুক্ত চন্দ্রাতপের ন্যায় জটস্তম্ভ রচনা করিয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ঘন শাখাপত্রের নিম্নে নিবিড় ছায়া।

ন্যগ্রোধের ছায়াচ্ছত্র প্রান্তে আসিয়া বজ্ৰ দাঁড়াইল, একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল। দূরে বেতসলতার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামটি দেখা যাইতেছে। ঐ গ্রামে তাহার মা আছেন, চাতক ঠাকুর আছেন, গুঞ্জা আছে—

বিদায়কালে গুঞ্জার সহিত দেখা হইল না। কোথায় গেল কুঁচবরণ কন্যা! সে কি অভিমান করিয়াছে— তাই বিদায়কালে সরিয়া রহিল?

মধুমথন!

বিদ্যুদ্বৎ ফিরিয়া বজ্র দেখিল— ন্যগ্রোধ-বিতানের ভিতর হইতে গুঞ্জা বাহির হইয়া আসিতেছে। সে আসিয়া বজ্রের হাত ধরিল। গুঞ্জার চোখ দুটি যেন আরও বড় হইয়াছে, ঈষৎ রক্তিমাভ। মুখের ব্যঞ্জনা দৃঢ় সস্তৃত। বজ্রের হাত ধরিয়া গুঞ্জা তাহাকে বৃক্ষের ছায়ান্তরালে লইয়া গেল।

আজ গুঞ্জার সঙ্কোচ নাই, লজ্জা নাই। বজ্রকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া সে বাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া লইল, দুরন্ত আবেগে তাহার চক্ষে গ্রীবায় অধরে চুম্বন করিতে লাগিল। বজ্র প্রথমে গুঞ্জার এই আবেগ-প্রগতায় বিমূঢ় হইয়াছিল, তারপর সেও চুম্বনে চুম্বনে তাহার প্রতিদান দিল।

কিছুক্ষণ পরে একটু শান্ত হইয়া গুঞ্জা বলিল— তুমি কবে ফিরে আসবে?

বজ্র বলিল— তা জানি না। কিন্তু ফিরে আসব।

আসবে? আসবে? আমাকে মনে থাকবে?

বজ্র একটু হাসিল—থাকবে।

নগরের মেয়েরা শুনেছি মোহিনী হয়। তাদের দেখে আমাকে ভুলে যাবে না?

না, কুঁচবরণ কন্যা, তোমাকে ভুলে যাব না।

গুঞ্জা একাগ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে বজ্রর মুখের পানে চাহিল, যেন তাহার অন্তরের মর্মস্থল পর্যন্ত দেখিবার চেষ্টা করিল। তারপর নিজের বুক হইতে বস্ত্র সরাইয়া বজ্রের একটা হাত নগ্ন বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল।

আমাকে বুকে হাত দিয়ে বলো আর কোনও মেয়ের গায়ে হাত দেবে না।

বজ্রের মেরুমজ্জার ভিতর দিয়া একটা তীব্র বিদ্যুৎশিহরণ বহিয়া গেল, শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

গুঞ্জা! কুঁচবরণ কন্যা!

না, বলো। শপথ কর।

শপথ করছি।

তুমি আমার? শুধু আমার?

হ্যাঁ, তোমার।

শুধু তোমার।

তারপর—ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ছায়ান্ধকার যেন আরও নিবিড় হইয়া আসিল। গুঞ্জা চোখ বুজিয়া বলিল— মনে থাকে যেন। সব দিয়ে তোমাকে নিজের করে নিলাম।

–

পার্বত্য নদী যেমন সিধা একদিকে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময় মোড় ঘুরিয়া সম্পূর্ণ নূতন। দিকে চলিতে আরম্ভ করে, তেমনি বজ্রের জীবনও এতদিন বৈচিত্র্যহীন ঋজু পথে প্রবাহিত হইবার পর অকস্মাৎ নূতন পথ ধরিল। এই অভাবনীয় পরিবর্তনের জন্য বজ্র নিজেও প্রস্তুত ছিল না। সে জানিত সে রাজার ছেলে। সাত বছর ধরিয়া সে পিতার পূর্ণ পরিচয় জানিবার জন্য প্রতীক্ষ করিয়াছে, কিন্তু পিতৃ-পরিচয় পাইবার পর কী করিবে এ প্রশ্ন তাহার মনে আসে নাই। কাল বর্ষণমথিত সন্ধ্যায় যখন সে মায়ের মুখে তাহার পিতার কাহিনী শুনিল, তখন নিমেষমধ্যে তাহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিল— সে পিতার সন্ধানে যাইবে, পিতাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, মাতার দীর্ঘ প্রতীক্ষর অবসান করিবে। হয়তো তাহার অন্তরের অন্তস্তলে এই সঙ্কল্পের বীজ লুক্কায়িত ছিল, হয়তো চাতক ঠাকুর অনুভবে তাহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বে পিতৃ-পরিচয় জানিতে দেন নাই। এক মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল, বজ্র নিঃসঙ্গভাবে অজানিত নূতন পথে যাত্রা করিল।

পায়ে হাঁটার পক্ষে পথ অল্প নয়। গ্রামের সীমান্ত হইতে বিস্তৃত প্রান্তর আরম্ভ হইয়াছে। তরুপাদপহীন মাঠ, তাহার দক্ষিণে বহু দূরে শ্যামায়মান অরণ্য দিক্চক্রকে যেন স্থূল রেখার দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। মৌরী নদীর ধারা কুটিল খাতে আঁকিয়া বাঁকিয়া ঐ বনরেখায় মিলাইয়াছে।

বজ্র যখন বনের প্রান্তে গিয়া পৌঁছিল তখন দ্বিপ্রহর অতীতপ্রায়। এই বন অনুমান দশ ক্রোশ গভীর, বিশাল তরুশ্রেণীর সমাবেশে অন্ধকার এবং দুর্গম। পূর্বকালে নাকি এই বনে হাতি বাস করিত; এখন হিংস্র জন্তুর মধ্যে ভালুক ও সাপের বাস। অন্যান্য ক্ষুদ্র জীবজন্তুও আছে। এই বন পার হইয়া আরও একদিনের পথ হাঁটিলে কর্ণসুবর্ণে পৌঁছানো যায়। মৌরীর তীর ধরিয়া চলিলে বনের সঙ্কট এড়াইতে পারা যায়। কিন্তু এই স্থান হইতে মৌরীর স্রোত ধনুকের মত পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, কূল ধরিয়া চলিলে একটু ঘুর পড়ে। যাহারা শীঘ্র রাজধানীতে পৌঁছিতে চায়, তাহাদের পক্ষে বন ভেদ করিয়া যাওয়াই সুবিধা।

বজ্র এক তরুচ্ছায়ায় বসিয়া আতপতপ্ত দেহের উষ্ণা দূর করিল। কিন্তু অধিক বিলম্ব করা। চলে না, দিনের আলো থাকিতে থাকিতে জঙ্গল পার হইতে পারিলেই ভাল। সে উঠিয়া নদীতে

অবতরণ করিল। হাত মুখ ধুইয়া কিছু আহার করিতে হইবে, তারপর আবার যাত্রা।

নদী হইতে তীরে ফিরিয়া বজ্র লক্ষ্য করিল, অদূরে এক বৃহৎ পাষাণখণ্ডের পাশে একজন মানুষ বসিয়া আছে। স্থির হইয়া বসিয়া আছে, একটু নড়িতেছে না, কিন্তু তাহার সমস্ত দেহ সতর্কতার চেষ্টায় ব্যগ্র হইয়া আছে।

বজ্র বিস্মিত হইল। এই নির্জন বনপ্রান্তে মানুষ কোথা হইতে আসিল, কী করিতেছে, কোথায় যাইবে? কৌতূহলবশে বজ্র তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেখিল মানুষটি অন্ধ। কঙ্কালসার দীর্ঘ দেহ, দেহের চর্ম রৌদ্রে পুড়িয়া খদির বর্ণ ধারণ করিয়াছে, মাথায় মুখে জটা-গ্রন্থিযুক্ত রুক্ষ কেশ, কটিতে জীর্ণ কৌপীন। হাতের নড়ি পাশে রাখা রহিয়াছে। অন্ধ বজ্রের পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল, সে নড়ি শক্ত করিয়া ধরিয়া আরও সতর্ক হইয়া বসিল; একবার অধরোষ্ঠ খুলিয়া যেন কিছু বলিবার উদ্যোগ করিল, তারপর কিছু না বলিয়াই মুখ বন্ধ করিল।

বজ্র তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল— তুমি অন্ধ, এখানে কি করে এলে?

অন্ধ কিছুক্ষণ উত্তর দিল না, তারপর ক্ষীণ অনিশ্চিত স্বরে বলিল— আমার দৃষ্টি নেই, কখন কোথায় যাই বুঝতে পারি না। তোমার পায়ের শব্দ শুনে ভেবেছিলাম বনের শ্বাপদ–

বজ্র প্রশ্ন করিল—তুমি কোথায় যাবে? কোনও গন্তব্য স্থান আছে কি?

অন্ধ দ্বিধাভরে ক্ষণেক নীরব রহিল, শেষে নড়ি নাড়িয়া বলিল—না।

অসহায় অন্ধের ভগ্ন-জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া বজ্রের দয়া হইল। সে বলিল— তুমি ক্ষুধার্ত মনে হচ্ছে। আমার কাছে খাদ্য আছে। খাবে?

অন্ধ উত্তর দিল না, বুকে চিবুক জিয়া বসিয়া রহিল। বজ্র তখন তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, হাত ধরিয়া বৃক্ষতলে লইয়া গেল। পুঁটুলিতে যে খাদ্য ছিল তাহা ভাগ করিয়া অর্ধেক অন্ধকে দিল

অর্ধেক নিজে লইল। অন্ধ আর সঙ্কোচ করিল না।

আহার করিতে করিতে বজ্র বলিল— আমি কর্ণসুবর্ণ যাচ্ছি, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

অন্ধ কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল—না।

তবে কোথায় যাবে? অন্ধ আবার স্থির সতর্কতার সহিত চিন্তা করিল।

জানি না। কাছে কি লোকালয় নেই?

দক্ষিণের কথা জানি না। উত্তরে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে গ্রাম আছে।

কোন্ গ্রাম?

বেতসগ্রাম।

অন্ধের চর্বণক্রিয়া বন্ধ হইল, তাহার অস্থির দেহ সহসা কঠিন হইয়া স্থির হইয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ কথা কহিল না, যখন কহিল তখন তাহার কণ্ঠস্বর চাপা উত্তেজনায় অসংলগ্ন শুনাইল— কি গ্রাম বললে?

বেতসগ্রাম।

অন্ধ আর কোনও কথা বলিল না, প্রশ্ন করিল না। কিন্তু তাহার সমস্ত সত্তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে সজাগ হইয়া রহিল।

আহার সমাধা হইলে বজ্র বলিল— আমি এবার যাব। তুমি কোথায় যেতে চাও তা তো বললে না।

অন্ধ কণ্ঠস্বরে ঔদাস্য ভরিয়া বলিল— আমার কাছে সব সমান। বেতসগ্রামেই যাই।

ভাল।

বজ্র তখন অন্ধকে উত্তরমুখ করিয়া দাঁড় করাইয়া হাতে নড়ি ধরাইয়া দিল। বলিল— এইবার সিধা চলে যাও। বাঁ দিকে বেশি যেও না, নদীতে পড়ে যাবে। এখনও অনেক বেলা আছে, চাকা ডোববার আগে গ্রামে পৌঁছতে পারবে।

অন্ধ বলিল—তুমি বড় সৎ, বড় দয়ালু। তোমার নাম কি?

বজ্রের একবার ইচ্ছা হইল নিজের নামের সঙ্গে নবলব্ধ পিতৃ-পরিচয়ও অন্ধকে জানাইয়া দেয়। কিন্তু সে প্রলোভন সম্বরণ করিয়া কেবল বলিল— আমার নাম বজ্র।

তারপর দুইজনে ছাড়াছাড়ি হইল। কেহ কাহাকেও চিনিল না, অদৃষ্টপ্রেরিত হইয়া বিপরীত মুখে চলিল।

শীঘ্র গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার আগ্রহে বজ্ৰ নদীর তীর ছাড়িয়া বনের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিয়াছিল। মনস্থ করিয়াছিল, যদি দিন থাকিতে বন পার হইতে না পারি গাছে উঠিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিব। কিন্তু দুই ঘটিকা চলিবার পর তাহার দিগভ্রম হইল। জঙ্গলের অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে মুক্ত স্থান আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন মন্দালোকিত; স্তম্ভের ন্যায় বৃক্ষকাণ্ডের সারি অন্তহীনভাবে চারিদিকে চলিয়া গিয়াছে, নিবিড় পত্রাবচ্ছেদে সূর্য দেখা যায় না। বর্জ দি হারাইয়া ফেলিল, দক্ষিণে যাইতেছে কি পশ্চিমে যাইতেছে কিম্বা যেদিক হইতে। আসিয়াছিল সেইদিকে ফিরিয়া যাইতেছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না।

উপরন্তু বনে যে জীবজন্তু আছে তাহাও সে অনুভব করিয়াছে। উহারা যেন তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে, নিজেরা অদৃশ্য থাকিয়া তাহার আশেপাশে ঘুরিতেছে। কচিৎ অদূরস্থ গুল্মের মধ্যে সর সর শব্দ করিয়া কোনও প্রাণী অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইতেছে। একবার একটা কৃষ্ণকায় রোমশ জন্তু দূরে একটা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া অন্য গাছের আড়ালে চলিয়া গেল, আবছায়া অন্ধকারে সেটা কী জন্তু ধরা গেল না।

উহারা সকলে হিংস্র শ্বাপদ না হইতে পারে, কিন্তু কিছুই বলা যায় না। বজ্র তীরধনুক আনে নাই; শবরের ন্যায় ধনুপাণি বেশে কর্ণসুবর্ণে অবতীর্ণ হইবার বাসনা তাহার ছিল না, কিন্তু এখন মনে হইল—আনিলেই ভাল হইত। অন্তত বনের মধ্যে অনেকটা নির্ভয় বোধ করিতে পারিত। যেটুকু স্বল্পালোক ছিল তাহাও ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে, সূর্যাস্তের বোধহয় আর বিলম্ব নাই। বজ্ৰ ভাবিল এই বেলা গাছে উঠিয়া বসি, কাল প্রাতে দিনির্ণয় করিয়া আবার চলিব।

রাত্রিবাসের উপযোগী একটি গাছের সন্ধানে এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে বজ্ৰ চলিল। কিছুদূর যাইবার পর সহসা এক করুণ কাকুতি শুনিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল। কাকুতি মনুষ্যকণ্ঠের নয়, কোনও জন্তুর। কিন্তু কোন জন্তুর? কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিবার পর বজ্র আবার সেই আর্তস্বর শুনিতে পাইল। তাহার মুখে বিস্ময়-চকিত হাসি দেখা দিল। কুকুরের ডাক! কুকুর থাকিয়া থাকিয়া ভীতস্বরে রোদন করিয়া উঠিতেছে।

এই অরণ্যে কুকুর কোথা হইতে আসিল? কুকুর তো গ্রামে থাকে; বেতসগ্রামেও দুই চারিটা আছে। তবে, যখন কুকুরের ডাক শুনা গিয়াছে তখন মানুষও আছে। বজ্র জানিত শবরেরা কুকুর লইয়া শিকার করিয়া বেড়ায়, কুকুর তাহাদের নিত্য সঙ্গী। নিশ্চয় শবর আছে।

বজ্র কুকুরের কাতরোক্তি লক্ষ্য করিয়া চলিল। দুই তিন রজ্জু যাইবার পর একটি বৃক্ষতলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া তাহার গতিরোধ হইল। এস্থানে ছায়া তেমন ঘন নয়; বজ্র দেখিল এক কৃশকায় ক্ষুদ্রাকৃতি শবর মাটিতে চিৎ হইয়া পড়িয়া হাঁ করিয়া আছে এবং একটি কুকুর পাশে বসিয়া তাহার মুখমণ্ডল চাটিতেছে।

কুকুর বজ্রকে দেখিয়া সহর্ষে উঠিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। শবরের কিন্তু কোনও দিকে লক্ষ্য নাই, সে হাঁ করিয়া শুইয়া রহিল।

আরও নিকটবর্তী হইয়া বর্জ ব্যাপার বুঝিতে পারিল। গাছের ডালে কুলার মত একটা মৌচাক ঝুলিতেছে, ঠিক তাহারই নীচে শবর হাঁ করিয়া আছে আর চক্রনির্গলিত মধু তাহার মুখে টোপাইয়া পড়িতেছে। তীরধনুক পাশেই রহিয়াছে, সুতরাং অনুমান করা কঠিন নয় যে তীরের খোঁচা দিয়া সে মৌচাকে ছিদ্র করিয়াছে। শবরের চক্ষু মুদিত, মুখে মদির হাস্য।

কুকুরটির কিন্তু চিত্তে সুখ নাই। সে থাকিয়া থাকিয়া প্রভুর বদনসুধা লেহন করিতেছে বটে কিন্তু বনের মধ্যে রাত্রিযাপন করিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই। তাই সে প্রভুর কানের কাছে। ডাকিয়া ডাকিয়া গৃহে ফিরিবার ব্যগ্রতা জানাইতেছে। মধুমত্ত প্রভুর কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নাই।

বজ্ৰ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

নূতন ধরনের শব্দ শুনিয়া শবর আরক্ত চক্ষু মেলিল, তারপর উঠিয়া বসিল। বজ্রকে পরম গাম্ভীর্যের

সহিত নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ গর্বভরে বলিল— আমার নাম কচ্ছু। এ আমার চুচু। * বলিয়া কুকুরের গলা জড়াইয়া ধরিল।

বজ্র বলিল–আমার নাম বজ্র। তোমার ঘর কোথায়?

আমার ঘর— কছু অনিশ্চিতভাবে একদিকে হাত নাড়িল—আমার ঘর ঐদিকে। সেখানে রত্তি আর মিত্তি আছে। আমি ঘরে যাব না, মধু খাব। বলিয়া শয়নের উপক্রম করিল।

বজ্র একটু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল— রাত্রির কিন্তু আর দেরি নেই। আমি বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি, কোথাও আশ্রয় পাচ্ছি না। তুমি আজ রাত্রির জন্যে তোমার ঘরে আমাকে আশ্রয় দেবে?

বনের মধ্যে অতিথি! শবর তৎক্ষণাৎ মাদকের মোহ ত্যাগ করিয়া ধনুক হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে গিরিগুহাবাসী বনচর মানুষ, কিন্তু আতিথেয়তা তাহার সহজাত ধর্ম। তাহার লঘু খর্ব দেহটি যেমন পরিপূর্ণ যৌবন-স্বাস্থ্যের প্রলেপে সুচিক্কণ, মনের অকুণ্ঠিত সরলতাও তেমনি মধুর অনুপানে স্নিগ্ধ। পা একটু টলিতেছে বটে কিন্তু মুখে সহৃদয় আতিথ্যের হাসি। সে আসিয়া বজ্রের হাত ধরিল, গদগদ স্বরে বলিল— তুমি আমার ঘরে যাবে? আমার ঘরে রত্তি আর মিত্তি আছে, তারা তোমাকে হরিণের মাংস খাওয়াবে। এস এস।

সে বজ্রের হাত ধরিয়া চলিল। কুকুরটি প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া সানন্দে লাফাইতে লাফাইতে পথ দেখাইয়া চলিল। বজ্ৰ ভাবিল, গাছের ডালে রাত্রিবাসের চেয়ে এ ভাল; প্রাতে শবর কর্ণসুবর্ণের পথ বলিয়া দিতে পারিবে।

অর্ধদণ্ড কাল চলিবার পর তাহারা একটি মুক্ত স্থানে পৌঁছিল। ভূমি কঙ্করময়, তাই গাছ। গজায় নাই; কেবল ছোট ছোট গুল্ম। উন্মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া বজ্ৰ দেখিল রাত্রি হইতে এখনও বিলম্ব আছে। পশ্চিমের বিশাল তরুশ্রেণীর আড়ালে সূর্য দেখা যাইতেছে না, কিন্তু এখনও সূর্যাস্ত হয় নাই। প্রতিফলিত আলোকে মুক্ত স্থান সমুজ্জ্বল।

চুচু–চুপ। দাঁড়া। (কুকুরের অস্ট্রিক প্রতিশব্দ চুচু)

মুক্ত স্থানের কিনারায় আসিয়া শবরের অভ্যস্ত চক্ষু শিকার দেখিতে পাইয়াছিল; তাহার চাপা গলার আওয়াজে কুকুরও স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। বজ্ৰ দেখিল, প্রায় এক রজ্জু দূরে একটা কাঁটাসার গুল্মের পাশে একটি ময়ূর খেলা করিতেছে। মাত্র একটি ময়ূর; পেখম মেলিয়া নাচিতেছে।

গাছের পিছনে থাকিয়া শবর একবার বজ্রের পানে ঘোলা চোখ তুলিয়া হাসিল, তারপর ধনুকে শরসন্ধান করিল।

কিন্তু মাদকের প্রভাবে তাহার হস্ত স্থির নয়, চক্ষুও তীক্ষ্ণতা হারাইয়াছে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়া সে ধনুক নামাইল, বজ্রের পানে করুণ চক্ষু তুলিয়া মাথা নাড়িল।

বজ্র নিঃশব্দে শবরের হাত হইতে ধনুঃশর লইল, নৃত্যপর ময়ূরের উপর সাবধানে লক্ষ্য স্থির করিল।

তারপর টঙ্কার শব্দে ধনু হইতে তীর বাহির হইয়া গেল। বাণবিদ্ধ ময়ূর একবার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

শবর কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তারপর লম্ফ দিয়া বজ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মদোফুল্লকণ্ঠে বলিল— তুমি তীর ছুঁড়তে জানো? এত ভাল তীর ছুঁড়তে পারো? তুমি আমার বন্ধু। আজ আমরা ময়ূরের মাংস খাব, ময়ূরের পাখা দিয়ে রত্তি মিত্তি কোমরের গয়না তৈরি করে পরবে।

বজ্রকে ছাড়িয়া কচ্ছু টলিতে টলিতে মৃত ময়ূরটার দিকে চলিল। ময়ূর শিকার তাহার জীবনে প্রথম নয়। কিন্তু আজ মধুপানে তাহার হৃদয় আনন্দ-বিহ্বল, তার উপর সে মনের মত বন্ধু পাইয়াছে। বজ্রও তাহার উল্লাসে উল্লসিত; সে স্মিতমুখে কচ্ছুর পিছে পিছে গেল। কুকুরটা হর্ষধ্বনি করিতে করিতে সঙ্গে চলিল।

তারপর মুহূর্তমধ্যে তাহাদের সমস্ত আনন্দ আতঙ্কে পরিণত হইল। আনন্দ ও শঙ্কার মুহুর্মুহু পরিবর্তন, ইহাই বোধহয় বনের আদিম রীতি।

শবর আগে গিয়া মৃত ময়ূরটাকে হাতে তুলিয়া নৃত্য শুরু করিয়াছিল, হঠাৎ উঃ বলিয়া কয়েক পা পিছাইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। বজ্র ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখিল— শবরের পায়ের অঙ্গুষ্ঠ রক্তাক্ত, অদূরে একটা মুমূর্ষ সাপ পড়িয়া আছে। সাপের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, কিন্তু মরে নাই। বজ্রের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, এই সাপটাকে লইয়া ময়ূর খেলা করিতেছিল কিন্তু সাপ মারিবার পূর্বেই ময়ূর শরাহত হইয়া মরিয়াছে। তারপর কচ্ছু হয়তো না দেখিয়া সাপের ঘাড়ে পা দিয়াছে। মুমূর্ষ সাপ কচ্ছুর পায়ে তাহার অন্তিম জিঘাংসা ঢালিয়া দিয়াছে।

বজ্র লাঠি দিয়া সাপ মারিল, কচ্ছুকে জিজ্ঞাসা করিল— কামড়েছে?

কচ্ছুর আর মাদকের মত্ততা নাই, মৃতুযর সম্মুখীন হইয়া সে শান্ত আত্মস্থ। সহজ স্বরে বলিল—জাত সাপে খেয়েছে, আর বাঁচব না।

বজ্ৰ ধনুকের ছিলা ছিঁড়িয়া কচ্ছুর পায়ে দৃঢ় বন্ধন দিল। বলিল—এখান থেকে তোমার ঘর কতদূর?

কচ্ছু বলিল—বেশি দূর নয়, কিন্তু যেতে পারব না। রত্তি-মিত্তি সাপের ওষুধ জানে, ঘরে পৌঁছুতে পারলে তারা বাঁচাতে পারত। বন্ধু, তোমাকে নিয়ে আনন্দ করতে পেলাম না। যদি পারো, রত্তি-মিত্তিকে খবর দিও। চুচু তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল–রত্তি আর মিত্তি কে?

ওরা আমার বৌ। বলিয়া কচ্ছু ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

না, তোমাকে আমি ঘরে নিয়ে যাব। বলিয়া বজ্র কচ্ছুর অবসন্ন দেহ দুই হাতে তুলিয়া লইল। চুচু এতক্ষণ প্রভুর পাশে নিশ্চলভাবে বসিয়া ছিল, এখন লাফাইয়া উঠিয়া চিৎকার করিতে করিতে একদিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। বজ্র কচ্ছুকে কাঁধে ফেলিয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিল।

–

বনের অভ্যন্তর সর্বত্র সমতল নয়, কোথাও কোথাও বৃহৎ পাথরের স্তূপ মাটি ঠেলিয়া মাথা তুলিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, বহু পুরাকালে একদল দৈত্য কালো কালো পাথর সংগ্রহ করিয়া দুর্গরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তারপর কি কারণে পাথরগুলাকে হুণ্ডমুণ্ড ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি প্রস্তরস্তূপের মধ্যে কচ্ছুর নির্জন গুহাগৃহ। এখানে অন্য কোনও মানুষের বসতি নাই।

শুষ্ক শিলাকীর্ণ ভূমি, কিন্তু পাষাণপুঞ্জের ভিতর হইতে জলের একটি ক্ষীণ প্রস্রবণ নির্গত হইয়াছে। এই জলধারার দুই পাশে একটু হরিদাভা, দুই চারিটি গাছ। গাছগুলি বন্য গাছ নয়; বন এই স্থানটিকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আছে কিন্তু শিলাবুযহ ভেদ করিতে পারে নাই। যে গাছগুলি জলধারার পাশে জন্মিয়াছে সেগুলি ফলের গাছ; কদলী, জাম্বুরা, কামরাঙা, ডালিম, শ্রীফল। তাছাড়া ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ ও কন্দ আছে, শিম্বি ও পুতিকা লতা আছে। এগুলি কচ্ছুর দুই বধূ রত্তি ও মিত্তির দ্বারা লালিত।

রত্তি ও মিত্তি দুই সতীন, কিন্তু দুজনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ভালবাসা। দেখিতেও দুটিকে প্রায় একরকম, যেন একজোড়া সুঠাম সুন্দর হরিণশিশু কৃষ্ণসারের ন্যায় আয়ত কোমল চক্ষু, অজিনের ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণ দেহবর্ণ; দেহে অটুট নিটোল যৌবন। বেশবাসও এক প্রকার; কটিতটে বল্কলের আচ্ছাদন, বক্ষ নিরাবরণ, গলায় গুঞ্জার মালা, চুলে সিন্দুরবর্ণ বনকুসুমের নর্মভূষা।

সেদিন প্রদোষকালে রত্তি ও মিত্তি গুহার সম্মুখে জলপ্রণালীর বহমান ধারায় পা ডুবাইয়া বসিয়া ছিল। আকাশে শুক্লপক্ষের আধখানা চাঁদ ফুটি ফুটি করিতেছে; দিনের শব্দ থামিয়া গিয়াছে, রাত্রির শব্দ এখনও আরম্ভ হয় নাই। দুই শবর যুবতী নীড়ের পাখির মত অস্ফুট ভাষণে দুটি একটি কথা বলিতেছিল, কিন্তু তাহাদের চক্ষু ঘুরিয়া ফিরিয়া বনের কিনারায় সঞ্চরণ করিতেছিল। কচ্ছুর ফিরিবার সময় হইয়াছে।

বনের ভিতরে চুচুর ডাক শুনা গেল। কিন্তু চুচুর ডাক স্বাভাবিক নয়, তাহাতে উত্তেজনা ও আতঙ্কের সঙ্কেত মিশ্রিত রহিয়াছে। রত্তি ও মিত্তি চকিত সশঙ্ক দৃষ্টি বিনিময় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বনের আড়াল হইতে চুচু তীরবেগে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পশ্চাতে এক দীর্ঘকায় গৌরকান্তি যুবক

কচ্ছুকে কাঁধে লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

চুচু ছুটিতে ছুটিতে রত্তি ও মিত্তিকে দেখিয়া আবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল। মিত্তি রত্তির হাত চাপিয়া ধরিয়া দ্রুতনিম্নকণ্ঠে বলিল— সাপ! জাত সাপ।

বজ্র যখন কচ্ছুকে পয়ঃপ্রণালীর পাশে নামাইল তখন কচ্ছুর জ্ঞান নাই। বজ্রও এই এক ক্রোশ কণ্টকাকীর্ণ শিলাকর্কশভূমি কচ্ছুকে বহন করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, পথে কোথাও বিশ্রাম করে নাই; তাহার সংজ্ঞাও লুপ্তপ্রায়। সে কচ্ছুর পাশে বসিয়া পড়িয়া শুষ্ক তালু হইতে কোনও প্রকারে শ্বদ উচ্চারণ করিল সাপ —সাপে কামড়েছে।

এ সংবাদ রত্তি মিত্তির কাছে নূতন নয়, চুচুর ডাক হইতে পূর্বেই তাহারা জানিয়াছিল। কুকুরের ডাক শবর-শবরীর কাছে যে বার্তা বহন করে সভ্য মানুষের কাছে তাহা দুর্বোধ্য।

রত্তি ও মিত্তি বৃথা বিলাপ করিল না, বজ্রের পানেও ফিরিয়া চাহিল না; নিঃশ্বদ ক্ষিপ্রতার সহিত কচ্ছুর পরিচর্যা আরম্ভ করিল। কচ্ছুর চোখের পাতা তুলিয়া দেখিল, পায়ের অঙ্গুষ্ঠে সাপের দাঁতের দাগ পরীক্ষা করিল, ধরাধরি করিয়া তাহাকে পয়ঃপ্রণালীর অগভীর জলে শোয়াইয়া দিল। তারপর মিত্তি হরিণীর মত ছুটিয়া একদিকে চলিয়া গেল।

ইতিমধ্যে দিনের দীপ্তি নিঃশেষ হইয়াছে, চাঁদের আলো ফুটিয়াছে। রত্তি অন্তর্জলশয়ান কচ্ছুর পা হইতে ধনুকের ছিলা খুলিয়া ফেলিল, কচ্ছুর অঙ্গুষ্ঠে অধর সংযুক্ত করিয়া রক্ত-মোক্ষণ করিতে লাগিল। কচ্ছু নড়িল না, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল।

মিত্তি ফিরিয়া আসিল, তাহার হাতে কয়েকটা লতাপাতা ও শিকড় বাকড়। সে রত্তিকে ডাক দিয়া গুহায় প্রবেশ করিল এবং আগুন জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। গুহার এক কোণে ভস্মাচ্ছাদনের অন্তরালে অঙ্গার ছিল, মিত্তি ফু দিয়া তাহা জ্বালাইয়া তুলিল। রত্তি কচ্ছুর দেহ অবলীলাক্রমে জল হইতে তুলিয়া লইয়া গুহায় প্রবেশ করিল।

বজ্র বাহিরে বসিয়া দেখিতে লাগিল। আজ সমস্ত দিনের অনভ্যস্ত পরিশ্রমে তাহার বজ্রকঠিন দেহও গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। কচ্ছুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য যেটুকু তাহার সাধ্য তাহা সে করিয়াছে; কিন্তু সে সাপের মন্ত্রৌষধি জানে না, আর কি করিতে পারে? এখন কচ্ছুর ভাগ্য, আর রত্তি-মিত্তির গূঢ়বিদ্যার শক্তি। বজ্র জলস্রোতের পাশে অবনত হইয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল পান করিল, তারপর শিলাপট্টের উপর শয়ন করিল।

গুহার মধ্যে কচ্ছুর মুষ্টিযোগ আরম্ভ হইয়াছে। মিত্তি পাতা ও শিকড় চিবাইয়া অঙ্গুষ্ঠে বাঁধিয়া দিয়াছে, রত্তি ময়ূরের পালক আগুনে পুড়াইয়া কচ্ছুর নাকের কাছে ধরিতেছে। আর সেই সঙ্গে উভয়ে অস্ফুটকণ্ঠে অবিশ্রাম মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে।

এই দৃশ্য গুহামুখ হইতে দেখিতে দেখিতে বজ্র ঘুমাইয়া পড়িল।

বনপ্রান্তে এক পাল শৃগালের যাম-ঘোষণার শব্দে বজ্র জাগিয়া উঠিল। রাত্রির মধ্যযাম। চন্দ্র অস্ত

যাইতেছে।

গুহার মধ্যে রক্তাভ আগুন জ্বলিতেছে। বজ্ৰ উঠিয়া গিয়া দেখিল কচ্ছু তেমনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে, রত্তি ও মিত্তি তাহার দুই পাশে বসিয়া সবাঙ্গে হাত বুলাইতেছে ও গূঢ়স্বরে মন্ত্র পড়িতেছে। বজ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে রত্তি ও মিত্তির পানে চাহিল; কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব তন্ময় সমাহিত। বজ্র প্রশ্ন করিতে পারিল না, কচ্ছুর জীবনের আশা আছে কিনা? সে বাহিরে আসিয়া আবার শয়ন করিল।

এবার যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন চারিদিকে পাখির কলরব, সূর্যোদয় হইতেছে। বজ্র চক্ষু মেলিয়া দেখিল, রত্তি ও মিত্তি তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের নিকষ অঙ্গে নবারুণের সোনালী কষ লাগিয়াছে; চোখে মুখে ক্লান্তির জড়িমা। রত্তির হাতে পত্রপুটে হরিণের মাংস, মিত্তির দুই হাতে দুটি পাকা ডালিম।

ধড়মড় করিয়া বজ্ৰ উঠিয়া বসিল— কচ্ছু–?

উভয়ে ক্লান্তিশিথিল কণ্ঠে হাসিল।

বাঁচবে।

বজ্র দ্রুত উঠিয়া গুহায় প্রবেশ করিল। দেখিল, কচ্ছুর জ্ঞান হইয়াছে, সে শুইয়া শুইয়া মিটিমিটি চাহিতেছে। এই এক রাত্রে তাহার দেহ শুকাইয়া প্রেকৃতি হইয়া গিয়াছে; গালের চর্ম কুঞ্চিত, চক্ষু কোটরগত। বজ্র তাহার পাশে নতজানু হইয়া আনন্দবিগলিত স্বরে ডাকিল—কছু!

কচ্ছু শীর্ণ কম্পমান হাত দুটি তুলিয়া বজ্রের গলা জড়াইয়া লইল, স্খলিতস্বরে বলিল –ভাই, তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।

বজ্র বলিল— না, না, তোমার বৌরা তোমাকে বাঁচিয়েছে।

রত্তি ও মিত্তি বজ্রের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের পানে চোখ তুলিয়া কচ্ছু ক্ষীণ হাসিল— তুমি কাঁধে তুলে এনেছিলে তাই ওরা বাঁচাতে পারল। কাল থেকে তোমার কিছু খাওয়া হয়নি, আমি অতিথির সেবা করতে পারলাম না। রত্তি! মিত্তি!

রত্তি ও মিত্তি হরিণের মাংস ও ডালিম বজ্রের সম্মুখে রাখিল। কচ্ছু বলিল— খাও ভাই, আমি দেখি।

বজ্রের যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, সে খাইতে বসিল। রত্তি ও মিত্তি নিজেদের মধ্যে নিম্নস্বরে কি কথা বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বজ্ৰ খাইতে খাইতে কচ্ছুর প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল কচ্ছু যেন তাহার কতদিনের পুরানো বন্ধু; কচ্ছু যমের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এই তৃপ্তিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

আহার শেষে বজ্র বাহিরে গিয়া জল পান করিল। বাহিরে কিন্তু রত্তি মিত্তিকে দেখিতে পাইল না। সে ফিরিয়া আসিয়া কচ্ছুর কাছে বসিল, বলিল— রত্তি মিত্তি কোথায় গেল? তাদের দেখলাম না।

কচ্ছু বলিল—বোধহয় জঙ্গলে গেছে শিকারের খোঁজে। কাল আমি কিছু মেরে আনতে পারলাম না—

বজ্র তখন কচ্ছুর বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল— ভাই, আজ তবে আমি যাই। আমাকে

কানসোনা যেতে হবে। অনেক দূরের পথ।

কচ্ছু তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতর স্বরে বলিল— বন্ধু, আজকের দিনটা থাকো, যদি যেতেই হয় কাল যেও। আমি তোমার সেবা করতে পারলাম না, আমার বৌরা তোমার সেবা করুক। আমাদের সেবা না নিয়ে যদি চলে যাও, তাহলে—তাহলে কচ্ছুর অক্ষিকোটর জলে ভরিয়া উঠিল।

ভাল, কালই যাব। বজ্র নির্বন্ধ করিল না। তাহার হাত-পা এখনও আড়ষ্ট হইয়া আছে, গায়ের ব্যথা মরে নাই। একদিনের বিলম্বে কী ক্ষতি হইবে?

দ্বিপ্রহরে রত্তি ও মিত্তি ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে কয়েকটা নধর বন্য কুকুট। তাহারা বনে ফাঁদ পাতিয়া আহার্য সংগ্রহ করিয়াছে।

অতঃপর কুঁকুড়ার মাংস রন্ধন হইলে সকলে একসঙ্গে আহারে বসিল। বজ্র একাই দুইটা কুঁকুড়া উদরস্থ করিল। কচ্ছু অল্প একটু খাইল।

আহারান্তে বজ্র কচ্ছুর পাশে লম্বা হইল। রত্তি ও মিত্তি তাহার দুই প্রান্তে আসিয়া বসিল; মিত্তি পা টিপিতে আরম্ভ করিল, রত্তি মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বজ্র একটু আপত্তি করিল কিন্তু তাহারা শুনিল না। তখন বজ্র পরম আরামে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। রত্তি ও মিত্তি রাত্রে ঘুমায় নাই, তাহারাও অল্পকাল মধ্যে বজ্রের দুই প্রান্তে ঢুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

অপরাহ্নে বজ্র যখন জাগিয়া উঠিল তখন তাহার দেহের সমস্ত গ্লানি দূর হইয়াছে। কচ্ছুও শরীরে অনেকটা বল পাইয়াছে এবং নিজের চেষ্টায় উঠিয়া বসিয়াছে। তিনজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে গুহার বাহিরে প্রস্তরপট্টের উপর বসাইয়া দিল। পশ্চিমে সূর্য তখন বনানীর শীর্ষ স্পর্শ করিয়াছে।

কচ্ছুর দুই পাশে তাহার দুই স্ত্রী গা ঘেঁষিয়া বসিল; বজ্র তাহাদের সম্মুখে কিছুদূরে বসিল। সকলের মুখেই প্রীতি-গদগদ হাসি। তাহাদের দেখিয়া বজ্ৰ ভাবিতে লাগিল, কী মধুর ইহাদের জীবন! এই তিনটি আদিম নরনারীর মধ্যে কি নিবিড় ভালবাসা! ঈর্ষা নাই, স্বার্থপরতা নাই, ক্ষুদ্রতা নাই, আছে শুধু অফুরন্ত প্রাণের প্রাচুর্য!

রত্তি ও মিত্তি কচ্ছুর কানের কাছে গুনগুন করিয়া গান গাহিতে লাগিল। গানের কথাগুলি তেমন স্পষ্ট নয়, কিন্তু ভাঙ্গা ভাঙ্গা জংলা সুর কখনও স্নেহে আর্দ্র, কখনও চটুল হাসিতে লুটাইয়া পড়িতেছে। কচ্ছুর নবজীবন লাভে তাহারা কত সুখী হইয়াছে তাহাই যেন তাহাদের কণ্ঠের কাকলিতে প্রকাশ পাইল। গান শেষ হইলে তাহারা কচ্ছুর দুই কাঁধে মাথা রাখিয়া নীরব রহিল।

শবর-শবরীদের এই অকুণ্ঠ প্রণয়লীলা দেখিয়া বজ্র একটু লজ্জা পাইল, কিন্তু মনে মনে মুগ্ধও হইল। ইহারা যেন পাখির জাত। লজ্জা জানে না।

ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিল। কচ্ছু তখন বজ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল— ভাই, কাল সকালে তুমি চলে যাবে। তুমি শুধু আমাদের অতিথি নয়, আমার প্রাণদাতা। আমি বনের মানুষ, কি দিয়ে তোমার পূজা করব? আমার দুই বৌ আছে, এদের মধ্যে যাকে তোমার ভাল লাগে তাকে তুমি নাও, আজ রাত্রির জন্যে সে তোমার বৌ

কচ্ছুর ইঙ্গিতে রত্তি ও মিত্তি আসিয়া বজ্রের সম্মুখে বসিল এবং তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া মধুর হাস্য করিল। তাহাদের সরল মুখে মলিনতার চিহ্নমাত্র নাই, তাহাদের সহজ প্রীতি তাহারা অর্পণ করিতে চায়, বন্ধুজনকে প্রীত করিতে চায়।

বজ্ৰ ক্ষণেক হতভম্ব হইয়া রহিল, তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। রত্তি ও মিত্তির হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহাদের কচ্ছুর পাশে বসাইয়া দিয়া বলিল— কচ্ছু, তোমার বৌ তোমারই থাক, আমার দরকার নেই।

কচ্ছু আহতস্বরে বলিল— ওদের কাউকে ভাল লাগে না?

দুজনকেই ভাল লাগে। ওদের তুলনা নেই। কিন্তু—

বজ্ৰ কচ্ছুর সম্মুখে বসিল। গুঞ্জার মুখ তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল; আবেগমথিত মুখ, তীব্র প্রেমতৃষ্ণাভরা চোখ দুটি। বজ্র গাঢ়স্বরে বলিল— আমার বৌ আছে। তাকে গ্রামে রেখে এসেছি। অন্য বৌ আমার দরকার নেই।

বজ্রের বৌ আছে শুনিয়া রত্তি ও মিত্তি কৌতুক-কৌতূহলী চক্ষে চাহিল। কচ্ছু কিন্তু বড় নিরাশ ও মনঃক্ষুন্ন হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে বজ্র কর নিকট বিদায় লইল। কচ্ছু আজ বেশ সুস্থ হইয়াছে কিন্তু বেশি দূর পথ হাঁটিতে পারিবে না। তাই রত্তি ও মিত্তি বজ্রকে পথ দেখাইয়া বনের প্রান্তে রাজপথ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।

কচ্ছু বজ্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল— বন্ধু, তোমার সঙ্গে আর বোধহয় কখনও দেখা হবে। আমি বনের মানুষ, তুমি লোকালয়ের মানুষ। কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকব তোমাকে ভুলব না। তুমিও আমাদের ভুল না। যদি কোনও দিন দরকার হয়, মনে রেখো এই জঙ্গলে তোমার তিনজন বন্ধু আছে।

কচ্ছু গুহাদ্বারে চুচুকে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বজ্র বাহির হইয়া পড়িল। এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল যে বজ্রের সহিত এই শবরদম্পতির ইহজীবনে আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

বজ্ৰকে লইয়া রত্তি ও মিত্তি পূর্বদিকে চলিল। আবার বন আরম্ভ হইল; তেমনি প্রদোষছায়াচ্ছন্ন ঘন

বনানী। তাহার মধ্যে দুই চঞ্চলা শবরযুবতী অভ্রান্তভাবে পথ চিনিয়া চলিল।

প্রায় দুই ঘটিকা চলিবার পর তাহারা এক রাজপথে আসিয়া উপনীত হইল। উত্তর দক্ষিণে পথ, তাহার অপর পারে কলোর্মি-চঞ্চলা ভাগীরথী। এই রাজপথের উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি, উত্তরে মহাকোশল হইতে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত ইহা ভুজঙ্গের ন্যায় বক্ররেখায় পড়িয়া আছে।

রত্তি বজ্রের হাতে একটি লতা দিয়া বাঁধা পাতার মোড়ক দিল, বলিল—খাবার আছে— খেও। এবার ঐদিকে চলে যাও, কানসোনায় পৌঁছবে।

আচ্ছা।

রত্তি ও মিত্তির মুখে এক ঝলক মিষ্ট হাসি খেলিয়া গেল। তারপর তাহারা দুইটি বিচিত্র নীল প্রজাপতির ন্যায় আবার বনের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

–

বজ্র রাজপথ ধরিয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। একপাশে বিপুলবক্ষা জাহ্নবী, অপরপাশে নিবিড়কুন্তলা বনানী, মাঝখানে প্রস্তর-খচিত উচ্চ পথ যেন সন্তর্পণে দুই দিক বাঁচাইয়া চলিয়াছে। আকাশে প্রখর রৌদ্র, কিন্তু ভাগীরথীর জলস্পর্শীশীতল বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া

পথিকের পথ-ক্লেশ নিবারণ করিতেছে।

রাজপথে যাত্রীর বাহুল্য নাই। কদাচিৎ দুই একটি সৈনিকবেশধারী অশ্বারোহী দক্ষিণ হইতে উত্তরে কিম্বা উত্তর হইতে দক্ষিণে মন্দ-স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিয়া যাইতেছে, অন্যথা পথ নির্জন। নদীতীরে জনবসতি নাই, সম্ভবত প্রতি বৎসর বর্ষাকালে গঙ্গার তুঙ্গস্ফীত জলধারা কূল ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাই মানুষ এখানে বাসস্থান রচনা করিতে সাহসী হয় নাই। ক্রোশের পর ক্রোশ জনহীন বেলাভূমি; কোথাও কাশের স্তম্ব জন্মিয়াছে, কোথাও বালুময় সৈকতে সঙ্গিহীন সারস এক পা তুলিয়া নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও বা উচ্চ পাহাড়ের গায়ে কোটরবাসী অসংখ্য গাঙ-শালিখের কিচিমিচি।

স্থল অপেক্ষা জলে বরং মানুষের চিহ্ন কিছু অধিক পাওয়া যায়। গঙ্গার স্রোতে দূরে দূরে ছোট ছোট ডিঙি ও ভরা ভাসিতেছে। কখনও বড় বহি পাল তুলিয়া মরালগমনে চলিয়াছে; দূর হইতে তাহার পট্টপত্তনের উপর মানুষের সচল আকৃতি দেখা যাইতেছে। সব মিলিয়া বহিঃপ্রকৃতির একটি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ রূপ; তৎপরতা আছে কিন্তু ত্বরা নাই।

সূর্য মধ্যগগনে আরোহণ করিলে বজ্র পথপার্শ্বের এক বৃহৎ অশ্বত্থতলে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাতঃকাল হইতে অনেকখানি পথ হাঁটা হইয়াছে, এইবার একটু বিশ্রাম করা যাইতে পারে। জঠরে অগ্নিদেব জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহারও শান্তিবিধান আবশ্যক।

কিন্তু সর্বাগ্রে গঙ্গায় অবগাহন স্নান। বজ্র অশ্বত্থের ছায়াতলে খাদ্যের পুঁটুলি রাখিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইল।

নদীতট এইখানে ঢালু হইয়া জলে মিশিয়াছে। বজ্ৰ চকিত হইয়া দেখিল, জলের কিনারায় একটা উলঙ্গপ্রায় মানুষ দাঁড়াইয়া আছে এবং গামছার মত রক্তবর্ণ একটি বস্ত্রখণ্ড ঊর্ধ্বে তুলিয়া নাড়িতেছে। মানুষটার দৃষ্টি ছিল নদীর দিকে, তাই সে প্রথমে বজ্রকে দেখিতে পায় নাই। কিন্তু বজ্র যখন তীরে নামিয়া গেল তখন তাহাকে দেখিয়া সে এমনভাবে চমকিয়া উঠিল যেন সে কোনও গর্হিত কার্যে ধরা পড়িয়াছে।

বজ্ৰ লোকটিকে দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়াছিল কিন্তু কোনও প্রকার সন্দেহ তাহার মনে উদয় হয় নাই। লোকটির পরিধানে কেবল কৌপীন, গামছার মত বস্ত্রখণ্ডটি সম্ভবত তাহার কটিবাস। বজ্র ভাবিল, লোকটি হয়তো যাযাবর সম্প্রদায়ের ভিক্ষু, স্নান করিয়া কটিবাস শুকাইতেছে। সে আর তাহাকে লক্ষ্য করিল না, জলে নামিয়া পরম আরামে স্নান করিতে লাগিল।

লোকটি কিন্তু চোখে উৎকণ্ঠা ভরিয়া বারবার তাহার পানে চাহিতে লাগিল। তাহার আকৃতি দীঘায়ত ও দৃঢ়, মুখে ঈষৎ শ্মশ্রুগুম্ফ আছে, কিন্তু দেখিলে সাধু-বৈরাগী বলিয়া মনে হয় না। মুখে উদাসীনতা বা বৈরাগ্যের চিহ্নমাত্র নাই।

অবশেষে লোকটি কথা কহিল, ছদ্ম তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল— তুমি দেখছি দূরের যাত্রী। কোথা থেকে আসছে?

বজ্ৰ গাত্র-মার্জন করিতে করিতে বলিল—উত্তরের গ্রাম থেকে।

তুমি গ্রামবাসী! কোথায় যাবে?

কর্ণসুবর্ণে।

আগে কখনও কর্ণসুবর্ণে গিয়েছ?

অপরিচিত ব্যক্তির এত অনুসন্ধিৎসা বজ্রের ভাল লাগিল না, তবু সে সহজভাবেই উত্তর দিল—না। তুমি কে?

লোকটি অমনি নিজেকে ভিতরে গুটাইয়া লইল।

আমি পরিব্রাজক।

বজ্র আর প্রশ্ন করিল না। লোকটি একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিল— কর্ণসুবর্ণে কী কাজে যাচ্ছ?

বজ্র এবার সতর্ক হইল। তাহার মনে হইল লোকটি কেবল কৌতূহলবশেই প্রশ্ন করিতেছে না, কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে। বজ্র উত্তর দিল—গ্রামে কাজকর্ম নেই, তাই নগরে যাচ্ছি যদি কিছু কাজ পাই।

স্নান সারিয়া সে তীরে উঠিল। লোকটি কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়, আবার প্রশ্ন করিল—তোমার হাতে ও

কিসের অঙ্গদ? সোনার?

বজ্র লঘুস্বরে বলিল—না, পিতলের। সোনা কোথায় পাব?

সে বস্ত্র পরিধান করিয়া অশ্বথতলে ফিরিয়া গেল, পাতার মোড়ক খুলিয়া আহারে বসিল। প্রচুর কুকুট মাংস ও কয়েকটি সুপক্ক কদলী। পরম তৃপ্তির সহিত তাহাই আহার করিতে করিতে বজ্র গলা বাড়াইয়া দেখিল লোকটি তখনও নদীতীরে দাঁড়াইয়া আছে, মাঝে মাঝে অশ্বত্থ বৃক্ষের পানে সংশয়পূর্ণ পশ্চাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, আবার নদীর দিকে ফিরিয়া বস্ত্র আন্দোলিত করিতেছে।

বজ্রের কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল। লোকটি কে? এমন অদ্ভুত আচরণ করিতেছে কেন? বজ্র আহার করিতে করিতে গলা উঁচু করিয়া দেখিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ কাটিবার পর দেখা গেল গঙ্গাবক্ষে একটা দীর্ঘ শীর্ণ ডিঙা তীরের দিকে আসিতেছে। ডিঙাতে আট দশজন লোক একের পর এক বসিয়া আছে, চারিটি দাঁড়ের আঘাতে ডিঙা হিংস্র হাঙ্গরের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে।

তীরের কাছাকাছি আসিলে ডিঙার লোকগুলা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—জয়নাগ।

তীরের লোকটি উত্তর দিল—জয়নাগ।

ডিঙা তীরে ভিড়িল। দুইজন দাঁড়ী ছাড়া আর সকলে নামিয়া পড়িল। তখন ডিঙা আবার মুখ ঘুরাইয়া দূর পরপারের পানে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

যে কয়জন লোক আসিয়াছিল তাহারা সকলে তীরস্থ ব্যক্তিকে ঘিরিয়া ধরিল। তাহারা সকলেই দৃঢ়কায় বলবান ব্যক্তি, বেশবাস প্রায় তীরস্থ ব্যক্তির ন্যায়। দেখিলে মনে হয় তাহারা একই সম্প্রদায়ের লোক।

তীরস্থ ব্যক্তি মৃদুকণ্ঠে অন্যদের কিছু বলিল; অন্যেরা ভ্রূকুটি করিয়া অশ্বখতলের দিকে

তাকাইতে লাগিল।

বজ্র একটু অস্বস্তি অনুভব করিল। লোকগুলার আচরণ রহস্যময়; ইহারা যদি দসুয-তস্কর হয় তাহা হইলে এতগুলা লোকের বিরুদ্ধে তাহার একার কোনও আশা নাই। কিন্তু বিপদের মুখে পলায়ন করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে বসিয়া আহার করিতে লাগিল।

লোকগুলা নিম্নকণ্ঠে জল্পনা করিল। তারপর একের পর এক সারি দিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের পাশ দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। বজ্রের নিকট দিয়া যাইবার সময় তীক্ষ্ণভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া গেল। বজ্র নিরুৎসুকভাবে তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিল।

বজ্র দেখিল নূতন লোকগুলি রাজপথ লঙ্ঘন করিয়া ওপারের জঙ্গলে অদৃশ্য হইয়া গেল, কেবল পুরানো

লোকটি গেল না। সে বন্ধুভাবে বজ্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল— তুমি বোধহয় জান না আমরা কে?

বজ্র মাথা নাড়িয়া বলিল—না।

আমরা নাগ সম্প্রদায়ের পরিব্রাজক। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই।

বজ্র সামান্য কৌতূহল প্রকাশ করিল তাই বুঝি জয়নাগ বললে।

হাঁ। জয়নাগ শুনলে আমাদের দলের লোককে চিনতে পারি। তুমি যাদের দেখলে ওরা পুন্ড্রদেশে তীর্থপর্যটনে গিয়েছিল।

লোকগুলিকে দেখিলে পুণ্যলোভী তীর্থপর্যটক বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু বজ্র তাহা বলিল না। তাহার ভোজন শেষ হইয়াছিল, সে নদীতে গিয়া হাত মুখ ধুইল, জল পান করিল। বলিল— আমি এবার চললাম। তুমি কি এখানেই থাকবে?

নাগ পরিব্রাজক একবার দূরে গঙ্গার অপর পারে দৃষ্টি প্রেরণ করিল, অবহেলাভরে বলিল—আমরা কখন কোথায় থাকি ঠিক নেই। তুমি চললে? ভাল। তোমার যেমন চেহারা নিশ্চয় রাজার সৈন্যদলে কর্ম পাবে।

বজ্র ক্ষণেক ইতস্তত করিয়া বলিল—রাজার নাম কি?

পরিব্রাজক চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বলিল— তুমি গৌড়ের মানুষ, রাজার নাম জান না?

না। কী নাম?

পরিব্রাজক ঔদাসীন্যের অভিনয় করিয়া বলিল— কে জানে। আমরা নাগপন্থী বৈরাগী, রাজা-রাজড়ার সংবাদ রাখি না।

বজ্র একটু হাসিয়া যাত্রা করিল। সে বুঝিয়াছিল ইহারা ভণ্ড বৈরাগী, ইহাদের কোনও গুপ্ত অভিসন্ধি আছে; কিন্তু কী অভিসন্ধি তাহা অনুমান করা তাহার সাধ্য নয়। সে পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, নগর এখনও দূরে কিন্তু ইহারই মধ্যে নগরের দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া তাহার পথের উপর পড়িয়াছে। নদী যতই সাগরের কাছে আসিতে থাকে, সাগরের সান্নিধ্য ততই তাহার সর্বাঙ্গে স্পন্দন-শিহরণ জাগাইয়া তোলে; বজ্ৰ দূর হইতে তেমনই নগর-রূপী মহাজলধির গভীর স্পন্দন নিজ অন্তরে অনুভব করিল। গ্রাম ও বনের অকপট ঋজুতা আর নাই, জনসমুদ্রের কুটিল নক্রসঙ্কুল আবর্ত তাহাকে টানিতে আরম্ভ করিয়াছে। গঙ্গাতীরের এই রহস্যময় ঘটনা যেন তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেল।

কর্ণসুবর্ণ ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল; পথপার্শ্বের বন শেষ হইয়া মাঠ আরম্ভ হইল। দিগন্তের কাছে মহানগরীর হচূড়া দেখা গেল। তারপর, রাক্ষসী বেলায়, বজ্র কর্ণসুবর্ণের উপকণ্ঠে এক বিশাল সংঘারামের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। পশ্চিম দিগন্তে তখন রক্তমসী দিয়া রাত্রি ও দিবার মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত

হইতেছে।

বজ্র দেখিল, রাজপথ ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানে বহুবিস্তীর্ণ ভবন, উচ্চ প্রাচীর দিয়া বেষ্টিত। ইহাই রক্তমৃত্তিকার বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারাম; চলিত ভাষায় রাঙামাটির মঠ।

নগরের উপকণ্ঠে বটে, কিন্তু বিশাল সংঘারাম ব্যতীত লোকালয় বেশি নাই, কেবল আশেপাশে দুই তিনটি ক্ষুদ্র বিপণি। নগর হইতে যাহারা সংঘে পূজা দিতে আসে, পূজা দিয়া আবার নগরে ফিরিয়া যায়। সংঘে প্রায় পাঁচ শত বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন, কিন্তু স্থানটি নির্জন শব্দহীন। এখানে সকল কার্যই নিঃশব্দে অলক্ষিতে সম্পাদিত হয়।

সংঘারামের প্রশস্ত তোরণদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বজ্র ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। কবাটহীন তোরণদ্বার দিয়া সংঘভূমি দেখা যাইতেছে, কিন্তু সেখানে লোকজন কেহ নাই, দ্বারে দ্বারীও নাই। বাহিরে বিপণিগুলির আগড় বন্ধ, দোকানীরা সন্ধ্যার পূর্বেই দোকান বন্ধ করিয়া নগরে ফিরিয়া গিয়াছে।

সংঘদ্বারের দুই পাশে দুইটি দীপস্তম্ভ। সেকালে মঠ-মন্দির প্রভৃতির অগ্রে উচ্চ দীপস্তম্ভ রচনার রীতি ছিল। ইষ্টকনির্মিত স্তম্ভের সর্বাঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটর থাকিত, পূজাপার্বণের সময় কোটরগুলিতে দীপ জ্বালিয়া উৎসবের শোভাবর্ধন হইত। বজ্র ঈষৎ বিভ্রান্তভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সহসা দেখিতে পাইল, একটি দীপস্তম্ভমূলে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বাম পদ দক্ষিণ জানু-অস্থির উপর স্থাপিত, দুই হাতে যষ্টিতে ভর দিয়া এবং মস্তকটি বাহুর উপর রাখিয়া সে সারস পক্ষীর ন্যায় এক পায়ে দাঁড়াইয়া ঘুমাইতেছে।

বজ্র ত্বরিতপদে তাহার নিকটবর্তী হইতেই লোকটি চক্ষু মেলিল, দুই পায়ে দাঁড়াইল ও হাই তুলিল। তুড়ি দিয়া বলিল—জয়নাগ।

বজ্র আজ দ্বিতীয়বার জয়নাগ শুনিল। সে চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মানুষটিকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, বলবান হৃষ্টপুষ্ট লোক, কিন্তু মুখে ধূর্ততা মাখানো। বজ্র কোনও প্রশ্ন করিবার পূর্বেই সে বলিল—কে বাপু তুমি, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে?

বজ্ৰ বলিল— আমি পথিক, কর্ণসুবর্ণে যাব। নগর এখান থেকে কত দূর?

লোকটি মিটিমিটি চাহিয়া বলিল— ক্রোশ দুই হবে। আলোয় আলোয় নগরে পৌঁছুতে পারবে না।

রাত্রে পান্থশালায় কি আশ্রয় পাব না?

তুমি যদি নূতন লোক হও, রাত্রে পান্থশালা খুঁজে পাবে না।

তবে উপায়?

উপায় তো সামনেই রয়েছে। মঠে ঢুকে পড়, আহার আশ্রয় দুই পাবে।

কিন্তু—মঠে তো কাউকে দেখছি না।

ভেবেছ কি মঠ খালি?—পাঁচশ নেড়া মাথা আছে। তবে ভারি শান্তশিষ্ট। ভিতরে গেলেই দেখতে পাবে।

লোকটির কথা বলিবার ভঙ্গি লঘুতাব্যঞ্জক, বৌদ্ধদের প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে বলিয়া মনে হয় না। বজ্র সংঘের দিকে পা বাড়াইয়া একটু ইতস্তত করিল, বলিল—তুমি কি এখানেই রাত কাটাবে? সংঘ যাবে না?

লোকটি আবার এক পা তুলিয়া ঘুমাইবার উদ্যোগ করিল, বলিল—আমার জন্যে ভেবো না। জয়নাগ।

বজ্র প্রশ্ন করিল—জয়নাগ কাকে বলে?

ও একটা মন্তর—বলিয়া লোকটি চক্ষু মুদিল।

বজ্ৰ ভাবিতে ভাবিতে সংঘদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। এই অদ্ভুত লোকটা নাগ সম্প্রদায়ের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই; আগন্তুক পান্থদের মধ্যে তাহার দলের কেহ আছে কিনা জানিবার জন্য এই কূট-কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু কেন? কিসের জন্য এই চাতুরীপূর্ণ কপটতা?

কিন্তু এ চিন্তা বজ্রের মস্তিষ্কে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, সংঘভূমির দৃশ্য তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইল।

–

রক্তমৃত্তিকার মহাবিহার এক পাটক (সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর ভূমিমাপ = ৫ কুল্যবাপ) ভূমির উপর অবস্থিত। তিন দিকে প্রাচীর, পিছনে গঙ্গা। বিহার ভূমির মধ্যস্থলে উচ্চ ত্রিভূমক হর্য। নিম্নতল প্রশস্ত, দ্বিতল তদপেক্ষা ক্ষুদ্র, ত্রিতল আরও ক্ষুদ্র; তূপের আকৃতি। এই স্তূপসদৃশ ভবনের মধ্য-তলে শাক্যমুনির দিব্য দেহাবশেষ রক্ষিত আছে।

এই গন্ধকুটিকে কেন্দ্র করিয়া চারিপাশে সারি সারি ভিক্ষুগণের প্রকোষ্ঠ। অগণিত প্রকোষ্ঠ, প্রত্যেকটিতে একজন ভিক্ষু বাস করেন। প্রকোষ্ঠগুলি নিরাভরণ, শয়নের জন্য একটি কাঠের পাটাতন ও একটি জলের কুম্ভ; অন্য কোনও তৈজস নাই।

বজ্র এদিক-ওদিক দৃকপাত করিতে করিতে চলিল। অধিকাংশ পরিবেণই শূন্য, ভিক্ষুরা পরিক্রমণের জন্য গঙ্গার তীরে গিয়াছেন; শরীর রক্ষার জন্য ইহা তাঁহাদের নিত্য কর্ম। কদাচিৎ একটি দুইটি ভিক্ষু পরিবেণের কবাটহীন দ্বারের কাছে বসিয়া পুঁথি পড়িতেছেন। সন্ধ্যার মন্দালোকে নত হইয়া তাঁহারা পাঠে নিমগ্ন; বজ্ৰকে চক্ষু তুলিয়া দেখিলেন না।

ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বজ্র বিহারের পশ্চাদ্দিকে এক চত্বরের নিকট উপস্থিত হইল। বৃহৎ গোলাকৃতি চত্বর, তাহার মধ্যস্থলে বসিয়া দুইটি বৃদ্ধ লঘু স্বরে আলাপ করিতেছেন। একটি বৃদ্ধ স্থূল ও খর্বকায়, মুখে মেদমণ্ডিত প্রসন্নতার সহিত পদাভিমানের গাম্ভীর্য। অন্য বৃদ্ধটি সম্পূর্ণ বিপরীত; দীর্ঘ দেহ ক্ষীণ ও তপঃকৃশ, স্কন্ধ হইতে মস্তক সম্মুখদিকে একটু অবনত হইয়া পড়িয়াছে; মুখে মাংসলতার অভাববশত চিবুক ও হনুর অস্থি তীক্ষ্নভাবে প্রকট হইয়া আছে। ইহার মুখভাব হইতে পদবী অনুমান করা যায় না, নিম্নতম শ্রেণীর শ্রমণও হইতে পারেন। কিন্তু অন্য বৃদ্ধটি যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন তাহাতে মনে হয় ইনি সামান্য ব্যক্তি নয়।

বজ্র চত্বরের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলে দুইজনে চক্ষু তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন, তাঁহাদের বাক্যালাপ স্থগিত হইল। বজ্র সসম্ভ্রমে তাঁহাদের সম্বোধন করিল— মহাশয়, আমি দূরের পান্থ, কর্ণসুবর্ণে যাব। আজ

রাত্রির জন্য সংঘে আশ্রয় পাব কি?

স্থূলকায় বৃদ্ধটি বলিলেন-অবশ্য। তিনি এক হস্ত উত্তোলন করিতেই একটি অল্পবয়স্ক শ্ৰমণ আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন—মণিপদ্ম, অতিথির পরিচর্যা কর।

অন্য বৃদ্ধটি এতক্ষণ অপলক নেত্রে বজ্রের পানে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার শান্ত মুখে ক্রমশ বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। শ্ৰমণ মণিপদ্ম যখন অন্য বৃদ্ধের আদেশ পালনের জন্য বজ্রের দিকে পা বাড়াইল তখন তিনি তাহাকে ডাকিয়া নিম্নস্বরে কিছু বলিলেন। মণিপদ্ম গভীর শ্রদ্ধায় নত হইয়া তাঁহার কথা শুনিল, তারপর বজ্রের কাছে আসিয়া বলিল— ভদ্র, আসুন আমার সঙ্গে।

মণিপদ্ম প্রথমে বজ্রকে গঙ্গার তীরে লইয়া গেল। বিস্তীর্ণ ঘাটে রাত্রির ছায়া নামিয়াছে, জলের উপর ধূসর আলোর ম্লান প্রতিফলন। ঘাটের পৈঠাগুলির উপর পরিক্রমণরত ভিক্ষু শ্রমণের নিঃশব্দ ছায়ামূর্তি। কেহ কাহারও সহিত কথা বলিতেছে না, ক্ষণেকের জন্য গতি বিলম্বিত করিতেছে না, যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় ঘাটের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পদচারণা করিতেছে। দৃষ্টি ভূমিনিবদ্ধ, বক্ষ বাহুবদ্ধ। এমন প্রায় তিন চারিশত শ্ৰমণ। বজ্র দেখিল, সংঘ নিতান্ত জনহীন নয়।

ঘাটে হস্ত মুখ প্রক্ষালনের পর বজ্রকে লইয়া মণিপদ্ম এক প্রকোষ্ঠে উপনীত হইল। ইতিমধ্যে প্রকোষ্ঠগুলিতে দীপ জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কয়েকজন শ্ৰমণ বর্তিকাহস্তে দ্বারে দ্বারে দীপ জ্বালাইয়া ফিরিতেছে। মণিপদ্ম প্রকোষ্ঠে দীপ জ্বালিয়া একপাশে রাখিল, বলিল— আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আপনার আহার্য নিয়ে আসি।

মণিপদ্ম চলিয়া গেল, বজ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া রহিল। ক্রমে আশেপাশের পরিবেণগুলিতেও জনসমাগম হইতে লাগিল। ভিক্ষুরা সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কোথাও চঞ্চলতার আভাস নাই। অল্প আলোকে ছায়ার ন্যায় সঞ্চরমাণ মানুষগুলি; কদাচিৎ নিম্নস্বর বাক্যালাপের গুঞ্জন; যেন ভৌতিক লোকের অবাস্তব পরিমণ্ডল।

তারপর গন্ধকুটি হইতে মধুর-স্বনে ঘন্টিকা বাজিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ স্ব স্ব কক্ষ ছাড়িয়া সেইদিকে যাত্রা করিলেন। সেখানে ভগবান তথাগতের পূজার্চনা হইবে, তারপর ভিক্ষুদের নৈশ ভোজন।

পূজার্চনার ঘন্টিকা নীরব হইবার কিয়ৎকাল পরে মণিপদ্ম বজ্রের আহার্য লইয়া উপস্থিত হইল। আহার্যের মধ্যে ঘৃতপক্ক তণ্ডুল ও গোধূমের একটা পিণ্ড এবং ফলমূল; কিন্তু পরিমাণে প্রচুর। বজ্র আহারে বসিল; মণিপদ্ম সম্মুখে নতজানু হইয়া পরিবেশন করিল।

শ্ৰমণ মণিপদ্ম বজ্রেরই সমবয়স্ক। সুশ্রী ক্ষীণাঙ্গ প্রফুল্ল-মুখ যুবক; মুণ্ডিত মস্তক ও পীত বস্ত্র তাহার মনের সরসতা মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাহার বৈরাগ্য সহজ আনন্দেরই রূপান্তর। বজ্ৰ আহার করিতে করিতে তাহার সহিত দুই চারিটি বাক্যালাপ করিল; দেখিল মণিপদ্মের বুদ্ধিদীপ্ত মনে কোনও কৌতূহল নাই, উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নাই; সকলের আজ্ঞাধীন হইয়া অন্যের সেবা করাই তাহার আনন্দময় স্বধর্ম।

আহার সমাধা হইলে মণিপদ্ম বলিল— ভদ্র, একটি অনুরোধ আছে। যদি ক্লেশ না হয়, আর্য শীলভদ্র

আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বজ্ৰ বলিল—ক্লেশ কিসের? কিন্তু আর্য শীলভদ্র কে?

মণিপদ্ম বলিল—সদ্ধর্মভাণ্ডার আর্য শীলভদ্রের নাম শোনেন নি?

বজ্র মাথা নাড়িল—না। কে তিনি?

মণিপদ্ম বিস্ময়াহতভাবে চাহিয়া রহিল। শীলভদ্রের নাম জানে না এমন মানুষ আছে? যাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার আশায় সুদূর চীনদেশ হইতে গুণগ্রাহীরা ছুটিয়া আসে, দেশের লোক সেই শীলভদ্রের নাম জানে না! শেষে মণিপদ্ম বলিল আমার ধারণা ছিল শীলভদ্রের নাম সকলেই জানে। তিনি নালন্দা বিহারের মহাধ্যক্ষ; তাঁহার মত জ্ঞানী পৃথিবীতে নেই।

বজ্র দীনকণ্ঠে বলিল— ভাই, আমি গ্রামের ছেলে, পৃথিবীর কিছুই জানি না। আর্য শীলভদ্র

আমার সঙ্গে দেখা করতে চান কেন?

তা জানি না। তিনি আদেশ করেছেন, যদি আপনার ক্লেশ না হয়, আহারের পর আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে।

আমি প্রস্তুত। আজ সন্ধ্যাবেলা যে দুটি বৃদ্ধকে দেখলাম, ইনি কি তাঁদেরই একজন?

হাঁ। যিনি শীর্ণকায় অশীতিপর বৃদ্ধ তিনি।

আর অন্যটি?

তিনি এই রক্তমৃত্তিকা বিহারের মহাস্থবির।

অতঃপর মণিপদ্ম বজ্ৰকে লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইল। গন্ধকুটির নিম্নতলে এক কোণে একটি প্রকোষ্ঠে শীলভদ্র বসিয়া আছেন। কক্ষটি সাধারণ পরিবেণের মতই ক্ষুদ্র ও নিরাভরণ। শীলভদ্র দীপের সম্মুখে বসিয়া একটি তালপত্রের পুঁথি দেখিতেছিলেন; অশীতি বৎসর বয়সেও তাঁহার চোখের জ্যোতি ম্লান হয় নাই। বজ্র ও মণিপদ্ম তাঁহার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি মণিপদ্মকে বলিলেন—মণিপদ্ম, তুমি এবার আহার কর গিয়ে। আজ রাত্রে তোমার সেবার আর প্রয়োজন নেই বৎস।

মণিপদ্ম হাসিমুখে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। শীলভদ্র বজ্রকে বলিলেন— এস, উপবেশন কর।

বজ্র আসিয়া শীলভদ্রের সম্মুখে এক পীঠিকায় বসিল। শীলভদ্র পুঁথি বন্ধ করিয়া সূত্ৰ দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বজ্রকে নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার বাহুতে অঙ্গদ দেখিলেন, তারপর বলিলেন—তোমার নাম কি বৎস?

বজ্ৰ বলিল—আমার নাম বজ্রদেব।

শীলভদ্র তখন ধীরস্বরে বলিলেন—আমি তোমাকে দু একটি প্রশ্ন করব, ইচ্ছ না হয় উত্তর দিও না। আজ সন্ধ্যায় তোমাকে দেখে অনেক দিনের পুরানো কথা মনে পড়ে গেল, তাই তোমাকে ডেকেছি। আমার পরিচয় বোধহয় শুনেছ। আমি শীলভদ্র, নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ, প্রাচীমণ্ডলের বিহারগুলি পরিদর্শনের জন্য বেরিয়েছি; এখান থেকে সমতট যাব। সমতট আমার জন্মস্থান। (শীলভদ্র সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।) মৃতুযর পূর্বে একবার জন্মভূমি দেখবার ইচ্ছা হয়েছে। তারপর, যদি বুদ্ধের ইচ্ছা হয়, আবার এই পথে নালন্দায় ফিরে যাব।

শীলভদ্র একটু হাসিয়া নীরব হইলেন; যেন নিজের পরিচয় দিয়া বর্জকেও পরিচয় দিবার জন্য আহ্বান করিলেন। বজ্র তাঁহার শান্ত মুখের পানে চাহিয়া অনুভব করিল ইনি সাধারণ কৌতূহলী মানুষ নয়, অন্য স্তরের মানুষ। চাতক ঠাকুরের সহিত ইহার আকৃতির কোনই সাদৃশ্য নাই, কিন্তু তবু যেন কোথায় মিল আছে। বজ্ৰ স্থির করিল ইহার কাছে কোনও কথা গোপন করিবে না। সে বলিল— আপনি প্রশ্ন করুন, আমি উত্তর দেব।

শীলভদ্র তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন, বলিলেন— তুমি বুদ্ধিমান। তোমার পিতার নাম কি?

আমার পিতার নাম শ্রীমানবদেব।

স্মিতহাস্যে শীলভদ্রের চক্ষুপ্রান্ত কুঞ্চিত হইল; তিনি বলিলেন—আমার অনুমান মিথ্যা নয়। তুমি মানবদেবের পুত্র, শশাঙ্কদেবের পৌত্র। ত্রিশ বছর আগে তোমার পিতাকে আমি দেখেছিলাম। তখন তাঁর বয়স ছিল তোমারই মত।

বজ্র ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—আমার পিতা কোথায়? তিনি কি এখন গৌড়ের রাজা নয়?

শীলভদ্র করুণনেত্রে চাহিয়া বলিলেন— না। কিন্তু আগে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি পরে দেব।

শীলভদ্রের প্রশ্নের উত্তরে বজ্র নিজ জন্ম ও জীবন-কথা, মাতার মুখে যেমন শুনিয়াছিল সমস্ত অকপটে বলিল; কর্ণসুবর্ণে আসার উদ্দেশ্যও প্রকাশ করিল। শুনিয়া শীলভদ্র দীর্ঘকাল নীরব। রহিলেন। শেষে কোমলস্বরে বলিলেন—বৎস, তোমার পিতা জীবিত নেই। তুমি কর্ণসুবর্ণে। যেও না; সেখানে এমন লোক এখনও জীবিত আছে যারা তোমার পিতাকে চিন্ত, তোমাকে দেখলে মানবদেবের পুত্র বলে চিনতে পারবে। সেটা তোমার পক্ষে শুভ হবে না। তুমি তোমার গ্রামে ফিরে যাও, আর তুমি যে মানবদেবের পুত্র এ কথাটা গোপন রাখার চেষ্টা কোরো।

বজ্ৰ বলিল—কিন্তু আপনি কি স্থির জানেন আমার পিতা জীবিত নেই?

শীলভদ্র বলিলেন—তোমার পিতার সম্বন্ধে যা জানি বলছি। ত্রিশ বছর আগে শশাঙ্কদেব গৌড়ের রাজা ছিলেন; মানবদেব ছিলেন যুবরাজ। তখন হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কদেবের যুদ্ধ চলছে। হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধ; তাই যুদ্ধের উত্তেজনায় শৈবধর্মী শশাঙ্ক গৌড়ের বৌদ্ধদের ওপর কিছু উৎপীড়ন আরম্ভ করেছিলেন। এই

সংবাদ পেয়ে আমি নালন্দা থেকে গৌড়ের রাজসভায় শশাঙ্কদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসি। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। যুবরাজ মানবদেবও আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন, তিনি আমার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। ফলে আমি সিদ্ধমনোরথ হয়ে নালন্দায় ফিরে যাই, শশাঙ্ক তারপর আর কারও ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করেন নি। তোমার পিতার সঙ্গে সেই একবার মাত্র আমার সাক্ষাৎ। তারপর ত্রিশ বছর কেটে গেছে, কিন্তু আজ তোমাকে দেখেই তাঁর মুখ স্মরণ হয়েছিল।

যা হোক, এই ঘটনার দশ বছর পরে শশাঙ্কদেব দেহরক্ষা করলেন, মানব রাজা হলেন। মানব সিংহাসন লাভের কয়েক মাস পরে ভাস্করবর্মা উত্তর থেকে গৌড় আক্রমণ করলেন। কজঙ্গলে মানবের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হল। মানব পরাজিত হয়ে কর্ণসুবর্ণে ফিরে এলেন।

কিন্তু ভাস্করবর্মা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন; কর্ণসুবর্ণে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হল। এবারও মানব পরাজিত হলেন; রাজপুরী রক্ষার জন্য অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে তিনি ভাস্করবর্মার হাতে বন্দী হলেন। জনশ্রুতি আছে, মানব যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়েছিলেন, সেই রাত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়; তারপর তাঁর মৃতদেহ রাজপুরীর প্রাকার থেকে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হয়।

শীলভদ্র নীরব হইলে বজ্রও বহুক্ষণ কথা বলিল না। এইভাবে তাহার পিতার জীবনান্ত হয়, তাই তিনি মাতার কাছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু–

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—এখন রাজা কে? ভাস্করবর্মা? শীলভদ্র বলিলেন—না। কয়েক বছর হল ভাস্করবর্মার মৃত্যু হয়েছে। এখন তাঁর পুত্র অগ্নিবর্মা রাজা। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—ভাস্করবর্মাও ধর্মে শৈব ছিলেন এবং বিদ্যানুরাগী সজ্জন ছিলেন। অগ্নিবম শুনেছি ঘোর নরাধম। কিন্তু তার আর বেশি দিন নয়।

বেশি দিন নয় কেন?

অগ্নিবর্মা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মনিরত; রাজকার্য দেখে না। এই সুযোগ নিয়ে দক্ষিণের এক রাজা গৌড়দেশ গ্রাস করার ষড়যন্ত্র করছে; ইতিমধ্যে দণ্ডভুক্তি গৌড়ের অধিকার থেকে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু অগ্নিবর্মার কোনও দিকেই লক্ষ্য নেই। দেশের যখন সর্বনাশ উপস্থিত হয় তখন রাজারা বুদ্ধিভ্রষ্ট হন। আজ গৌড় পুন্ড্র সমতট সর্বত্র এই দেখছি, শাসনশক্তিহীন রাজারা রমণীর মত পরস্পর কোন্দল করছেন, নয় বিলাসব্যাসনে গা ঢেলে দিয়েছেন। রাষ্ট্রের অবস্থা ঘুণ-চর্বিত কাষ্ঠের ন্যায়। অন্তবাণিজ্য বহিবাণিজ্য দুই-ই উৎসনে গিয়েছে। প্রজার মনে সুখ নেই, ধর্মজ্ঞানও লুপ্তপ্রায়। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর থেকে দেশের এই দুর্দিন আরম্ভ হয়েছে। কতদিন চলবে জানি না। যতদিন না দেশে নূতন কোনও শক্তিমান রাজার আবির্ভাব হবে ততদিন দেশের মঙ্গল নেই।

নিশ্বাস ফেলিয়া শীলভদ্র নীরব হইলেন।

বজ্র প্রশ্ন করিল— আপনি আমাকে গ্রামে ফিরে যেতে বলছেন কেন?

শীলভদ্র বলিলেন—তুমি নিঃসঙ্গ নিঃসহায় অবস্থায় কর্ণসুবর্ণে যাচ্ছ। বর্তমান রাজার লোকেরা যদি জানতে পারে তুমি মানবদেবের পুত্র, তোমার জীবন-সংশয় হবে, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছিল তারা

তোমাকে নিষ্কৃতি দেবে না। তোমার পিতা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর সন্ধান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল মৃত; ব্যর্থ অন্বেষণে নিজের জীবন বিপন্ন করে লাভ কি?

বজ্র বলিল—আমার পিতা বেঁচে আছেন এ সম্ভাবনা কি একেবারেই নেই?

শীলভদ্র বলিলেন–তোমার পিতা বেঁচে থাকলে রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতেন। গত বিশ বছরের মধ্যে সেরূপ কোনও চেষ্টা হয়নি।

সুদীর্ঘ নীরবতার পর বজ্র ধীরে ধীরে বলিল—পিতার মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে মার কাছে ফিরে যেতে আমার মন সরছে না। আমি কর্ণসুবর্ণে যাব, তারপর যা হয় হবে।

শীলভদ্র বলিলেন—আর একটা কথা আছে। কর্ণসুবর্ণে রাষ্ট্রবিপ্লব আসন্ন। জয়নাগের জাল গুটিয়ে আসছে, হঠাৎ একদিন সমরানল জ্বলে উঠবে, কর্ণসুবর্ণ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হবে। তুমি বাহিরে আছ, ইচ্ছা করে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেন? জয়নাগ যে-কোনও মুহূর্তে মাথা তুলতে পারে।

আবার জয়নাগ! বজ্র চকিত হইয়া বলিল—জয়নাগ কে?

যে রাজা গৌড়দেশ অধিকার করবার চক্রান্ত করছে তার নাম জয়নাগ।

বজ্র নাগদের সম্বন্ধে যে সন্দেহ করিয়াছিল তাহা আরও দৃঢ় হইল, কিন্তু এ বিষয়ে শীলভদ্রের সহিত আলোচনা করিবার স্পৃহা তাহার হইল না। সে করজোড়ে বলিল— আপনার সহৃদয়তা ভুলব না। আজ আজ্ঞা করুন।

শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্ণসুবর্ণে যাবে?

বজ্র বলিল—পিতৃ-পিতামহের রাজধানীর এত কাছে এসে আমি ফিরে যাব না। আমাকে কর্ণসুবর্ণে যেতেই হবে।

শীলভদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—সকলই তথাগতের ইচ্ছা। যাও। কিন্তু এক কাজ করো, তোমার ঐ অঙ্গদ ঢাকা দিয়ে রাখো।

কেন?

দেশের সোনার বড় অভাব হয়েছে। তোমার হাতে সোনার অঙ্গদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কর্ণসুবর্ণে দস্যু-তস্করের অভাব নেই।

শীলভদ্র কর্পটের ন্যায় একটি বস্ত্রখণ্ড লইয়া নিজ হস্তে বজ্রের অঙ্গদের উপর তাগা বাঁধিয়া দিলেন, বলিলেন—যদি নগরে অর্থাভাব হয় কোনও স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে অঙ্গদ থেকে সোনা কেটে বিক্রয় কোরো। অন্যথা অঙ্গদ কাউকে দেখিও না। অরাজকতার দেশে সাধুও তস্কর হয়।

শীলভদ্রের পদধূলি লইয়া বজ্র বলিল—আপনাকে শতকোটি ধন্যবাদ। কর্ণসুবর্ণে আপনার পরিচিত কেউ আছে কি?

শীলভদ্র চকিত চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন— পরিচিত অনেক আছে, কিন্তু তাদের দিয়ে কাজ হবে না। তুমি একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা কোরো। তাঁর নাম কোদণ্ড মিশ্র, নগরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে তাঁর কুটির।

তিনি কে?

তিনি এক সময় তোমার পিতামহের সচিব ছিলেন। পিতামহের সচিব! বজ্র আগ্রহভরে শীলভদ্রের পানে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তিনি আর কিছু বলিলেন না।

অতঃপর বজ্র বিদায় লইল। শীলভদ্র দীপ নিভাইয়া অন্ধকারে নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—সুগত, তোমার মনে কি আছে জানি না। এই বালকের হৃদয়ে নিষ্ঠা আছে, ধৈর্য আছে, দৃঢ়তা আছে। যদি প্রাক্তন পুণ্যবলে ও পিতৃরাজ্য ফিরে পায়, হয়তো দেশের ভাগ্যও ফিরবে। তাই ওকে কোদণ্ড মিশ্রের কাছে পাঠালাম। এখন তোমার ইচ্ছা।

–

প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে বজ্র প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিল। দেখিল সংঘের সকলেই জাগিয়া উঠিয়া নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মণিপদ্ম হাসিমুখে তাহার দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

দুইজনে সংঘের বাহিরে আসিল। বজ্ৰ বলিল—ভাই, এবার তবে যাই। যদি এ-পথে ফিরি আবার দেখা হবে।

মণিপদ্ম প্রশ্ন করিল—কবে ফিরবেন?

বজ্ৰ বলিল—তা জানি না। তুমি সংঘেই থাকবে তো?

মণিপদ্ম একমুখ হাসিয়া বলিল—হয়তো থাকব না। আর্য শীলভদ্র আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন, বলেছেন আমাকে নালন্দায় নিয়ে যাবেন।

সে কবে? আর্য শীলভদ্র সমতট থেকে ফিরে এলে।

বজ্ৰ দেখিল, মণিপদ্মের মুখে চোখে উচ্ছলিত আনন্দ। সে জিজ্ঞাসা করিল—নালন্দায় গিয়ে কি হবে? সেখানে কি তুমি অন্য কাজ করবে?

মণিপদ্ম বলিল—না, এখানে যে কাজ করছি সেখানেও তাই করব। কিন্তু সে যে নালন্দা—মহাতীর্থ! ভদন্ত শীলভদ্র ছাড়াও কত জ্ঞানী মহাপুরুষ, কত সিদ্ধ অর্হৎ আছেন।

তাঁদের সেবা করে আমি ধন্য হব।

মণিপদ্মের উদ্ভাসিত মুখের পানে চাহিয়া বজ্রের অন্তর ক্ষণেকের জন্য টলমল করিয়া উঠিল। মণিপদ্ম

যে-পথে চলিয়াছে তাহা কেমন পথ, কোন্ আনন্দঘন শান্তিনিকেতনে তাহার শেষ? আর বজ্র যে-পথে পা বাড়াইয়াছে তাহারই বা সমাপ্তি কোথায়?

দুইজন বিপরীত পথের যাত্রী সংঘের সম্মুখে পরস্পর আলিঙ্গন করিল। তারপর বজ্র কর্ণসুবর্ণের পথ ধরিল।

কর্ণসুবর্ণ নগর একদিকে ভাগীরথী ও অন্যদিকে ময়ূরাক্ষী-ময়ূরীর সম্মিলিত ধারার দ্বারা পরিখীকৃত, তাই তাহার আকৃতি ত্রিভুজের ন্যায়; উত্তরে প্রশস্ত, দক্ষিণে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া সঙ্গমস্থলে কোণের আকার ধারণ করিয়াছে। নগরের উত্তর প্রান্তে বিস্তীর্ণ প্রাকার স্থলপথে নগরকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে।

ত্রিকোণ স্থানটি আয়তনে বড় কম নয়, তাহার মধ্যে লক্ষাধিক লোকের বাস। তাহা ছাড়া প্রাকার পরিখার বাহিরেও বহুলোকের বসতি। দক্ষিণে মৌরীর পরপারে যাহারা বাস করে তাহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক, নগরে ফল ফুল শাক-পত্র যোগান দেওয়া তাহাদের জীবিকা।

কর্ণসুবর্ণ নূতন নগর; মথুরা বারাণসীর ন্যায় প্রাচীন নয়। তাহার পথগুলি ঋজু, গলিখুঁজি বেশি নাই। পথের দুই ধারে নানা বর্ণের চূর্ণলিপ্ত দ্বিতল ত্রিতল গৃহ, গৃহচূড়ায় ধাতুকলস। পথে পথে বহু দেবদেবীর মন্দির, বৌদ্ধ চৈত্য মঠ। নগরের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাজপথ গঙ্গার ধার দিয়া গিয়াছে। পথের পূর্ব ধারে অসংখ্য ছোটবড় ঘাট, স্নান ঘাট, খেয়া ঘাট, বন্দর। পথের অপর পাশে ধনী নাগরিক ও রাজপুরুষদিগের তুঙ্গশীর্ষ প্রাসাদ। এই পথ দক্ষিণদিকে যেখানে শেষ হইয়াছে সেই নদীরচিত কোণের উপর দুর্গাকৃতি রাজ-অট্টালিকা। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শশাঙ্কদেব গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া এই জলদুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তারপর দুর্গের ছায়াতলে নগর গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভাগীরথী-তীরস্থ অগণ্য ঘাটের মধ্যে একটি ঘাট সর্বাপেক্ষা বৃহৎনাম হাতিঘাট। একশত রাজহস্তী এই ঘাটে একসঙ্গে স্নান করিতে পারে। শুধু তাই নয়, ইহাই নগরের বন্দর। ঘাটের সম্মুখে গভীর জলে বহু সমুদ্রগামী তরণী বাঁধা, তাহাদের ঊর্ধোত্থিত গুণবৃক্ষ শরবনের ন্যায় জলপ্রান্ত কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছে। বণিক শ্রেষ্ঠীদের পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের ইহা একটি প্রধান কেন্দ্র। আবার সাধারণ নগরবাসীর ইহা হট্টও বটে। মৎস্য হইতে আরম্ভ করিয়া কদলী কুষ্মাণ্ড অলাবু; মুড়ি চালভাজা পর্পট তিলখণ্ড; ফুল মালা কপূর চন্দন — কোনও বস্তুরই এখানে অপ্রতুল নাই। অপরাহ্নে বায়ুসেবনেচ্ছু নাগরিকেরা এখানে সমবেত হয়; তখন বহুবিস্তীর্ণ ঘাটে তিল ফেলিবার ঠাঁই থাকে না। গান, পঞ্চালিকার নাচ, অহিভুণ্ডিকের সাপ খেলানো, মায়াবীর ইন্দ্রজাল; সব মিলিয়া ঘাট গম্ করিতে থাকে।

বজ্র যেদিন প্রাতঃকালে কর্ণসুবর্ণে আসিয়া উপনীত হইল সেদিন নবারুণ কিরণে নগর ঝলমল করিতেছিল। চারিদিকে নবজাগ্রত নগরের কর্মচাঞ্চল্য, গোরথ অশ্বরথ ঢল্লরিকা ঝম্পানের ছুটাছুটি। দেব-দেউলে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতেছে। স্নানার্থীরা ঘাটের দিকে চলিয়াছে, পূজার্থীরা মন্দিরে যাইতেছে; করণেরা তাম্বুলচর্বণ করিতে করিতে অধিকরণে চলিয়াছে। পথে পদচারীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক, দুই চারিটি নারীও দেখা যায়। পুরুষদের মাথায় উষ্ণীষ নাই, তৈলসিক্ত কেশ কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে। সেকালে বাঙ্গালীর চুলের আদর বড় বেশি ছিল; পাছে কেশকলাপের শোভা ঢাকা পড়ে, তাই তাহারা মাথায় কোনও প্রকার আবরণ দিত না। কেবল যাহারা রাজপুরুষ বা সৈনিক তাহারা মাথায় পাগ পরিত।

বজ্র চারিদিক দেখিতে দেখিতে রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার মুখ শান্ত, উত্তেজনার কোনও চিহ্ন নাই; মুখ দেখিয়া অনুমান করা যায় না যে তাহার মনের মধ্যে উত্তেজনার ঝড় বহিতেছে। সে পূর্বে কখনও নগর দেখে নাই; গ্রামে থাকিতে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিত নগর কিরূপ। কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে তাহার কল্পনা বামন হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল—এই কর্ণসুবর্ণ নগর! এই আমার পিতৃ-পিতামহের লীলাভূমি!

জন্মান্তরের প্রীতিসূত্রের ন্যায় কর্ণসুবর্ণ নগর তাহার নাড়িতে টান দিল, দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি বিপরীতমুখী মনোবৃত্তি যেন নিভৃতে থাকিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল—বিম্ব দেখিয়া ভুলিও না, জলবিম্বের ভিতরে কিছু নাই, বুদ্‌বুদ ফাটিলে কিছুই থাকে না—সাবধান! সতর্ক হও!

লক্ষ্যহীন মোহাক্রান্তভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র এক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অনুভব করিল তাহার উদর শূন্য। ভাণ্ডারে থরে থরে মিষ্টান্ন সাজানো রহিয়াছে—দধি, ঘনাবর্ত দুগ্ধ, মোয়া, খাঁড়, পিঠাপুলি। মিষ্টগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বহু রক্ত-পীত বরলা আসিয়া জুটিয়াছে। নগ্নদেহ মোদক বসিয়া বৃহৎ কটাহে রসবড়া ভাজিতেছে।

বজ্র ময়রার দোকানে প্রবেশ করিল। কোমর হইতে কয়েকটি কড়ি ও ক্ষুদ্র ধাতুমুদ্রা বাহির করিয়া বলিল—আমার কাছে এই আছে। এতে যা খাবার হয় আমাকে দাও।

ময়রা দেখিল বিপুলকায় আগন্তুক কানসোনার লোক নয়, বিদেশী। সে পুত্রকে ডাকিয়া ভিয়ানে বসাইল, নিজে উঠিয়া গিয়া চত্বরের উপর পিঁড়ি পাতিয়া বজ্রকে বসিতে দিল। তারপর তাহার দোকানে যত প্রকার মিষ্টান্ন ছিল একে একে পরিবেশন করিতে লাগিল। সেকালে বাংলা দেশে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য ছিল না; বিশেষত সম্প্রতি বহির্বাণিজ্যে মন্দা পড়ায় দেশজাত সকল বস্তুই সুলভ হইয়াছিল। সোনারূপারই অভাব হইয়াছিল, অন্নবস্ত্রের অভাব কখনও হয় নাই।

ময়রা যত দিল বজ্র তত আহার করিল। আহার করিতে করিতে সে দেখিল একটি লোক দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। লোকটি তালপত্রের ন্যায় কৃশ কিন্তু সাজসজ্জার পারিপাট্য অতি অদ্ভুত। পরিধানে সূক্ষ্ম মল্লের ধৌতি ও উত্তরীয়, মাথায় ফুলের মালা জড়ানো। হাতের নখ দীর্ঘ ও ত্রিকোণ করিয়া কাটা, তদুপরি আলতার প্রলেপ। অধরও অলক্তরাগে রঞ্জিত, কানে শঙ্খের কর্ণফুল। বৃশ্চিকপুচ্ছের ন্যায় বক্র একজোড়া গোঁফ, চক্ষু দুটি গোল, তাহার উপর ভ্রূযুগল আকৃষ্ট ধনুর ন্যায় চক্রীকৃত।

বজ্র এরূপ বিচিত্র জীব কখনও দেখে নাই। সে জানিত না কর্ণসুবর্ণের রসিক ও বিলাসী নাগরিকেরা এইরূপ বেশভূষা করিয়া নাগরবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকেন। সেও কৌতূহলী হইয়া লোকটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ চলিবার পর লোকটি উঠিয়া আসিয়া বজ্রের পাশে বসিল এবং আরও কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিল। তাহার কাঁকড়াবিছার ন্যায় গোঁফ নড়িতে লাগিল। তারপর সে বিস্ময়-কৌতুকভরা মিহি সুরে হাসিয়া উঠিল। বলিল—তুমি তো দেখছি একটি পিণ্ডবীর হে! দোকান প্রায় শেষ করে এনেছ, এবার কি ময়রাকে ধরে কামড় দেবে নাকি?

বজ্র উত্তর দিল না, আপন মনে আহার করিতে লাগিল। লোকটি তাহার ঊরু ও বাহুর পেশী টিপিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—হুঁ, একেবারে সাক্ষাৎ মধ্যম পাণ্ডব, যাকে বলে নরপুঙ্গব।

তুমি তো কানসোনার লোক নয় বাপু। নাম কি? নিবাস কোথায়?

বজ্ৰ এবারও উত্তর দিল না। লোকটি তখন তাহার পঞ্জরে অঙ্গুলির একটা খোঁচা দিয়া বলিল—আরে কথা কও না যে। তুমি বংগাল নাকি হে? বলি, কোন্ সুন্দরীবৃক্ষ থেকে নেমে এলে!

ভাগীরথীর পূর্বপারে বংগাল দেশ। তথাকার ভাষার বিকৃতি লইয়া গৌড়ীয় নগরবিলাসীদের মধ্যে ব্যঙ্গ-পরিহাস চলিত।

বজ্র দেখিল, লোকটি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে। সে ডান হাতে আহার করিতে করিতে বাঁ হাত দিয়া লোকটির মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিল। পাটকাঠির মত হাতের হাড় বজ্রের মুঠির মধ্যে মটু মট করিয়া উঠিল। লোকটি মিহি গলায় চিৎকার করিয়া উঠিল—আরে আরে, কর কি! উঁহুহু—ছাড় ছাড়, হাত ভেঙ্গে গেলে কাব্য লিখব

কি করে?

বজ্ৰ হাত ছাড়িল না, মুঠি একটু শিথিল করিল মাত্র। নির্লিপ্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, নাম কি?

লোকটি দ্রুতকণ্ঠে বলিল—নাম? আমার নাম বিম্বাধর—কবি বিম্বাধর। এবার ছেড়ে দাও বাবা, বাড়ি যাই।

বজ্র প্রশ্ন করিল—কবি বিম্বার কাকে বলে?

বিম্বাধর বলিল—কবি বিম্বাধর বুঝলে না? তুমি দেখছি একেবারেই—না না, তুমি ভারি সজ্জন। তা—আমার নাম বিম্বাধর কিনা, তার ওপর আমি কবি, কাব্য লিখি—তাই লোকে আমাকে কবি বিম্বাধর বলে। বুঝলে?

বজ্রের আহার সমাধা হইয়াছিল, সে ঘটির জল গলায় ঢালিয়া জল পান করিল। বলিল—বুঝলাম না। কাব্য কী?

বিম্বাধর হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার ধনুসাকৃতি ভ্রূযুগল আরও গোল হইয়া গেল। শেষে সে বলিল—কাব্য কাকে বলে জান না! মেঘদূত পড়নি? নৈষধ? বল কি হে, তুমি যে অবাক। করলে! কাব্যকাব্যরসের কথা—শ্লোককশ্চিৎ কান্তা শৃঙ্গার রস—

কিন্তু কাব্য কী তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিকে বোঝানো সকলের কর্ম নয়, বিম্বাধর কবি হইয়াও তাহা বুঝাইতে পারিল না। বজ্রেরও বুঝিবার দুর্নিবার আগ্রহ ছিল না, সে বিম্বাধরের হাত ধরিয়া দোকানের বাহিরে আসিয়া

দাঁড়াইল। একটু হাসিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আমি নতুন লোক, তুমি আমাকে কানসোনা দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবে।

বিম্বাধর বড় ফাঁপরে পড়িল। সে স্বভাবত লঘুপ্রকৃতি ও রঙ্গপ্রিয়; বজ্রকে মোদকালয়ে আহার করিতে দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল ভোজনপটু গ্রামীণটাকে লইয়া দুদণ্ড রগড় করিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু রগড় করিতে গিয়া অবস্থা দাঁড়াইয়াছে বিপরীত, গ্রামীণটাই তাহাকে বানর-নাচ নাচাইতেছে। তাহার বজ্রমুষ্টি ছাড়াইয়া যে পলায়ন করিবে সে উপায় নাই, যেমন দৈত্যের মত চেহারা, জোরও তেমনি।

বিম্বার মনে মনে পলায়নের ফন্দি খুঁজিতেছে, এমন সময় রাস্তার দক্ষিণ দিক হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল। বজ্ৰ সেইদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, একটি চতুর্দোলা আসিতেছে। চারিজন অসুরাকৃতি বাহক দোলা স্কন্ধে বহন করিয়া আনিতেছে। দোলার সম্মুখে পশ্চাতে কয়েকজন বংশীবাদক মিঠা সুরে বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। একটি দাসী সোনার থালায়। পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া দোলার পাশে পাশে যাইতেছে।

চতুর্দোলা কাছে আসিতে লাগিল। চতুর্দোলার আসনে দুকূল বস্ত্রের বেষ্টনীমধ্যে যিনি বসিয়া আছেন তাঁহাকে স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু অনেকখানি অনুমান করা যায়; মনে হয় যেন শীত-প্রভাতে হিমাচ্ছন্ন সরোবরের মাঝখানে স্বর্ণকমল ফুটিয়া আছে। যে দাসীটি পাশে পাশে চলিয়াছে সে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া অন্তরালবর্তিনীর সহিত হাসিয়া কথা কহিতেছে। দাসীটি লোলযৌবনা, দেহের বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায়, কিন্তু সে রূপসী। তাহার নাম কুহু। কুহু শুধু রূপসী নয়, চটুলা ছলনাময়ী রতিরস-চতুরা।

কিন্তু কুহুর কথা পরে হইবে।

চতুর্দোলা বজ্রের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সহসা তাহার আবরণ উন্মোচন হইল। যিনি এতক্ষণ অচ্ছাব তিরস্করিণীর অন্তরালে রহস্যময়ী হইয়া ছিলেন বজ্র তাহাকে মুখোমুখি দেখিতে পাইল। অতুযগ্র আলোকে মানুষের যেমন চোখ ঝলসিয়া যায়, বজ্রেরও তেমনি চক্ষু ধাঁধিয়া গেল।

দোলার পর্দা দুই হাতে সরাইয়া রমণী তাহার দিকেই চাহিয়া আছেন। ওষ্ঠাধর ঈষন্মুক্ত, চক্ষুতারকা নিশ্চল, স্তনপট্ট অল্প স্খলিত, দেহভঙ্গিতে মদালসতার সহিত প্রগতা মিশিয়াছে। রমণী নবযুবতী নয়, প্রগাঢ়যৌবনা; তন্বী নয়, পরিপূর্ণাঙ্গী; গায়ের রঙ দুধে-আলতা, আলতার ভাগ কিছু বেশি। চক্ষু দুটি হরিণায়ত, কিন্তু দৃষ্টিতে তীব্রতা মাখানো; অধর পক-বিম্বফলের ন্যায় সুপুষ্ট ও গাঢ় রক্তবর্ণ, আবার নবপল্লবের ন্যায় কোমল। সব মিলিয়া মুখখানি অপূর্ব সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য ছাড়াও মুখে এমন কিছু আছে যাহা পুরুষের স্নায়ু-শোণিতে আগুন ধরাইয়া দেয়, বুকে উন্মাদনার সৃষ্টি করে।

নারী নয়, ললৎ-শিখা লালসার বহ্নি।

বজ্ৰ চাহিয়া রহিল, দোলা তাহার সম্মুখ দিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। রমণী কিন্তু একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া দেখিতে দেখিতে তিনি অস্ফুটস্বরে দাসীকে কিছু বলিলেন; অমনি দাসী ঘাড় ফিরাইয়া বজ্রের দিকে চাহিল।

দাসীর চোখে বিজলী খেলিয়া গেল; সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। তারপর দেখিতে দেখিতে দোলা

দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল। বাঁশির রেশও ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল।

কবি বিম্বাধর এতক্ষণ শিকলে বাঁধা পাখির ন্যায় ছটফট করিতেছিল এবং বজ্রের মুঠি হইতে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। এখন বজ্র তাহার দিকে ফিরিতেই সে বলিয়া উঠিল, দেখলে তো? কানসোনায় আর কিছু দেখবার নেই। এবার হাতটি ছেড়ে দাও, বাড়ি গিয়ে শ্লোক লিখি। মাথায় পদ্য এসেছে।

বজ্ৰ জিজ্ঞাসা করিল—দোলায় যিনি গেলেন—উনি কে?

বিম্বাধর বলিল—হায় হতভাগ্য, তাও জান না! রানী রানী, গৌড়ের রাজমহিষী দেবী শিখরিণী।

রানী! হাঁ, রানীর মত রূপ বটে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের মনে পড়িল তাহার মায়ের মুখ। না, এ রানী বয়সে তরুণী বটে, কিন্তু তাহার মায়ের মত সুন্দর নয়। রঙ্গনা রাজহংসী, আর শিখরিণী চক্রবাকী; উভয়ের তুলনা হয় না।

উপরন্তু রানীর হাবভাব যেন নির্লজ্জতার সূচক! কিন্তু কিছুই বলা যায় না, রানীদের পক্ষে এইরূপ হাবভাবই হয়তো স্বাভাবিক। বজ্র অনভিজ্ঞ গ্রামবাসী, নগরের রীতিনীতি আচার-আচরণ কী বুঝিবে?

বজ্রের চিন্তায় বাধা দিয়া বিম্বাধর বলিল— ভ্রাতঃ চাতক, তুমি যে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলে। তা আমার হাতটি মোচন করে হতভম্ব হলেই পার। হাতে যে ঝিঝিনি ধরে গেল।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—রানী কোথায় গেলেন?

বিম্বাধর বলিল—মন্দিরে পূজা দিতে গেলেন। ঐ যে চতুষ্পথের ওপারে প্রকাণ্ড মন্দির কামেশ্বর শিবের মন্দির রানী ওখানে প্রায়ই পূজা দিতে যান। তা তুমিও যাও না, দেবমন্দিরে যেতে কারুর মানা নেই। যাও যাও, রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে।

বিম্বাধরের বক্রোক্তি না বুঝিয়া বজ্ৰ বলিল—না, আমার অন্য কাজ আছে।

বিম্বাধর আনন্দিত হইয়া বলিল—বেশ বেশ। তাহলে আর দেরি করে কাজ নেই, বিলম্বে কার্যহানি। তুমি নিজের কাজে যাও, আমিও বাড়ি গিয়ে শ্লোকটা লিখে ফেলি। এবার হস্তটি উন্মোচন কর।

বজ্র বলিল—উন্মোচন করতে পারি, কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। আমি এখানে কিছু চিনি না, আমাকে একটি স্বর্ণকারের দোকান দেখিয়ে দিতে হবে।

বিম্বাধর অমনি উৎকর্ণ হইল। ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বজ্রের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল—স্বর্ণকারের দোকান! সোনাদানা কিনবে নাকি?

বজ্ৰ মৃদু হাসিয়া বলিল—কিনব না।—দেখিয়ে দিতে পারবে?

বিম্বাধর বজ্রের বাহুতে তাগাবাঁধা লক্ষ্য করিয়াছিল, সোৎসাহে বলিল—পারব না! সোনা বিক্রি করবে বুঝি? এতক্ষণ বলনি কেন? এস এস, এই যে কাছেই স্যাকরার বাড়ি–

বজ্র বিম্বাধরের হাত ছাড়িয়া দিল। বিম্বাধরের পলায়ন-স্পৃহা আর ছিল না; যেখানে সোনারূপার গন্ধ আছে সেখান হইতে কবি বিম্বাধরকে মারিয়া তাড়ানো যায় না। এতক্ষণ সে বজ্রকে কপর্দকহীন গ্রামীণ মনে করিয়াছিল বলিয়াই পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল, এখন জোঁকের মত তাহার গায়ে জুড়িয়া গেল।

—

সকল বৃহৎ নরগোষ্ঠীতে জলৌকা-জাতীয় এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহারা কোনও কর্ম করে, নিঃসাড়ে পরের রক্ত-শোষণ করিয়া উদরপূর্তি করে। কবি বিম্বাধর সেই শ্রেণীর লোক। সে রঙ্গরসিক ও বাকপটু, ধনী ব্যক্তিদের অশ্লীল কবিতা ও গল্প শুনাইয়া কবিখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। চাটুকার্য ও বিদূষক বৃত্তি ছিল তাহার জীবিকা। অর্থের জন্য কোনও নিকৃষ্ট কার্য করিতে সে পশ্চাৎপদ ছিল না।

বজ্রের মধ্যে শাঁস আছে বুঝিয়া বিম্বাধর পরম আগ্রহে তাহাকে স্বর্ণকারের গৃহে লইয়া চলিল। বেশি দূর যাইতে হইল না, ঐ পথেরই কয়েকখানা বাড়ি পরে এক স্বর্ণকারের গৃহ। বিম্বাধর বজ্রকে সেখানে উপস্থিত করিয়া স্বর্ণকারকে বলিল—ওহে অর, এই নাও, এক বিদেশী ভদ্র তোমার সঙ্গে ব্যাপার করতে চান।

অরদাস পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি, শান্ত মন্থর প্রকৃতি। সে প্রাতঃকালে নিজ কর্মকক্ষে বসিয়া দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, সোনায় সোহাগা দিয়া পিত্তলের নালিকা দ্বারা প্রদীপ শিখায় ফু দিয়া সোনা গলাইতেছিল। বজ্র ও বিম্বাধরকে সে সমাদর করিয়া বসাইল।

বজ্র প্রগণ্ড হইতে প্রথমে শীলভদ্রের বস্তুবন্ধন মোচন করিল, তারপর অঙ্গদ খুলিয়া অরদাসকে দিল। বলিল—এই অঙ্গদ থেকে এক মাষা কেটে নিয়ে তার দাম দাও।

অর অঙ্গদ লইয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিল। পাথরের মত ভারী সুন্দর গঠন দেখিয়া বিম্বাধরের জিহ্বা লালায়িত হইয়াছিল, সে সংহত স্বরে বলিল—সোনা নাকি?

অরদাস অঙ্গদ হইতে চক্ষু তুলিয়া বজ্রের পানে চাহিল, বলিল—হ্যাঁ, সোনা। এ অঙ্গদ আপনি কোথায় পেলেন?

অক্রুরের প্রশ্নের মধ্যে বিপজ্জনক কণ্টক আছে অনুভব করিয়া বজ্ৰ তাচ্ছিল্যভরে বলিল—

উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তুমি সোনা কিনতে রাজী থাক তো বল, নচেৎ অন্যত্র চেষ্টা করি।

অক্রুর বলিল—রাজী আছি। আপনি যদি গোটা অঙ্গদটা বিক্রি করেন আমি কিনতে রাজী আছি।

বজ্ৰ বলিল—না, কেবল এক মাষা সোনা বিক্রি করব।

অক্রুর বলিল—ভাল। এমন সুন্দর অঙ্গদ কাটতে কিন্তু মায়া হচ্ছে। ত্রিশ বছর আগে কানসোনাতে এক কারুকর ছিলেন, তাঁর হাতের কাজ আমি চিনি। এ অঙ্গদ তাঁরই রচনা। তিনি ছিলেন শশাঙ্কদেবের রাজকারুকর।

বজ্র ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—তা হবে। আমার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে এই অঙ্গদ লাভ করেছিলেন।

গোটা অঙ্গদ আপনি বিক্রি করবেন না? না।

অক্রুর তখন অতি সাবধানে এক মাষা সোনা কাটিয়া লইল, অঙ্গদের শিল্পশোভা ক্ষুন্ন হইল। তারপর হিসাব কষিয়া সোনার মূল্য কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা, কিছু দ্ৰক্ষ ও কপর্দক বজ্রকে দিল।

মূল্য পাইয়া বজ্ৰ গাত্রোত্থান করিলে অক্রুর সবিনয়ে বলিল—আবার যদি সোনা বিক্রি করেন আমার কাছে আসবেন, আমি উচিত মূল্য দেব। আর যদি গোটা অঙ্গদ বিক্রি করেন আমি বেশি মূল্য দেব।

ভাল। বলিয়া বজ্র বাহির হইল। বিম্বাধর তাহার সঙ্গে চলিল।

দুইজনে রাজপথে নামিয়া একদিকে চলিল। বজ্র বিম্বাধরের দিকে সহসা কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—কৈ, তুমি কবিতা লিখতে যাবে না?

বিম্বাধর বলিল—কবিতা! হাঁ হাঁ, লিখতে হবে বটে। তা তুমি এখন কোনদিকে যাবে?

বজ্ৰ বলিল—এবার একটা বাসস্থান খুঁজে নিতে হবে। কানসোনায় দুচার দিন থাকব স্থির করেছি। কোথায় বাসস্থান পাওয়া যায় বলতে পার?

বিম্বাধর বজ্রের বাহুর সহিত বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া বলিল—বন্ধু, যার গাঁটে কড়ি আছে তার আবার বাসস্থানের চিন্তা! চল, তোমাকে ভাল বাসস্থানে নিয়ে যাব। পান ভোজন সব পাবে। ভাল কথা, তোমার নাম তো বললে না।

একটু চিন্তা করিয়া বজ্ৰ বলিল—আমার নাম মধুমথন।

বিম্বাধর বলিল—বন্ধু মধুমথন, তোমার দেশ কোথায়?

বজ্ৰ বলিল—উত্তরে, মৌরী নদীর তীরে।

তুমি যে বংগাল নও তা তোমার কথা শুনেই বুঝেছি।—তা কি কাজে কানসোনায় এসেছ?

কাজ কিছু নেই, ভ্রমণে বেরিয়েছি।

বেশ বেশ। ভ্রমণ-রমণের এই তো বয়স। চল, তোমাকে উপর্যুক্ত স্থানে নিয়ে যাই।

উৎফুল্ল বিম্বাধর বজ্রকে লইয়া উত্তর দিকে চলিল।

এই সময় আবার বংশীরব শুনা গেল। রানী শিখরিণী পূজা দিয়া ফিরিতেছেন; আন্দোলিকার পাশে দাসী কুহু রিক্তহস্তে যাইতেছে। বজ্রের কাছাকাছি আসিয়া আবার দোলার দুকূল-আচ্ছাদন উঠিয়া গেল; রানী শিখরিণীর তপ্ত-তীব্র চক্ষু দুটি যুগ্মতীরের ন্যায় বজ্রকে বিদ্ধ করিল। বজ্র কিন্তু একবার চক্ষু তুলিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল, আর ওদিকে তাকাইল না।

দোলা দক্ষিণে রাজপুরীর দিকে চলিয়া গেল। বজ্র ও বিম্বাধর বিপরীত মুখে চলিল। তাহারা জানিতে পারিল না, দোলা কিছুদূর যাইবার পর রানী শিখরিণী কুহুকে চোখের ইশারা করিলেন; কুহু অমনি দোলার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বজ্রের পিছু লইল। চাঁপা রঙের উত্তরীয়টি মাথার উপর টানিয়া একটু আড়-ঘোমটা দিয়া মিষ্ট-দুষ্ট হাসিতে হাসিতে সন্তর্পণে বজ্রের অনুসরণ করিল।

বিম্বাধর বজ্রকে লইয়া এপথ ওপথ ঘুরিয়া শেষে নগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে এক জনবিরল পাটকে উপস্থিত হইল। পথটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, গৃহগুলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহ। পথের শেষ প্রান্তে নগরকারের কাছে একটি মদিরা-ভবন।

মদিরা-ভবনে দিনের পূর্বাহ্নে গ্রাহকের ভিড় ছিল না, শৌণ্ডিক মেঝেয় বসিয়া পিঁড়ির উপর ছক কাটিয়া এক প্রতিবেশীর সহিত কড়ি চালিতেছিল। মদিরা-ভবনটি শুধু পানশালা নয়, অষ্ট খেলার আড্ডাও বটে, আবার বহিরাগত পথিকের চটি। সম্মুখের ঘরটি বড়, আশেপাশে কয়েকটি ছোট ছোট কুঠুরী আছে।

শৌণ্ডিক লোকটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্কদেহ, বিরলদন্ত। বিম্বাধর ও বজ্র প্রবেশ করিলে সে স্বভাবরক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া চাহিল। বিম্বাধর বলিল—বটেশ্বর, তোমার জন্য গ্রাহক এনেছি। ইনি কানসোনায় নূতন এসেছেন, কিছুদিন থাকবেন। তাই তোমার আড্ডায় নিয়ে এলাম।

বটেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল, বজ্রকে আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বিম্বাধরের পানে চক্ষু ফিরাইল। বিম্বাধর একটু ঘাড় নাড়িল। তখন বটেশ্বর পানের ছোপ-ধরা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, জাঁতার ঘর্ঘর শব্দের মত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ঘষা-ঘষা গলায় বলিল— আসতে আজ্ঞা হোক। আমার ঘর আপনার ঘর, যতদিন ইচ্ছা থাকুন।

বজ্র একটি রৌপ্যমুদ্রা বটেশ্বরের হাতে দিয়া বলিল—এতে কতদিন চলবে?

সসমে মুদ্রা কপালে ঠেকাইয়া বটেশ্বর বলিল—এক মাস। স্বতন্ত্র ঘর পাবেন, তাছাড়া পান আহার শয়ন সেবা।

বটেশ্বর বর্জকে লইয়া গিয়া একটি প্রকোষ্ঠ দেখাইল। প্রকোষ্ঠটি গৃহের এক প্রান্তে, বাহিরে যাইবার স্বতন্ত্র দ্বার আছে। আকারে ক্ষুদ্র ও নিরাভরণ, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বজ্র কক্ষটি মনোনীত করিল। তখন বটেশ্বর ভৃত্য ডাকিয়া মেঝের উপর উত্তম শয্যা পাতিয়া দিল, জলের নূতন কলস ভরিয়া ঘরের এক কোণে রাখিল, দীপদণ্ডের শীর্ষে তৈলপূর্ণ প্রদীপ আনিয়া অন্য কোণে রাখিল। ব্যবস্থা দেখিয়া বজ্র প্রীত হইল।

বিম্বাধর বলিল—ভাই মধুমথন, চিন্তা কোরো না, তুমি সুখে থাকবে। বটেশ্বর পাকা সহিআর, ওর বাপের নাম ঘটেশ্বর, ঠাকুদার নাম ষণ্ডেশ্বর—ওরা তিন পুরুষে আড্ডাধারী। তোমার কোনও অযত্ন হবে না, যখন যা চাইবে হাতের কাছে পাবে। এমন কি বলিয়া অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপিল।

বিম্বাধরের সরস ইঙ্গিত বজ্ৰ বোধহয় বুঝিল না, সে বলিল—ভাল।

বিধাধর বলিল—এখন তবে চললাম। কিন্তু আবার আসব। তুমি নূতন মানুষ, নগরের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে হবে তো।

বিম্বাধর যে আবার আসিবে, তাহার এত সহৃদয়তা নিঃস্বার্থ নয়, তাহা বজ্ৰ বুঝিয়াছিল, সে একটু হাসিল। তারপর বিম্বাধর গমনোদ্যত হইলে সে বলিল—একটা কথা। কানসোনার দক্ষিণে গঙ্গার তীরে এক ব্রাহ্মণ থাকেন—নাম কোদণ্ড মিশ্র। তাঁকে চেন কি?

বিম্বাধর বলিল—বামুন? চালকলা? তার সঙ্গে তোমার কী প্রয়োজন?

বজ্ৰ বলিল—প্রয়োজন নেই। পুরনো পরিচয় আছে।

বিম্বাধর মাথা নাড়িল—কোদণ্ড মিশ্র? কৈ না, কখনও নাম শুনি নি। বটেশ্বর, তুমি চেনো?

বটেশ্বর বলিল—না। ব্রাহ্মণ মহোদয়েরা আমার আড্ডায় পায়ের ধুলো দেন না, চিন্ব কি করে?

অতঃপর বিম্বার আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া বিদায় হইল। মদিরা-ভবনের বাহিরে একটি গাছের আড়ালে কুহু দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে দেখিল বিম্বাধর চলিয়া গেল, কিন্তু বজ্র বাহির হইল না। কুহু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু বজ্র আসিল না। তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিল। বজ্র কোথায় থাকে এইটুকুই আপাতত তাহার জানার প্রয়োজন ছিল।

বজ্রের নাগরিক জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। কর্মহীন অলস দিনগুলি একে একে কাটিতে লাগিল।

মদিরা-ভবনের পিছনে অনতিদূরে ময়ূরাক্ষী ও ময়ূরীর মিলিত স্রোত বহিয়া গিয়াছে, নদীর ধারে ধারে প্রশস্ত বাঁধ। দুই চারিটি ঘাটও আছে, কিন্তু ঘাটের কোনও শোভা নাই। গঙ্গার ঘাট ছাড়িয়া স্বল্পতোয়া নদীতে বড় কেহ স্নান করিতে আসে না।

বজ্র মাঝে মাঝে নির্জন বাঁধে গিয়া বসিত। মৌরীর খাত আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরে মিলাইয়া গিয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া থাকিত। সে বেতসগ্রাম ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু মৌরী নদী তাহাকে ত্যাগ করে নাই। বাঁধের উপর দিয়া সে নগরসীমা পার হইয়া ময়ূরাক্ষী ও মৌরীর সঙ্গমস্থলে যাইত, মৌরীর উপল-বিকীর্ণ তীরে হাঁটু গাড়িয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিত। মৌরীর জলের চিরপরিচিত স্বাদ মুখে বড় মিষ্টি লাগিত। গ্রামের জন্য হঠাৎ প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত।

কিন্তু তবু সে কর্ণসুবর্ণের মায়া কাটাইয়া বেতসগ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারিত না। প্রত্যহ তাহার মনে হইত, কেন এই নিবান্ধব পুরীতে পড়িয়া আছি? পিতার সংবাদ পাইয়াছি, তিনি জীবিত নাই; তবে এখানে থাকিয়া লাভ কি? ফিরিয়া যাই, যেখানে মা আছেন, গুঞ্জা আছে সেই স্নেহের নীড়ে ফিরিয়া যাই। কিন্তু তবু সে যাইতে পারিত না; কর্ণসুবর্ণ নগর অদৃশ্য মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিত।

কবি বিম্বার প্রথমে ঘন ঘন আসিত। বজ্রকে লইয়া সে রাজপুরী দেখাইল, নাটকের অভিনয় দেখাইল, বিদগ্ধ-স্ত্রীর নৃত্যগীত শুনাইল, নানাভাবে তাহাকে আমোদ-প্রমোদে আসক্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ক্রমে সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। বজ্রের ললিতবনিতার প্রতি লোভ নাই, মদ্যপানে আসক্তি নাই, দূতক্রীড়ায় অনুরাগ নাই। এরূপ অরসিক অসামাজিক মানুষের পিছনে কতদিন ঘুরিয়া বেড়ানো যায়! বিম্বাধর আসা-যাওয়া কমাইয়া দিল! কিন্তু একেবারে বন্ধ করিতে পারিল না। বজ্রের বাহুতে পাথরের মত ভারী অঙ্গদটির কথা সে ভুলিতে পারে নাই।

বটেশ্বরের মদিরা-ভবনে বজ্রের অশন বসনের কোনও অসুবিধা ছিল না। অপরাহ্নে মদিরা-ভবনে যখন জনসমাগম হইত, মদ্যপায়ীরা সুরাভাণ্ডসহ ভর্জিত পর্পট ও ইল্লীশ মৎস্য লইয়া বসিত, দূত-ব্যসনীরা হলহল্ল করিয়া কড়ি চালিত ও বিতণ্ডা করিত, তখন বজ্র নিজ প্রকোষ্ঠের দ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। কখনও পথে পথান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত, কদাচ প্রাকারে উঠিয়া ইতস্তত বিচরণ করিত। প্রাকারে রক্ষী নাই, সংস্কারের অভাবে স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কিছু দেখে না, নগর শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নগর রক্ষার কথা কেহ চিন্তা করে না। সর্বত্র অবহেলার চিহ্ন।

বজ্র দুই একবার রাজপুরীর দিকেও গিয়াছিল। প্রাকারবেষ্টিত বিশাল পুরী; তোরণদ্বারে দুই চারিজন প্রহরী আছে বটে কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে রহস্যালাপ করিতেছে, যে-সকল নরনারী তোরণপথে যাতায়াত করিতেছে তাহাদের সহিত রঙ্গ পরিহাস করিতেছে। বজ্র পথে দাঁড়াইয়া ভীমকান্ত দুর্গপ্রাসাদ নিরীক্ষণ করিত আর ভাবিত—এই গড় আমার পিতামহ গড়িয়াছিলেন—আমার পিতা এই গড় রক্ষা করিতে প্রাণ দিয়াছিলেন! নিশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিয়া আসিত।

অধিকাংশ দিন বজ্র হাতিঘাটে গিয়া বসিত। সায়ংকালে হাতিঘাট বিচিত্র জনসমাবেশে মুখর ও বর্ণাঢ় হইয়া উঠিত। পুরুষ নারী বালক বৃদ্ধ; কেহ স্নান করিতে আসিয়াছে, কেহ বায়ু সেবনের জন্য। কদাচিৎ রাজার হাতি স্নানের জন্য ঘাটে আনীত হইত। হাতিরা গভীর জলে জলক্রীড়া করিত, শুঁড়ে জল ভরিয়া পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইত।

নানা লোকের নানা কথা বজ্রের কানে আসিত। বেশির ভাগ জল্পনা ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া। গৌড়ের সামুদ্রিক বাণিজ্য রসাতলে যাইতেছে, কেহ আর পণ্য লইয়া সমুদ্রে যাইতে সাহস করে না। রাজা ও রানী

সম্বন্ধে কেহ কেহ শ্লেষপূর্ণ বক্রোক্তি করিত। বজ্র এই সব কথা শুনিত এবং দেশের অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিবার চেষ্টা করিত।

ঘাটে বাঁধা সমুদ্রতরীগুলিও বজ্র লক্ষ্য করিত। দিনের পর দিন বিপুলকায় বহিত্রগুলি ঘাটে পড়িয়া আছে; মাঝি-মাল্লা নাই, গুণবৃক্ষে পাল নাই। উত্তর হইতে দুই চারিটি বাণিজ্যপোত আসে বটে কিন্তু তাহারা আবার উত্তরে ফিরিয়া যায়, সমুদ্রের দিকে যায় না।

এইভাবে ঘাটে বসিয়া বজ্রের সন্ধ্যা কাটিয়া যাইত। অন্ধকার নামিয়া আসিলে ঘাটের জনসংঘ ছায়াবাজির ন্যায় মিলাইয়া যাইত। বজ্র শূন্য ঘাট হইতে ফিরিয়া চলিত।

–

নগর পত্তনের ঘাটে বাটে পরিভ্রমণ কালে বজ্র কুহুকে কয়েকবার দেখিয়াছিল। কুহুকে সে রানীর দাসী বলিয়া চিনিত না; কারণ কুহু যখন রানীর দোলার সহিত যাইতেছিল তখন বজ্রের দৃষ্টি তাহার উপর পড়ে নাই, রানীর উগ্রোজ্জ্বল রূপশিখা তাহার চক্ষু আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। কুহুকে সে ভাল করিয়া দেখিল একদিন দ্বিপ্রহরে। বজ্ৰ মৌরীর এক ঘাটের পাশে বাঁধের উপর বসিয়া ছিল, ঘাটে আর কেহ ছিল না। সহসা একটি কিশলয়-শ্যামাঙ্গী যুবতী নৃত্যচটুল ছন্দে নূপুর বাজাইয়া নদীর কিনারায় নামিয়া আসিল এবং বজ্রের দিকে একটি ক্ষিপ্র গোপন কটাক্ষপাত করিয়া বেশবাস বর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে উত্তরীয়টি খসিয়া সোপান পটের উপর পড়িল, তারপর পড়িল কটির ধটি; তারপর যুবতী যখন কাঁচুলির গ্রন্থি খুলিতে উদ্যত হইল তখন বজ্ৰ উঠিয়া রণে ভঙ্গ দিল। নগর-বিলাসিনীদের নিরংশুকা হইয়া স্নান করাই হয়তো বিধি, কিন্তু বজ্র তাহা বসিয়া দেখিতে লজ্জা বোধ করিল।

ইহার পর আরও কয়েকবার কুহুর সহিত বজ্রের সাক্ষাৎ হইল। কখনও নির্জন প্রাকারের উপর, কখনও জনবহুল রাজপথে। কুহু স্মিত-ভঙ্গুর নেত্রপাতে বজ্রকে নিরীক্ষণ করিত, চোখের সঙ্কেতে তাহাকে ডাকিত। কথা বলিত না, রিমঝিম মঞ্জীর বাজাইয়া চলিয়া যাইত, যাইতে যাইতে পিছু ফিরিয়া আবার চোখের ইঙ্গিতে ডাকিত। কিন্তু বজ্র নাগরিক নয়, সে হয়তো কুহুর চোখের

আহ্বান বুঝিতে পারিত না, কিম্বা বুঝিতে পারিলেও আহ্বান উপেক্ষা করিত।

একদিন বৈকালে কালবৈশাখীর প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইয়া যাইবার পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বজ্র তাহার অভ্যস্ত স্থানে না বসিয়া একটি গোলাকৃতি উচ্চ চত্বরের উপর গিয়া বসিল। সমুদ্রগ্রামী বহিত্রগুলি যেখানে ভিড় করিয়া গুণবৃক্ষের অরণ্য রচনা করিয়াছে। সেখানে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা যায়; ঝড়ের দাপটে দুই চারিটি তরণীর আড়কাঠ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, রজ্জ্ব ছিঁড়িয়া জট পাকাইয়া গিয়াছে। একটি তরণী কাত হইয়া পড়িয়া অন্য তরণীর গুণবৃক্ষের সহিত আপন গুণবৃক্ষ আশ্লিষ্ট করিয়া বিপজ্জনক সংস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

এতদিন নৌকাগুলিতে নাবিক বা দিশারু কাহাকেও দেখা যাইত না। আজ দেখা গেল কয়েকটি নৌকার পট্টপত্তনের উপর নাবিকেরা কাজ করিতেছে, সম্ভবত শোধনসংস্কারের চেষ্টা করিতেছে। বজ্র আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিল।

বজ্র যে চত্বরে উপবিষ্ট ছিল সেই চত্বরে আর একজন লোক বসিয়া ব্যাকুল চক্ষে নৌকাগুলির পানে চাহিয়া আছে, বজ্র তাহা লক্ষ্য করে নাই। লোকটির বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর; দেহ এককালে স্থূল ছিল, এখন শীর্ণ ও লোলচর্ম হইয়া গিয়াছে। মুখে আভিজাত্যের চিহ্ন বর্তমান, কিন্তু বেশভূষার পরিপাট্য নাই; স্কন্ধের উত্তরীয়টি মলিন। দেখিলে মনে হয় সম্রান্ত ব্যক্তি, কিন্তু সম্প্রতি দুর্দশায় পড়িয়াছে।

লোকটি সহসা হায় হায় করিয়া উঠিল।

বজ্ৰ চমকিয়া তাহার দিকে ফিরিতেই লোকটি যেন চেতনা ফিরিয়া পাইল এবং অত্যন্ত লজ্জিত কণ্ঠে বলিল— ক্ষমা করুন, আমি আত্মসংবরণ করতে পারি নি।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে?

লোকটি কাতর স্বরে বলিল–এ বছরও আমার বুহিত্ত সমুদ্রে যেতে পারবে না। বর্ষা এসে পড়ল, আর কবে যাবে?

বজ্ৰ বুঝিল, এ ব্যক্তি কোনও সমুদ্রগামী তরণীর স্বামী। সে তাহার কাছে আসিয়া বসিল। বলিল— আপনার নৌকা সমুদ্রে যেতে পারবে না কেন?

লোকটি বোধহয় নিজের দুঃখের কথা কাহাকেও বলিবার সুযোগ পায় না, সে অতিশয় আপ্যায়িত হইয়া বলিল— আপনি দেখছি মরমী সৎপুরুষ। কানসোনায় কি নূতন এসেছেন?

হাঁ। আপনি বুঝি নৌ-বণিক?

হাঁ। আমার নাম বরুণ দত্ত। কিন্তু কানসোনার লোক আমাকে চারু দত্ত বলে ডাকে। বলিয়া বরুণ দত্ত করুণ হাসিল।

বজ্ৰ নাটকীয় শ্লেষ বুঝিল না, বলিল—আপনার ডিঙা আছে?

বরুণ দত্ত অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল— ঐ যে ঘাটের বাঁয়ে দুটি হংসমুখী ডিঙা, ও দুটি আমার ডিঙা।

বজ্র আবার প্রশ্ন করিল— কিন্তু ওদের সমুদ্রে যেতে বাধা কি?

তখন বরুণ দত্ত তাহার দুঃখের কাহিনী বজ্রকে শুনাইল।

বরুণ দত্ত পুরুষানুক্রমে সমুদ্রগামী ব্যবসায়ী, পূর্বকালে তাহাদের অনেকগুলি বহি ছিল, গৌড়বঙ্গের

পণ্য লইয়া বহুদূর পর্যন্ত যাত্রা করিত। দক্ষিণে সিংহল অতিক্রম করিয়া ভরুকচ্ছ যাইত, কখনও পারসীকদের দেশে যাইত। পূর্বদিকে মলয় যবদ্বীপ সুবর্ণভূমিতে যাইত। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইভাবে চলিয়াছে, গৌড়বঙ্গ পুন্ড্রমগধের পণ্যসম্ভার দেশ দেশান্তরে সঞ্চারিত হইয়া স্বর্ণ রৌপ্যের আকারে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

প্রায় বিশ বছর পূর্বে হঠাৎ এক নিদারুণ বাধা উপস্থিত হইল, সমুদ্রে হিংস্রিকা দেখা দিল। এতকাল সমুদ্রে জলদসুযর উৎপাত ছিল না, সকল দেশের বাণিজ্য-তরী স্বচ্ছন্দে সাগরবক্ষে বিচরণ করিত; এখন বনায়ু দেশের দসুযরা সমুদ্রের পথ বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিল। নিরীহ নিরস্ত্র পণ্যবাহী জাহাজ লুঠ করিয়া ডুবাইয়া ছারখার করিয়া দিতে লাগিল। তাহাদের দৌরাত্মে গৌড়বঙ্গের সাগরসম্ভবা লক্ষ্মী আবার সাগরে ডুবিতে বসিলেন।

গত বিশ বছরে গৌড়ের নৌ-বাণিজ্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণে সিংহল ও পূর্বে সুবর্ণভূমি পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহাও বুঝি আর থাকে না। আরব জলদসুযদের দুর্নিবার অভিযান বঙ্গোপসাগরের জল তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে।

বরুণ দত্তের সপ্তদশ ডিঙা ছিল, এখন মাত্র দুইটি অবশিষ্ট আছে, বাকিগুলি ভরাডুবি হইয়াছে। নাবিকেরা সমুদ্রে যাইতে চায় না; নৃশংস জলদসুযর হাতে প্রাণ দিবার জন্য কে সমুদ্রে যাইবে? বণিকেরা বেতন দিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে চায়, কিন্তু বাঙ্গালী সৈন্য সমুদ্রে যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত নয়,* বেতনের লোভেও তাহারা নৌ-যুদ্ধে যাইতে অসম্মত। রাজশক্তি নিশ্চেষ্ট উদাসীন, রাজা থাকিয়াও নাই। বাংলার বন্দরে বন্দরে বাঙ্গালীর নৌবাহিনী পঙ্কবদ্ধ হস্তিযুথের ন্যায় নিশ্চল; নদীর মোহানা পার হইয়া সাগরের নীল জলে ভাসিবার সাহস কাহারও নাই।

বরুণ দত্ত গত দুই বৎসর তাহার তরণী দুটিকে সমুদ্রে পাঠাইতে পারে নাই। এবার কয়েকজন বণিক মিলিয়া কিছু নাবিক ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল, স্থির করিয়াছিল তাহাদের তরণীগুলিকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া একসঙ্গে সমুদ্রে পাঠাইবে; তাহাতে জলদসুযর হাত হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা আছে। বরুণ দত্ত অতি কষ্টে কয়েকটি যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড়ে তাহার তরণী দুটি আহত হইয়াছে, শশাধনসংস্কার করিতে সময় লাগিবে। এদিকে বর্ষা আসন্ন, অন্য তরণীগুলি অপেক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং এবারও বরুণ দত্তের নৌকা সমুদ্রে যাইতে পারিবে না।

বরুণ দত্ত যখন তাহার কাহিনী শেষ করিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া আকাশে তারা ফুটিয়াছে। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বরুণ দত্ত বলিল— আমার মন্দ দশা যাচ্ছে। ধন সম্পত্তি প্রায় সবই গিয়েছে; শেষ পর্যন্ত বোধহয় কিছুই থাকবে না।

বরুণ দত্ত নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিল তাহা যে সমগ্র দেশের পক্ষে সত্য তাহা সে জানিত না।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল— অন্য নৌকাগুলি কবে যাত্রা করবে?

বরুণ দত্ত বলিল— পরশু ঊষাকালে। মঙ্গলের ঊষা বুধে পা সেদিন ত্রয়োদশী তিথিও। আছে।

এই সময়ের মধ্যে আপনার ডিঙা প্রস্তুত হবে না?

হয়তো হতে পারে। কিন্তু আর এক বিপদ ঘটেছে। যে-সব যোদ্ধা নৌকায় যেতে সম্মত হয়েছিল তারা এখন পশ্চাৎপদ হয়েছে। তারা বলছে, ভাঙা নৌকা, বর্ষাকাল এসে পড়েছে— এখন তারা যাবে না। এ বিপদ কেবল আমার নয়, অন্য নৌকায় যেসব যোদ্ধা যাচ্ছিল তারাও গণ্ডগোল করছে।

অতঃপর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি গাঢ় হইতেছে দেখিয়া বজ্ৰ উঠিল। হতাশ বরুণ দত্ত ঘাটেই বসিয়া রহিল।

রাত্রে কর্ণসুবর্ণের পথে আলোক নাই, কদাচিৎ কোনও গৃহস্থের মুক্ত দ্বার বা গবাক্ষপথে একটু আলোর প্রভা আসিয়া রাজপথে পড়িয়াছে। রাত্রে কোনও নাগরিককে কোথাও যাইতে হইলে উল্কা জ্বালিয়া পথ চলিতে হয়। বজ্র নক্ষত্রের আলোকে অতি যত্নে পথ চিনিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া আসিল।

বটেশ্বরের মদিরাগৃহে অতিথির ভিড় কমিয়াছে, মাত্র দুই চারিজন ঝুনা খেলোয়াড় প্রদীপের মিটিমিটি আলোতে অক্ষবাট ঘিরিয়া বসিয়া খেলিতেছে এবং ভর্জিত সহযোগে মদ্যপান করিতেছে। আলো বেশি নয়, ঘরের কোণে কোণে ছায়া জমিয়াছে, কিন্তু সেজন্য কাহারও অসুবিধা নাই; এইরূপ আলোতেই তাহারা অভ্যস্ত।

ঘরের একটি কোণ হইতে নিম্নস্বর বাক্যালাপের গুঞ্জন আসিতেছিল, বজ্র ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহা বন্ধ হইল। বজ্র নিজ প্রকোষ্ঠের দিকে যাইতে যাইতে একবার সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল কোণের ছায়ান্ধকারে তিনজন লোক বসিয়া আছে, যেন ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া কোনও গুপ্তকথার আলোচনা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন অপরিচিত, বাকি দুইজন বটেশ্বর ও বিম্বাধর। তিনজনেই বজ্রকে দেখিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহাদের নিষ্পলক দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যে বজ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তিনজনের মধ্যে বিম্বাধরই প্রথম আত্মসংবরণ করিল; ত্বরিতে উঠিয়া আসিয়া কৌতুকের ভঙ্গিতে বলিল— কি বন্ধু মধুমথন, তুমি যে দেখি নিশাচর হয়ে উঠলে! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

বজ্ৰ বলিল— হাতিঘাটে বসেছিলাম।

ভাল ভাল। তা এস না, দু পাত্র মধু পান করা যাক। বটেশ্বর অনুযোগ করছিল তুমি কিছুই পান কর না। এতে যে ওর মদিরা-ভবনের নিন্দা হবে।

আমার পক্ষে ভোজনই যথেষ্ট।

তা কি হয়? মধুপান না করলে নাগর হওয়া যায় না। এস এস।

না, আজ নয়।

বিম্বাধর একবার বটেশ্বর ও অপরিচিত ব্যক্তির সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিল, তারপর বলিল—তবে থাক। কাল কিন্তু আমি আবার আসব। একটু আসব-সেবা করে একসঙ্গে ভ্রমণে বাহির হব। কেমন?

বজ্র কিছু বলিল না। বিম্বাধর প্রস্থান করিলে সেও নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। বটেশ্বর ও অপরিচিত ব্যক্তি তখন আবার নিম্নস্বরে আলাপ আরম্ভ করিল। তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় তাহারা বজ্র সম্বন্ধেই গূঢ় আলোচনা করিতেছে।

দুই দণ্ড মধ্যে বজ্ৰ আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয়ন করিল। ক্রমে বটেশ্বরের মদিরাগৃহ নিঃশব্দ হইল, অতিথিরা প্রস্থান করিয়াছে। বজ্রের একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছে এমন সময় দ্বারে খুটখুট শব্দ শুনিয়া তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, সে চকিতে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ শব্দ নাই। বজ্ৰ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। তারপর আবার বাহিরের দিকের দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল। যে দ্বার দিয়া একেবারে পথে পড়া যায় সেই দ্বারে কেহ টোকা দিতেছে।

ঘরের কোণে দীপ স্তিমিত হইয়াছিল। বজ্ৰ উঠিয়া দীপ উস্কাইয়া দিল, তারপর সন্তর্পণে দ্বারের হুড় খুলিল।

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে একটি যুবতী। রাত্রির মতই গাঢ় নীল তার বসন; এক হস্তে প্রদীপ, অন্য হস্তে অঞ্চল দিয়া প্রদীপের শিখাটিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। প্রদীপের নিরুদ্ধ প্রভা যুবতীর বক্ষে কণ্ঠে পড়িয়াছে, মুখের নিম্নার্ধ আলোকিত করিয়াছে। বাহিরে ছায়া, ভিতরে আলো।

বজ্র কুহুকে দেখিয়াই চিনিয়াছিল, সে ক্ষণকাল বিস্ময়-বিমূঢ় রহিল। সেই ফাঁকে কুহু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বজ্ৰ চমকিয়া বলিয়া উঠিল— এ কি! কে আপনি?

কুহু মাথার গুণ্ঠন সরাইয়া বিললাল চক্ষে বজ্রের পানে চাহিল, ওষ্ঠাধর মুকুলিত করিয়া অধরে অঙ্গুলি রাখিল। তারপর ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল— আমাকে চিনতে পারছেন না?

বজ্ৰ দৃঢ়ভাবে নিজেকে আত্মস্থ করিল, সাবধানে বলিল— বোধহয় দু একবার দেখেছি। আপনি কে তা জানি না।

কুহু হাসিল। নিঃশব্দ হাসির তরল তরঙ্গে তাহার সমস্ত দেহ যেন হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। সে কুহক কলিত স্বরে বলিল— আমার নাম কুহু। কিন্তু আমাকে অত সম্মান করে কথা বলবেন না। আমি সামান্যা নারী।

কুহু প্রদীপটি মাটিতে নামাইয়া রাখিল, বজ্রের কাছে আসিয়া প্রগল্ভ হাসিয়া বলিল— আমার পরিচয় নিলেন, কৈ নিজের পরিচয় তো দিলেন না।

বজ্র এক পা পিছু হটিয়া বলিল— আমার নাম—মধুমথন। কর্ণসুবর্ণে নূতন এসেছি।

কুহু ওষ্ঠাধর বিভক্ত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চোখে চাহিয়া রহিল, অর্ধস্ফুট স্বরে যেন নিজ মনেই বলিল— মধুমথন—কি মিষ্টি নাম। আপনি যে নগরে নূতন এসেছেন তা অনেক আগেই বুঝেছি। নগরে যারা নাগর আছে আপনি তাদের মত নন।

কুহু পরিতৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল। এদিক ওদিক চাহিয়া ঘরের কোণে জলের কুম্ভ দেখিয়া সেইদিকে গেল, ঘটিতে জল ঢালিয়া জল পান করিল। তারপর বর্জ্রের শয্যার এক পাশে গিয়া বসিল। কোনও সঙ্কোচ নাই, এ যেন তাহার নিজেরই ঘর।

বজ্র নিবার্ক হইয়া দেখিতে লাগিল। গভীর রাত্রের নিভৃত শয়নকক্ষে এই প্রগল্ভা অভিসারিকার আকস্মিক অভিযান, এরূপ সংস্থা তাহার কল্পনাতীত। যুবতীর অভিপ্রায় সম্বন্ধেও বিশেষ সংশয়ের অবকাশ নাই। বজ্রের কর্ণদ্বয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বুকের রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।

সে সহসা বলিয়া উঠিল— আমার কাছে কি চাও? তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ ঘরের মধ্যে উচ্চ শুনাইল।

কুহু অমনি ঠোঁটের উপর অঙ্গুলি রাখিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিল, চাপা গলায় বলিল— ছি, ছি, অত জোর গলায় কি রহস্যালাপ করতে আছে? এখনি কে শুনতে পাবে। আসুন, কাছে

এসে বসুন। বলিয়া নিজের পাশে শয্যা নির্দেশ করিল।

বজ্র একটু ইতস্তত করিয়া শয্যার অন্য প্রান্তে গিয়া বসিল। কুহু তাহা দেখিয়া মিষ্ট-দুষ্ট হাসিল, বজ্রের দিকে সরিয়া আসিয়া ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলিল— আমি কী চাই তা কি এখনও বুঝতে পারেন নি?

বজ্র কিছুক্ষণ বুকে ঘাড় গুঁজিয়া রহিল, তারপর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল— নগরে নাগরের অভাব নেই।

কুহু বরে আরও কাছে সরিয়া আসিল, চক্ষু দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া বলিল— নগরে কুকুরেরও অভাব নেই, কিন্তু বনের বাঘ কটা আছে? আপনি আমার মধু-নাগর। আমার লজ্জা নেই। আপনি আমার প্রতি সদয় হোন।

বজ্র পূর্ববৎ বুকে ঘাড় গুঁজিয়া বলিল—না।

কুহুর মুখ একটু মলিন হইল। সে ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে কি আপনার ভাল লাগে না?

বজ্ৰ চকিতে একবার চক্ষু তুলিয়া আবার চক্ষু নামাইল, কথা কহিল না। কুহুর মুখে তখন আবার হাসি ফুটিল। বজ্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল; সে অঙ্গুলি দিয়া বজ্রের বাহুর উপর মৃদু স্পর্শে হাত বুলাইয়া স্নেহ-বিগলিত স্বরে বলিল— বুঝেছি। তুমি বড় কাঁচা, এখনও মনে রঙ ধরেনি— তোমার বয়স কত?

বজ্রের মনের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে উৎফুল্ল মুখ তুলিল। নগরে আসিয়া অবধি সে যে

বস্তুটির জন্য মনে মনে বুভুক্ষু হইয়া উঠিয়াছিল তাহা রমণীর স্নেহস্পর্শ : এতক্ষণে তাহাই সে কুহুর কণ্ঠে শুনিতে পাইল। সে এক মুখ হাসিয়া বলিল— আমার বয়স কুড়ি।

কুহু বলিল— আমার উনিশ। কিন্তু তবু আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক কিছু শেখাতে পারি।

হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিটি কিন্তু নৈরাশ্য-বিদ্ধ।

আজ আমি ফিরে চললাম। কিন্তু আবার আসব। বলিয়া কুহু সসঙ্কেত অঙ্গুলি তুলিল।

বজ্রও উঠিল। কুহু দ্বারের কাছে গিয়া বাহিরে উঁকি মারিল, তারপর উদ্বিগ্নমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল — নগর নিশুতি, পথ বড় নির্জন। আমার ভয় করছে।

কিসের ভয়?

দুষ্ট লোকের ভয়। তুমি আমাকে ঘরে পৌঁছে দেবে?

কোথায় তোমার ঘর?

অনেক দূরে, নগরের দক্ষিণে।

বজ্র দ্বিধায় পড়িল, ইতস্তত করিয়া বলিল— তুমি—তোমার স্বামী—

কুহু ফিক করিয়া হাসিল—তোমার কি ভয় করছে নাকি?

না। চল।

কুহু সানন্দে বজ্রের হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে লইয়া চলিল। বজ্ৰ বলিল— পিদিম নিলে না?

না, আমি অন্ধকারে পথ চিনে যেতে পারব।

দুইজনে বাহির হইল। মসীবর্ণ রাত্রি, কেবল স্পর্শানুভূতির দ্বারা সঙ্গ পাওয়া যায়। কুহু বজ্রের হাত ধরিয়া রহিল; ক্রমে তাহার বাহু বজ্রের সহিত জড়াইয়া গেল। বজ্র আপত্তি করিল

না।

পথ চলিতে চলিতে দুই চারিটি কথা হইল।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল— তুমি রাত্রে পথে পথে ঘুরে বেড়াও, তোমার স্বামী কিছু বলে না?

কুহু বলিল—আমার স্বামী নেই।

অনেকক্ষণ কথা হইল না। পথ দীর্ঘ, উপরন্তু কুহু যেন ইচ্ছা করিয়াই মন্থর পদে হাঁটিতেছে।

এক সময় কুহু সহসা প্রশ্ন করিল—তোমার ঘরে কে কে আছে?

মা আছেন।

আর—

বজ্ৰ উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কুহু মৃদুকণ্ঠে হাসিল। বলিল— থাক। ও সব জেনে আমার লাভ কি?

অবশেষে তাহারা নগরের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছিল। রাজপ্রাসাদের সম্মুখ দিয়া যে পথ গিয়াছে। সেই পথে আসিয়া কুহু প্রাসাদ-প্রাকারের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। রুদ্ধ তোরণদ্বার পিছনে রাখিয়া আরও দক্ষিণে চলিল।

বজ্ৰ বলিল—এ কি! এ যে রাজপ্রাসাদ!

কুহু অন্ধকারে মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল—হ্যাঁ।

প্রাকারের গায়ে একটি ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার ছিল। কুহু তাহাতে মৃদু করাঘাত করিল, বজ্রকে হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—তুমি ভিতরে আসবে না?

বজ্ৰ বলিল—তুমি কে?

কুহু বলিল— আমি রাজপুরীর দাসী, অবরোধেই থাকি। আমার আলাদা ঘর আছে। একবার আসবে আমার ঘরে?

বজ্র শক্ত হইয়া বলিল—না।

ইতিমধ্যে গুপ্তদ্বার খুলিয়াছিল। কুহু বজ্রের হাত ছাড়িয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া লইল, কানে কানে বলিল—তুমি কেমন মধুনাগর? এত মিষ্টি আবার এত শক্ত!—বেশ, আজ থাক। কাল আমি আবার যাব—তুমি ঘরে থেকো।

বজ্রকে ছাড়িয়া দিয়া কুহু অন্ধকার গুপ্তদ্বার পথে নিঃশব্দে অদৃশ্য হইয়া গেল। গুপ্তদ্বার আবার বন্ধ হইল।

---

* নদীতে জলযুদ্ধ করিতে নৌ-সাধনোদ্‌যত বাঙ্গালী পটু ছিল, কালিদাসের রঘুবংশে (৪/৩৬) তাহার প্‌রমাণ আছে।

–

গুপ্তদ্বার যে রমণী ভিতর হইতে খুলিয়া দিয়াছিল সে কুহুর অনুচরী। বিপুল রাজসংসারে বহু পর্যায়ভেদ; রানীর একদল দাসী আছে, সেই দাসীদের আবার দাসী আছে, তস্য দাসী আছে। কুহু পুরী হইতে বাহির হইবার সময় নিজ অনুচরীকে গুপ্তদ্বারে বসাইয়া গিয়াছে। কখন ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই, বেশি রাত হইলে তোরণদ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। অভিসারিকার গতিবিধি অলক্ষ্যে হওয়াই বিধেয়। তাই সতর্কতা।

পুরুভূমিতে প্রবেশ করিয়া কুহু অনুচরীকে বিদায় দিল; তারপর ক্ষণেক কান পাতিয়া শুনিল। রাজপুরী নিদ্রামগ্ন, কেবল একটি ভবন হইতে মৃদঙ্গ-মঞ্জীরার অস্ফুট নিক্কণ আসিতেছে— ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি। বিনিদ্র রাজ-লম্পটের নৈশ নর্ম-বিলাস এখনও চলিতেছে।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কুহু দ্রুতপদে চলিল। বিশাল অন্তঃপুরে কক্ষের পর কক্ষ, অলিন্দের পর অলিন্দ; কোথাও বা পুরীর এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাইবার গোপন সুড়ঙ্গ। নিস্তব্ধ পুরী অন্ধকার, কদাচিৎ একটি দুটি দীপ জ্বলিতেছে। এই গোলকধাঁধায় দিবাকালেও দিগ্‌ভ্রম হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু কুহু অভ্রান্তভাবে পথ চিনিয়া উদ্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে চলিল।

একটি অন্ধকার কোণে লুক্কায়িত একশ্রেণী সোপান। কুহু সোপান বাহিয়া উপরে চলিল; দ্বিতল ছাড়াইয়া ত্রিতল, ত্রিতলের পর চতুস্তল। এই চতুস্তলে একটি বৃহৎ কক্ষ, চারিদিকে মুক্ত ছাদ। কক্ষ হইতে স্নিগ্ধ পুষ্পগন্ধ ও দীপপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। মনে হয় সমস্ত পুরীর মধ্যে এই কক্ষটি জাগিয়া আছে।

কুহু দ্বারের নিকট হইতে সন্তর্পণে উকি মারিল, তারপর ভিতরে প্রবেশ করিল।

রানী শিখরিণী পালঙ্কে জাগিয়া শুইয়া ছিলেন; দুই হাতে একটি যূথীমাল্যের ফুলগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হমতলে ছড়াইয়া দিতেছিলেন। নিদাঘ নিশীথে তাঁহার দেহে বস্ত্রাদি অধিক নাই, একটি স্বচ্ছ নীল উর্ণা তপ্তকাঞ্চন অঙ্গে অঞ্জনরেখার ন্যায় লাগিয়া আছে। এক কিঙ্করী শিথানে দাঁড়াইয়া ফুলের পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

কুহু প্রবেশ করিলে রানী সুপ্তোত্তিা বাঘিনীর ন্যায় দুই চক্ষু মেলিয়া তাহার পানে চাহিলেন। কুহু কিঙ্করীকে চোখের ইশারা করিয়া বলিল—তুই যা।

কিঙ্করী পাখা রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। রানী কুহুর পানে নির্নিমেষ চাহিয়া রহিলেন।

কুহু একটু বিকলভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল— আজও হল না।

রানী হাতের যূথীমাল্য খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কুহুর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি শয্যার উপর নত হইয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিল— কিন্তু দেখা হয়েছিল। কথা বলেছি।

রানী শয্যার উপর এক হাতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন–কি কথা বলেছিস্?

কুহু বলিল— ঠারেঠোরে যতদূর বলা যায় তা বলেছি। কিন্তু তিনি নূতন নগরে এসেছেন, রাজপুরীতে প্রবেশ করতে রাজী নয়।

তীক্ষ্ণ শিখর-দশন দিয়া রানী অধর দংশন করিলেন। মনে হইল অধর কাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িবে। ঠিক এই সময় দূর হইতে মৃদঙ্গ-মঞ্জীরার মৃদু ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিল ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি।

রানী শিখরিণীর বক্ষ বিমথিত করিয়া উত্তপ্ত নিশ্বাস বাহির হইল, সুন্দর মুখ হিংসায় ক্রোধে বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি নিজ কণ্ঠে একবার অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন—পানীয় দে।

শয্যার পাশে ভৃঙ্গারে কপিত্থ-সুরভিত শীতল পানীয় ছিল, কুহু ত্বরিতে তাহা সোনার পাত্রে ঢালিয়া রানীর হাতে দিল। রানী একবার তাহা অধরে স্পর্শ করিলেন, তারপর ক্রুদ্ধ হস্তসঞ্চালনে পাত্র চুড়িয়া ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

ভয়ে কুহুর বুক শুকাইয়া গেল। তবু সে মুখে সাহস আনিয়া রানীর কানে কানে বলিল—দেবি, আপনি অধীর হবেন না। ফুলে মধু আসতে সময় লাগে। আমি কাল আবার যাব।

উপাধানে মুখ খুঁজিয়া রানী বলিলেন—তুই দূর হয়ে যা।

কুহু বলিল—আমি যাচ্ছি, আপনি ঘুমান। আমি শয্যা-কিঙ্করীকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।

কুহু প্রস্থানোদ্যতা হইলে রানী চকিতে শয্যা হইতে মাথা তুলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি সন্দেহে প্রখর। কুহু দ্বারের কাছে পৌঁছিলে তিনি ডাকিলেন— কুহু, শুনে যা।

কুহু ফিরিয়া শয্যার পাশে আসিল। রানী মর্মভেদী চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিলেন— তুই আজ আমার ঘরে শশা।

রানীর মনের ভাব কুহু বুঝিল। সে মুখে হাসি আনিয়া বলিল— এ ঘরে শোব আমার ভাগ্যি। শয্যা-কিঙ্করীকে ডেকে দিই, সে বাতাস করুক।

শয্যা-কিঙ্করী আসিয়া রানীকে বীজন করিতে লাগিল। কুহু পঙ্খের কারুকার্যখচিত মেঝেয় শয়ন করিল। রানী থাকিয়া থাকিয়া সশব্দ উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। কুহু তাহা শুনিতে শুনিতে মনে মনে রানীকে যমালয়ে পাঠাইতে পাঠাইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাজার প্রমোদভবনে তখনও মৃদঙ্গ-মঞ্জীরা বাজিতেছে ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি।

এইখানে রাজ-অবরোধের সংস্থা সংক্ষেপে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

সক্রিয় রাজশক্তি যখন স্বধর্ম বিসর্জন দিয়া আত্মপরায়ণতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে তখন বদ্ধ জলাশয়ের মত তাহাতে বিষাক্ত কীটাণু জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত পরিমণ্ডল দূষিত করিয়া তোলে। গৌড়ের রাজপরিবারে তাহাই হইয়াছিল। ভাস্করবর্মা তেজস্বী বীরপুরুষ ছিলেন, নিজ বীর্যবলে সমস্ত দেশ করায়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাস্করবর্মার দেহান্তের পর তৎপুত্র অগ্নিবর্মা যখন রাজা হইলেন তখন তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন না, সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিলেন। যৌবনের অদম্য ভোগস্পৃহার স্রোতে রাজধর্ম বিবেকবুদ্ধি হিতবুদ্ধি সব ভাসিয়া গেল; নবীন রাজার পৌরুষ যোষিমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল। লজ্জিতা রাজলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়া তিনি অনঙ্গ পূজায় মত্ত হইলেন। অন্তঃপুর ভোগমন্দিরে পরিণত হইল।

রানী শিখরিণীকে বিবাহ করিবার পর কিছুকাল অগ্নিবর্মা রানীর রূপযৌবনের সম্মোহনে আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। কিন্তু ক্রমে নূতনত্বের মোহ অপগত হইলে রাজার মধুলুব্ধ চিত্ত উদ্যানসঞ্চারী চঞ্চরীকের ন্যায় অন্য পুষ্পে ধাবিত হইল। শিখরিণী অন্তঃপুরে পড়িয়া রহিলেন। রাজা অন্তঃপুরের মধু নিঃশেষ করিয়া প্রমোদভবনে গিয়া নূতন সভানন্দিনীদের লইয়া কেলিকুঞ্জ রচনা করিলেন।

রানী শিখরিণী অভিমানিনী রাজকন্যা, তিনি এই অবহেলা সহ্য করিবেন কেন? বিশেষত সম্ভোগতৃষ্ণা তাঁহার অন্তরেও কম ছিল না। রাজার দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়া তিনি প্রতিহিংসার ছলে আপন যৌবন-লালসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইলেন। মন যাহা চায় বিবেক তাহাতে বাধা দিল না। শুদ্ধান্তঃপুরে জার প্রবেশ করিল।

রানীর প্রধান দাসী ছিল কুহু, সে হইল দূতী। কুহু অতিশয় চতুরা, সে রানীর জন্য নাগর সংগ্রহ করিয়া আনিত। নিজেকেও বঞ্চিত করিত না, ইচ্ছামত মনের মানুষ বাছিয়া লইত।

কদাচ রানী মন্দিরে পূজা দিবার অছিলায় আন্দোলিকায় চড়িয়া পথে বাহির হইতেন; তখন কোনও সুদর্শন পুরুষ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলে তিনি কুহুকে ইঙ্গিত করিতেন। কুহু ব্যবস্থা করিত।

এইভাবে পাঁচ বছর কাটিয়াছে। একথা বেশিদিন চাপা থাকে না; নগরের রসিক সমাজে কানাঘুষা চোখ-ঠারাঠারিতে আরম্ভ হইয়া কালক্রমে প্রকাশ্য শ্লেষ-বিদ্রুপে পর্যবসিত হইয়াছে। রানী কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। রাজ-স্বৈরিণীকে শাসন করিবারও কেহ নাই। নামমাত্র আবরণের অন্তরালে লজ্জাহীন ব্যভিচার

চলিতেছিল।

বজ্রকে দেখিয়া রানীর লিপ্সা যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, কুহুও তেমনি মজিয়াছিল। ফলে দুই সহকর্মিণী গোপনে প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতা করিবার স্পর্ধা কুহুর নাই, সে অতি সূক্ষ্মভাবে নিজের খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সূক্ষ্ম খেলা খেলিতে কুহু বড় কুশলী।

কুহু ও শিখরিণী দুইজনেই সমান পাপিষ্ঠা, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি সমান নয়। রানীর প্রকৃতি বাঘিনীর ন্যায় নিষ্ঠুর ও আত্মসর্ব, আপন ক্ষুধা ব্যতীত আর কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু কুহুর প্রকৃতি অন্য রূপ; সে অজগর সাপের মত শিকারকে প্রথমে সম্মোহিত করিয়া আলিঙ্গনের পাকে পাকে জড়াইয়া ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিতে চায়।

প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও দুই নারীই সমান মারাত্মক। বোধহয় কুহু একটু অধিক মারাত্মক।

কুহু গুপ্তঘার পথে অন্তর্হিত হইলে বজ্র কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল। রাজপুরীর বিপুল ছায়াতল হইতে নির্গত হইয়া সে দেখিল পূর্বাকাশে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্র উদয় হইতেছে। আলোক অতি অস্পষ্ট হইলেও পথভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই।

ঘুমন্ত নগর, নির্জন পথ, গৃহগুলি ছায়ামূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলে মনে হয় এই নগর বাস্তব নগর নয়, কোনও মায়াবী মন্ত্রবলে এই অপ্রাকৃত দৃশ্য রচনা করিয়াছে; কোনও দিন ইহা জীবন্ত মানুষের কর্মকোলাহলে মুখরিত ছিল না, প্রভাত হইলে অলীক মায়াকুহেলির ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

বজ্রের কিন্তু এই অবাস্তব পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি ছিল না। একাকী পথ চলিতে চলিতে সে আপন মনের বিচিত্র রহস্যজালে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিমিরাবৃত রাজপুরী; তাহার অভ্যন্তরে কুটিল দুর্গম অন্তঃপুর। কুণ্ডলিত সর্প যেন আপন কুণ্ডলীর মধ্যে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে; সাপের মাথার মণি ঐ কুণ্ডলীর মধ্যে লুকানো আছে। কুহু এই অপূর্ব রহস্যলোকের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিয়াছিল, ভিতরে আহ্বান করিয়াছিল—

কুহু! একদিক হইতে কুহু যেমন বর্জকে আকর্ষণ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি বিকর্ষণও করিয়াছিল। কুহুর রূপযৌবন তাহাকে লুব্ধ করিতে পারে নাই, বরং কুহুর লোলুপ প্রগতা তাহার অন্তরে বিতৃষ্ণার সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু অপর পক্ষে কুহুর স্নেহ-তরল মর্মজ্ঞ নারী প্রকৃতিকেও সে অবহেলা করিতে পারে নাই। কুহু যত দুষ্টাই হোক তাহার প্রীতিসরস হৃদয়ের মূল্য বজ্রের কাছে অল্প নয়। কুহুকে মনের কথা বলিলে সে বুঝিবে, কুহুর সাহচর্যে তাহার প্রবাসের একাকিত্ব ঘুচিবে, মন শান্ত হইবে। কুহুকে অন্তরের দিক দিয়া তাহার প্রয়োজন।

বজ্র যখন আপন কক্ষে ফিরিল তখন রাত্রির তৃতীয় প্রহর, দীপ নিভিয়া গিয়াছে। বজ্র অন্ধকারে কলস হইতে জল ঢালিয়া পান করিল, তারপর শয্যায় শয়ন করিল।

কাল আবার কুহু আসিবে–। ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

—

কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিবার পূর্বে বজ্র সেই যা কয়েকবার জয়নাগের নাম শুনিয়াছিল, নগরে আসিয়া আর শুনিতে পায় নাই; তাহাদের গোপন তৎপরতার কোনও চিহ্নও তাহার চোখে পড়ে নাই। ষড়যন্ত্র যে ভিতরে ভিতরে ঘনীভূত হইতেছে, জয়নাগ বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে গৌড়রাজ্য করায়ত্ত করিবার কৌশল করিতেছেন বজ্র তাহার কিছুই জানি না। এমন কি শৌণ্ডিক বটেশ্বর ও কবি বিম্বাধর যে এই চক্রান্তে লিপ্ত আছে তাহাও সে সন্দেহ করে নাই।

মক্ষিকা যেমন দুষ্টব্রণের প্রতি আকৃষ্ট হয় বটেশ্বর ও বিম্বাধর তেমনি অবৈধ কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইত, তা সে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রই হোক, আর অসহায় ব্যক্তির ধনভার লাঘব করাই হোক। ইহাদের ন্যায় বিকৃতচরিত্র মানুষ কোনও দেশে কোনও কালে বিরল নয়; ইহারা সিধা পথে চলিতে পারে না, প্রকৃতির বক্রতাবশত কর্কটের ন্যায় বক্রপথে চলে এবং আপন অতি ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অন্যের মারাত্মক অনিষ্ট করিতে পরাজুখ হয় না। বজ্রের প্রতি ইহাদের আচরণ এই মনোবৃত্তির একটি দৃষ্টান্ত।

বজ্রের সোনার অঙ্গদটি দেখিয়া বিম্বাধরের লোভ হইয়াছিল। কিন্তু একাকী বজ্রের অঙ্গ হইতে অঙ্গদ অপহরণ করিবার দুঃসাহস তাহার ছিল না, তাই সে বটেশ্বরকে এই কর্মে অংশীদার লইয়াছিল। দুইজনে পরামর্শ করিয়াছিল অঙ্গটি হস্তগত হইলে ভাগাভাগি করিয়া লইবে। বজ্র নগরে আগন্তুক, তাহাকে মাদক দ্বারা হতচেতন করিয়া অঙ্গদ অপহরণ করিলে অধিক গণ্ডগোলের ভয় নাই। কিন্তু সে অতিশয় বলবান, মাদক-প্রভাব হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে যে কী কাণ্ড করিবে কিছুই বলা যায় না। ব্যাপারটা জানাজানি হইলে শৌণ্ডিকের দুর্নাম হইবে, তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই বটেশ্বর ও বিম্বার মন্ত্রণা করিয়া এমন ফন্দি বাহির করিয়াছিল যাহাতে সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙ্গিবে না।

ভাগ্যবশে বজ্রের প্রকৃত পরিচয় তাহারা জানিতে পারে নাই, জানিলে নিশ্চয় বজ্রের প্রাণসংশয় হইত। বটেশ্বর ও বিম্বাধর জয়নাগ কিম্বা অগ্নিবর্মার নিকট যদি এই সংবাদ বিক্রয় করিত, তারপর বজ্রকে একদিনও বাঁচিতে হইত না। কিন্তু বজ্রকে দেখিয়া কর্ণসুবর্ণে কেহই চিনিতে পারে নাই; তাহাকে দেখিয়া মানবদেবের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারে এমন মানুষ কর্ণসুবর্ণে অল্পই ছিল। যে দুই চারিজন প্রৌঢ় বৃদ্ধ

তাহাকে দেখিয়া মানবদেবের সহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারা উহা আকস্মিক সাদৃশ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। মানবদেবের যে পুত্ৰ থাকিতে পারে একথা কেহ ভাবিতে পারে নাই।

সে রাত্রে কুহুকে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিবার পর বজ্র বিলম্বে নিদ্রা গিয়াছিল, পরদিন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইতে বিলম্ব হইল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল সূর্যদেব দ্বারের ছিদ্রপথে কিরণের তীর নিক্ষেপ করিতেছেন।

প্রত্যহ ঊষাকালে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাওয়া বজ্রের অভ্যাস হইয়াছিল; ঘাটে ভিড় হইবার পূর্বে সে গিয়া স্নান করিত, শীতল জলে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটিত, তারপর ফিরিয়া আসিত। কিন্তু আজ দেরি হইয়া গিয়াছে। বজ্র নিকটে মৌরীর ঘাটে স্নান করিয়া আসিল।

বজ্র যখন স্নান করিয়া ফিরিল তখন বটেশ্বর মদিরাগৃহের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া একটি লোকের সহিত নিম্নস্বরে কথা কহিতেছিল। বজ্র প্রবেশ করিলে লোকটির সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। বজ্র চিনিল, রাঙামাটির মঠের সম্মুখে সারসপক্ষীর মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া যাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়াছিল সেই জয়নাগ দলের লোক। লোকটিও তাহাকে চিনিয়াছিল, কিন্তু যেন চিনিতে পারে নাই এমনি ভান করিয়া বটেশ্বরের সহিত আরও দুই একটা কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

অতঃপর সারসপক্ষী ও জয়নাগের চিন্তা বজ্রের মনে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। বটেশ্বর তাহাকে প্রাতঃকালীন জলপান আনিয়া দিল। আহার করিতে করিতে বজ্র উৎসুক মনে ভাবিতে লাগিল— আজ রাত্রে কুহু আসিবে— কুহুকে সে গুঞ্জার কথা বলিবে—হয়তো নিজের সত্য পরিচয়ও দিবে—

সেদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে বিম্বাধর আসিল। বজ্র মধ্যাহ্নের খর তাপে শয্যায় শয়ন করিয়া একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, বিম্বাধর ও বটেশ্বর এক ভাণ্ড মদিরা লইয়া তাহার কক্ষে উপস্থিত হইল। বিম্বাধর বলিল— বন্ধু, ওঠো, জাগো, জীবন মধুময় কর।

বজ্ৰ উঠিয়া বসিল—কী এ?

বিম্বাধর বলিল— সুধা সুধা। কানসোনায় এমন বস্তু আর পাবে না। দুপাত্র খেলেই উড়তে ইচ্ছে করবে।

বজ্র হাসিয়া বলিল— আমার ওড়বার ইচ্ছে নেই।

বিম্বাধর ও বটেশ্বর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। কবি বিম্বাধর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিকশিত করিয়া বলিল — ভ্রাতঃ মধুমথন, জীবন অনিত্য, সুখস্বপ্নের ন্যায় ভঙ্গুর; তাকে বুভুক্ষুপিপাসিত করে রেখ না। এস, যৌবনের যজ্ঞাগ্নিতে সোমরসের আহুতি দাও— স্বাহা স্বাহা বলিয়া নিজে একপাত্র ঢালিয়া এক চুমুকে পান করিয়া ফেলিল।

বজ্ৰ তথাপি ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া বিম্বাধর গভীর ভৎসনার কণ্ঠে বলিল— ছি বন্ধু, তুমি একজন দিগ্বিজয়ী পিণ্ডবীর, একা ময়রার দোকান উজাড় করে দিতে পার, তুমি এই ক্ষুদ্র সুধাভাণ্ড দেখে ভয় পাচ্ছ!—

কোথায় তোমার দেশ? সে দেশে কি কেউ খেজুরের রস খায় না? তোমরা কি মৎস্য, কেবল জল খেয়ে বেঁচে থাক?

এইভাবে ধিকৃত হইয়া বজ্র একপাত্র ঢালিয়া পান করিল। মদিরা অতি সুস্বাদু, পাত্র শেষ করিয়া বজ্র বটেশ্বরকে বলিল— তুমি খাবে না?

বটেশ্বর জিভ কাটিল। বিম্বাধর বলিল— ময়রা কি মোদক খায়? স্বজাতি ভক্ষণ হবে যে! এস, আর একপাত্র।

উভয়ে আর একপাত্র ঢালিয়া একসঙ্গে পান করিল। বজ্র বলিল—কৈ, ওড়ার ইচ্ছা হচ্ছে না তো?

হবে হবে। বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি উই পোকার পাখনা গজায়? এস, আর একপাত্র হোক।

আর একপাত্র হইল। এই সময় বটেশ্বরের ভৃত্য কিছু ভর্জিত মৎস্যাণ্ড আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া গেল। অবদংশ সহযোগে মদিরা আরও মুখরোচক হইয়া উঠিল।

বিম্বাধর তখন নানা কৌতুকোদ্দীপক কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। সে পঠদ্দশায় বিদ্যালাভের ব্যপদেশে কাশ্মীর গিয়াছিল; তথাকার যুবতীরা কিরূপ তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও অতিথিবৎসলা তাহারই সরস কাহিনী শুনাইতে লাগিল। কাহিনীগুলি পবিত্র নয়, কিন্তু প্রচুর হাস্যরসের সিঞ্চনে কিঞ্চিৎ শোধিত হইয়াছে।

এইভাবে সুধাভাণ্ডটি দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া আসিল। বজ্র বেশ একটি লঘু উৎফুল্লতা অনুভব করিতেছে, প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে, কিন্তু নেশার ঘোরে অচিরাৎ ভূমিশয্যা গ্রহণ করিবার কোনও লক্ষণই তাহার নাই। বরং কবি বিম্বাধরের চক্ষু ঢুলুঢুলু হইয়া আসিয়াছে, কথা জড়াইয়া যাইতেছে। বটেশ্বর পাশে বসিয়া সব লক্ষ্য করিতেছিল, ব্যাপার দেখিয়া সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এইভাবে আরও কিছুক্ষণ চলিলে বিম্বাধরই মাটি লইবে, বজ্রের কিছু হইবে না। বটেশ্বরের দৃঢ় ধারণা জন্মিল বজ্র পাকা মদ্যপ, এতদিন ছলনা করিতেছিল।

এইখানে, বিম্বাধর ও বটেশ্বর যে ফন্দি আঁটিয়াছিল তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক। সাপও মারিবে লাঠিও ভাঙ্গিবে না, এই মহাবাক্য ছিল তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র। বজ্রের অঙ্গদ চুরি করিতে হইবে। কিন্তু তারপর আত্মরক্ষার উপায় কি? এক, বজ্রকে বিষ প্রয়োগ করা; মরা মানুষ গণ্ডগোল করে না। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না, মৃতদেহ লইয়া নূতন সমস্যার উদয় হয়। মদিরাগৃহে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইলে শৌণ্ডিকের বধ-বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। মৃতদেহ চুপি চুপি স্থানান্তরিত করা বটেশ্বর ও বিম্বাধরের কর্ম নয়, আরও লোক চাই। তাহাতে জানাজানি হইবে, মন্ত্রগুপ্তি থাকিবে না।

বটেশ্বর ও বিম্বাধর বড় চিন্তায় পড়িয়াছে এমন সময় পানশালায় এক শ্রেষ্ঠী আসিল। শ্রেষ্ঠীর নাম ভূরিবসু। সে ধনবান ব্যক্তি, এরূপ সাধারণ মদিরাগৃহে কখনও পদার্পণ করে না; নিতান্তই দায়ে পড়িয়া আসিয়াছে। বিম্বাধর তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

ভূরিবসুর কয়েকখানি বাণিজ্য-তরী আছে। তাহারা সমুদ্রে যাইবে, তাহাদের আরব জলদস্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য জলযোদ্ধার প্রয়োজন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও ভূরিবসু জলসৈন্য সংগ্রহ

করিতে পারে নাই, প্রচুর বেতনের লোভেও কেহ যাইতে চায় না।

সিধা পথে বিফল হইয়া ভূরিবসু বাঁকা পথ ধরিয়াছে। নগরের পানশালায় নানা জাতীয় লোকের যাতায়াত; মদ্যপান করিয়া কেহ কেহ পানশালাতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে। অবৈধ উপায়ে লোক সংগ্রহের এমন স্থান আর নাই। ভূরিবসু আসিয়া বটেশ্বরের নিকট প্রস্তাব করিল— তুমি আমার নৌকায় জীবন্ত মানুষ পৌছাইয়া দাও, প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এক নিষ্ক পুরস্কার দিব। কানা খোঁড়া বিকলাঙ্গ লইব না। প্রয়োজন হইলে আমার নাবিকেরা তোমাকে সাহায্য করিবে।

বটেশ্বর দেখিল, এই সুযোগ। বজ্রের অঙ্গদটিও হস্তগত হইবে, উপরন্তু এক নিষ্ক পুরস্কার। পরামর্শে স্থির হইল, ভূরিবসুর বহিত্র যেদিন সমুদ্রে যাইবে তাহার পূর্বদিন অপরাহ্ণে বজ্রকে সুরাপান করাইয়া অজ্ঞান করিবার চেষ্টা করা হইবে; সে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে গভীর রাত্রে নাবিকদের সাহায্যে বটেশ্বর তাহাকে ভূরিবসুর তরণীতে আনিবে। কিন্তু বজ্র সুরাপান করিতে সম্মত না হইতে পারে। তখন তাহাকে ছলছুতায় ভুলাইয়া তরণীতে লইয়া যাইতে হইবে। একবার তরণীতে পদার্পণ করিলে তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া খোলের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা সহজ হইবে। পরদিন প্রাতে তরণী সমুদ্রযাত্ৰা করিবে, দুই দিন পরে অকূল সমুদ্রে পৌঁছিবে। তখন বজ্রকে ছাড়িয়া দিলেও ক্ষতি নাই, সে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না; তখন প্রাণের দায়ে তাহাকে জলদস্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে।

এই উপায়ে অন্যান্য পানশালা হইতে আরও কয়েকজন হতভাগ্যকে বহিত্রে লইয়া গিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাল প্রত্যুষে বহিত্র সমুদ্রযাত্রা করিবে। সুতরাং আজই বজ্রকে হরণ করা চাই।

কিন্তু সুরা ভাণ্ড শেষ; বজ্ৰ অটল হইয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে অট্টহাস্য করিতেছে। যেন তাহাদের ব্যর্থ চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিতেছে। বটেশ্বর প্রমাদ গণিল।

বিম্বাধর তখন মেঘদূত আবৃত্তি করিতেছে—বিদ্যুৎবন্তং বনিত ললিতা ললিত বনিতা—

বটেশ্বর বাধা দিয়া বলিল— ভাই বিম্বাধর, আমাকে এবার উঠতে হবে। হাতিঘাটে কাজ আছে।

হাতিঘাটে শব্দটা বটেশ্বর এমন তীক্ষ্ণভাবে উচ্চারণ করিল যে বিম্বাধরের কানে বিঁধিল। সে সচকিত হইয়া বজ্রকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল, বলিল— আরে তাই তো, বেলা যে পড়ে এসেছে। চল, আমাকেও হাতিঘাটে যেতে হবে। তা বন্ধু মধুমথন, তুমি একা থাকবে? তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে, আমোদ করা যাবে।

বজ্র প্রত্যহ সন্ধ্যায় হাতিঘাটে গিয়া থাকে, আজ না যাইবার কোনও কারণ নাই। একবার মনে হইল, রাত্রে কুহু আসিবে। কিন্তু কুহু আসিবে অনেক রাত্রে, তাহার জন্য এখন হইতে ঘরে বসিয়া থাকার প্রয়োজন নাই। সে উঠিয়া বলিল— চল।

হাতিঘাটে বিপুল জনসম্বাধ; রথ-দোলের ভিড়। আগের দিন ঝড় বৃষ্টিতে কেহ আসিতে পারে নাই, আজ তাই ভিড় বেশি। বহু নাগরিক ছোট-ছোট ডিঙিতে চড়িয়া নদীবক্ষে জলবিহার করিতেছে। ধীবরেরা জেলেডিঙিতে ইল্লীশ মৎস্য ধরিতেছে। সমুদ্রগামী বহিত্রগুলিতেও জনসমাগম হইয়াছে; যে বহিত্রগুলি কল্য প্রত্যুষে যাত্রা করিবে তাহারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মাল-বোঝাই নৌকা ঘাট হইতে গিয়া বহিত্রের গায়ে

ভিড়িতেছে, নৌকা হইতে বহিত্রে মাল উঠিতেছে, শূন্য নৌকা ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া আবার মাল লইতেছে।

বজ, বিম্বাধর ও বটেশ্বর ভিড়ের মধ্যে না গিয়া ঘাটের এক কিনারায় উপস্থিত হইল। এখানে কয়েকটি ডিঙি রহিয়াছে, ডিঙিতে মাল বোঝাই হইতেছে। একজন সম্রান্তদর্শন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কর্ম পরিদর্শন করিতেছে। বিম্বাধর তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল—এই যে শ্রেষ্ঠী মহাশয়, কুশল তো? চোখে চোখে ইঙ্গিত খেলিয়া গেল।

শ্রেষ্ঠী ভূরিবসুকে বজ্র গত রাত্রে বটেশ্বর ও বিম্বাধরের সহিত মদিরাগৃহের অন্ধকার কোণে মন্ত্রণা করিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু এখন চিনিতে পারিল না। শ্রেষ্ঠী বলিল—আপনাদের কুশল তো?

বিম্বাধর বলিল—এ পর্যন্ত কুশল। নগরে এক নূতন বন্ধু এসেছেন, তাঁকে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছি।

ভূরিবসু সহাস্যমুখে বজ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—ভাল ভাল। তা চলুন না নদীবক্ষে বিচরণ করবেন। আমার ডিঙি রয়েছে।

বিম্বাধর বজ্রকে বলিল—কি বল বন্ধু? গঙ্গাবক্ষ থেকে ঘাটের দৃশ্য তুমি বোধহয় দেখনি। অপূর্ব দৃশ্য। দেখবে?

বজ্রের কোনই আপত্তি নাই। চারিজনে একটি শূন্য ডিঙিতে চড়িয়া বসিল, মাঝি-কাণ্ডারী ডিঙি ছাড়িয়া দিল।

গঙ্গার বুক আবার ভরিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, স্বচ্ছ জল ঘোলা হইয়াছে। তরঙ্গগুলি বড় বড়, তাহাদের উত্থান পতনের একটা ছন্দ আছে। সেই ছন্দে নাচিতে নাচিতে ডিঙি গঙ্গার বুকে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

নদী হইতে ঘাটের দৃশ্য সত্যই মনোরম। তার উপর মন্দ মন্দ বাতাস দিতেছে; অন্য ডিঙিগুলি আশেপাশে ঘুরিতেছে। নাগরিকদের ডিঙি হইতে উচ্চ হাস্যের কাকলি, সঙ্গীতের মূর্ছনা ভাসিয়া আসিতেছে। বজ্র মনের মধ্যে মোহমদির আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

বিম্বাধর বজ্রের কানের কাছে বিড় বিড় করিয়া কিছু বলিতেছে, বজ্র কতক শুনিতেছে কতক শুনিতেছে না। বটেশ্বর জেলেডিঙি হইতে কয়েকটি সডিম্ব ইল্লীশ মৎস ক্রয় করিল; মাছগুলি ডিঙির খোলের মধ্যে রাজপুত্রের মত শুইয়া আছে। সবই যেন একটা সুখস্বপ্নের ছিন্নাংশ, আনন্দদায়ক কিন্তু অর্থহীন।

সূর্য নগরীর পরপারে অস্ত গেল, নিদাঘের দ্রুত সন্ধ্যা যেন ধূমল পাখা মেলিয়া ছুটিয়া আসিল। ঘাটের জনমর্দ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, নদীবক্ষের তরণীগুলিও ঘাটে ফিরিল। নগরীর মন্দিরগুলি হইতে দূরাগত মৃদুম্বনে সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

ষড়যন্ত্রকারীরা এই ছায়াম্লান গোধূলি লগ্নের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। ভূরিবসুর সঙ্কেত পাইয়া কাণ্ডারী পুঞ্জীভূত বহিত্রগুলির দিকে ডিঙির মুখ ফিরাইল। সেখানেও নাবিকদের কর্মতৎপরতা শান্ত হইয়াছে।

ডিঙি আসিয়া একটি হাঙ্গরমুখ বহিত্রের পাশে ভিড়িল।

ডিঙি হইতে বহিত্রের পট্টপত্তন খানিকটা উচ্চ। প্রথমে ভূরিবসু বহিত্রে উঠিল। কয়েকজন নাবিক গুণবৃক্ষ ঘিরিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের হস্তসঙ্কেতে কাছে ডাকিয়া নিম্নস্বরে উপদেশ দিল, তারপর ডিঙির দিকে গলা বাড়াইয়া বলিল— কি বন্ধু, তোমরাও বুহিত্তে উঠবে না কি? এস না, আমার মণিভাণ্ডারে উৎকৃষ্ট আসব আছে, আস্বাদ করে যাও।

ডিঙি হইতে বিম্বাধর সোৎসাহে বলিল— নিশ্চয় নিশ্চয়। কি বল মধুমথন?

মধুমথন মুণ্ডটি আন্দোলিত করিয়া হাস্যবিম্বিত মুখে বলিল— নিশ্চয়।

তিনজনে একে একে বহিত্রে উঠিল। ডিঙির কাণ্ডারী বহিত্রের গলবাহিকায় ডিঙি বাঁধিয়া ফেলিল।

তারপর চক্ষের পলকে নানাবিধ ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। একজন নাবিক পিছন হইতে বজ্রের গলায় দড়ি জড়াইয়া টান দিল। অতর্কিত আকর্ষণে বজ্র চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল, তাহার মাথা পাটাতনের কাঠের উপর সজোরে ঠুকিয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য সে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিল।

অতঃপর যখন সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল তখন তাহার মন হইতে মাদকজনিত স্বপ্নাচ্ছন্নতা দূর হইয়াছে। সে অনুভব করিল একজন লোক তাহার মস্তকের উপর বসিয়া তাহার বাহু হইতে অঙ্গদ খুলিয়া লইবার জন্য টানাটানি করিতেছে এবং আরও কয়েকজন তাহার হাত-পা দড়ি দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

মস্তকের উপর বসিয়া যিনি অঙ্গদ উন্মোচনের চেষ্টা করিতেছিলেন তিনি কবি বিম্বাধর। বজ্র বাহুর এক প্রবল আস্ফালনে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু নাবিকেরা প্রস্তুত ছিল, একসঙ্গে তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া আবার তাহাকে ধরাশায়ী করিল। বিম্বাধর দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল, সেইখান হইতে অশ্রাব্য গালিগালাজ বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার একটা আঙ্গুল ভাঙিয়া গিয়াছিল, মস্তকও অক্ষত ছিল না।

বহিত্রের উপর এ এক বিচিত্র দৃশ্য। সন্ধ্যার ছায়া রাত্রির অন্ধকারে পর্যবসিত হইতেছে, সেই ঘনায়মান প্রদোষে পট্টপত্তনের উপর যেন এক পাল তরক্ষুর সহিত এক বন্য বৃষের যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। বহুহস্তপদবিশিষ্ট একটা জীবন্ত মাংসপিণ্ড উঠিতেছে পড়িতেছে, গড়াইয়া এদিক ওদিক যাইতেছে। কিন্তু শব্দ অধিক হইতেছে না। কেবল বজ্রের অবরুদ্ধ গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে কবি বিম্বাধরের কাঁচা খেউড় শুনা যাইতেছে।

এতগুলা লোকের সঙ্গে একা যুদ্ধ করিতে করিতে বজ্রের দেহের শক্তিও ক্রমশ বাড়িতেছে; যে-সুরা তাহার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাই যেন মত্তহস্তীর বল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। নাবিকেরা একে একে তাহার পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাতের স্বাদ পাইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া ভূরিবসু ও বটেশ্বর সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

তারপর বজ্র প্রবল বেগে নিজ দেহ আবর্তিত করিয়া অবশিষ্ট নাবিকদের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইল, হিংস্র প্রজ্বলিত চক্ষে একবার চারিদিকে চাহিল। কিন্তু নিকটে কেহ নাই, বিম্বাধর জানুসাহায্যে পলায়ন

করিয়াছে। বজ্রের কণ্ঠ হইতে একটা উন্মত্ত হর্ষধ্বনি বাহির হইল। সে বহিত্রের কিনারায় গিয়া অন্ধকার জলে লাফাইয়া পড়িল।

সকলে ছুটিয়া গিয়া বহিত্রের কিনারায় দাঁড়াইল। কিন্তু বর্জকে আর দেখিতে পাইল না।

বিম্বাধর তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—যাঃ, অঙ্গদটা গেল। বেনের পো, এমন লড়াক এনে দিলাম, ধরে রাখতে পারলে না?

ক্রুদ্ধ ভূরিবসু বলিল— আমি মানুষ চেয়েছিলাম, দৈত্য চাইনি।

বিম্বাধর বলিল—তুমি একটা মানুষ চেয়েছিলে, আমি দশটা মানুষ দিয়েছিলাম। এখন আমাদের পুরস্কার! কথা ছিল বুহিত্তে পৌঁছে দিলেই

ভূরিবসু কুটিল ভঙ্গিতে দন্ত বাহির করিয়া বলিল— পুরস্কার নেবে বটে?

পুরস্কার! বটেশ্বর ধূর্ত লোক, সে দেখিল এ সময় শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বিবাদ করিলে বিপদ আছে। সে। তাড়াতাড়ি বলিল—না না, পুরস্কার কিসের? চল বিম্বাধর, আমরা ফিরে যাই—

ভূরিবসু অট্টহাস্য করিয়া বলিল— ফিরে যাবে! এই যে ফেরাচ্ছি। ওরে, এ দুটোকে ধর, খোলের মধ্যে বেঁধে রাখ। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। ওদেরই নিয়ে যাব।

বিম্বাধর আর্তনাদ করিয়া উঠিল; বটেশ্বর জলে লাফাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু তৎপূর্বেই নাবিকের দল তাহাদের ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং দড়ি ধরিয়া খোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল।

বিম্বাধর বধ্যভূমিতে নীয়মান শূকরের ন্যায় চিৎকার করিতে লাগিল— আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাব না—আমি লড়াই করতে পারব না—

তাহারা আপন কুটিলতার ফাঁদে আপনি ধরা পড়িয়াছে।

–

জলে লাফাইয়া পড়িয়া বজ্র ডুবিয়া গেল। তারপর অনেক দূর পর্যন্ত ডুব সাঁতার কাটিয়া সে মাথা ঝাড়া দিয়া ভাসিয়া উঠিল। চারিদিক অন্ধকার, তীর দেখা যায় না; কেবল গঙ্গার খরস্রোত দুর্বার বেগে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

বজ্রের দেহে সামান্য দুই চারিটা আঁচড় লাগিয়াছিল, মাথার আঘাতও গুরুতর নয়। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা বাক্যাতীত বিস্ময় জাগিয়া ছিল। কী হইল? উহারা কি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল? কিন্তু কেন? অঙ্গদের জন্য?

বজ্ৰ হাত দিয়া অনুভব করিয়া দেখিল— অঙ্গদ যথাস্থানে আছে, উহারা কাড়িয়া লইতে পারে নাই।

গঙ্গার বুকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। পশ্চাতে তাহাকে ধরিবার জন্য ডিঙা আসিতেছে না, আসিলে দাঁড়ের শব্দ শুনা যাইত। বজ্ৰ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, পিছন দিকে নগরের দুই চারিটা মিটিমিটি আলো দূর হইতে ক্রমশ আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে।

বজ্র আর সাঁতার কাটিতেছিল না, কেবল জলের উপর গা ভাসাইয়া ছিল। তাহার মনে হইল স্রোতের টান আরও বাড়িতেছে; অজ্ঞাতসারে স্রোতের আকর্ষণ তাহাকে নদীর মাঝখানে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এভাবে ভাসিয়া চলিলে সে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। হয়তো সুন্দরবনে গিয়া পৌঁছিবে, হয়তো সমুদ্রে গিয়া পড়িবে— সমুদ্র কতদূরে তাহা সে জানিত না।

বজ্র আবার সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল, ডান দিকের তীর লক্ষ্য করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। তীর কিন্তু অদৃশ্য, এমন কি তীরাহত জলের কলধ্বনি পর্যন্ত শুনা যায় না।

এইভাবে অন্ধের মত অনেকক্ষণ সাঁতার কাটিবার পর স্রোতের বেগ ঈষৎ মন্দীভূত হইল। বজ্ৰ বুঝিল — সে স্রোত কাটাইয়া তির্যকভাবে তীরের দিকে আসিতেছে। তারপরই অকস্মাৎ সে এক নূতন কল্লোলধ্বনি

শুনিতে পাইল; তাহার চারিদিকে উতরোল তরঙ্গ সংঘাত যেন তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। বজ্র ভাল সাঁতার জানে, দেহে শক্তিও অসীম; সে তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মাথা জাগাইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ আবার স্রোতের মত্ততা শান্ত হইয়া গেল। বজ্রের চিন্তা করিবার সামর্থ্য ছিল না, থাকিলে বুঝিতে পারিত সে গঙ্গা ও ময়ূরাক্ষীর সঙ্গমস্থল পার হইয়া আসিয়াছে।

আরও কিছুক্ষণ বজ্র নিস্তরঙ্গ জলে ভাসিয়া চলিল। তারপর সহসা একটি আলোকের বিন্দু তাহার চোখে পড়িল। ডান দিকে, কিছু সম্মুখে আলোকবিন্দুটি যেন ঊর্ধ্ব হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। বজ্র আর চিন্তা করিল না, শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ঐ রক্তাভ বিন্দুটির দিকে সাঁতার কাটিয়া চলিল।

ক্রমে সেই ক্ষীণ দীপালোকে তীরের একটি অংশ তাহার চোখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রশস্ত ঘাট নয়, শীর্ণ একশ্রেণী সোপান উচ্চ পাড় হইতে জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। একটি কিশোরী মেয়ে প্রদীপ হস্তে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে।

মেয়েটির বয়স দশ-এগারো বছর; গায়ের রঙ কোমল কালো। মুখে কৌতুক আগ্রহ ভীরুতা মেশা একটি ভাব। সে একাকিনী ঘাটে আসিয়াছে, জলে প্রদীপ ভাসাইয়া নিজের সৌভাগ্য গণনা করিবে।

মেয়েটি নিম্নতম পৈঠায় আসিয়া বসিল, প্রদীপ পাশে রাখিল, আঙ্গুল জলে ডুবাইয়া মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিল। তারপর সহসা জলে আলোড়নের শব্দ শুনিয়া ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বানিঃসরণের ক্ষমতা রহিল না, হস্তপদ সঞ্চালনের শক্তিও রহিত হইল।

প্রথমে একটা সাদা মানুষের মুখ, তারপর একটা প্রকাণ্ড শরীর আসিয়া ঘাটে ঠেকিল। বজ্র জলে নিমজ্জিত পৈঠার উপর উঠিয়া বসিল। মেয়েটি অনড় অভিভূত হইয়া চাহিয়া রহিল।

বজ্র তাহার অবস্থা বুঝিয়াছিল, সে দ্রুত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল— ভয় পেও না।

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কিশোরীর মনের অসাড় ভাব বোধহয় একটু কাটিল। তাহার ঠোঁট দুটি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

বজ্ৰ বলিল—হাতিঘাটে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, ভাসতে ভাসতে এসেছি।

এবার কিশোরীর সাহস আর একটু বাড়িল, সে অধরের স্ফুরণ সংযত করিয়া কৌতূহলী চক্ষে বজ্রকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বজ্রের প্রগণ্ডে অঙ্গদটি তাহার চোখে পড়িল। অঙ্গদের বস্ত্রাবরণ সাঁতার কাটিবার সময় খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিশোরী মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—এখান থেকে কানসোনায় ফিরে যাবার পথ আছে?

কিশোরী মাথা নাড়িল—না।

পথ নেই!

কিশোরী বলিল— ময়ূরাক্ষী পার হয়ে কানসোনায় যেতে হয়। এখন খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

বজ্র চিন্তা করিল। কানসোনায় ফিরিয়া গিয়াই বা লাভ কি?–কুহু আসিবে, আসিয়া ফিরিয়া যাইবে। তা যাক।

এখানে কাছাকাছি বসতি আছে? তুমি এখানে থাকো?

হাঁ।

তোমার ঘরে কে কে আছে?

শুধু আমি আর আয়ি বুড়ি। আর কেউ না।

পুরুষ নেই?

না।

তোমাদের চলে কি করে?

কানসোনায় শাক-পাতা কলা-মূলো বিক্রি করি।

আমাকে আজ রাত্রে তোমাদের ঘরে থাকতে দেবে? কাল সকালেই আমি চলে যাব।

আমি জানি না, আয়ি বুড়ি জানে।

বেশ, আমাকে আয়ি বুড়ির কাছে নিয়ে চল।

আচ্ছা।

কিশোরী এতক্ষণ কথা কহিতে কহিতে অঙ্গটি ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিল, এখন আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল—তামার তাগা কি সোনার?

বজ্র ঈষৎ হাসিয়া বলিল—হাঁ।

কিশোরীর মুখে বিস্ময়ের সঙ্গে একটা ভক্তিভাব ফুটিয়া উঠিল। সে সসম্ভ্রমে বজ্রের মুখের পানে চাহিল; তারপর প্রদীপ তুলিয়া লইয়া বলিল—এস।

তাহার মনের সমস্ত ভয় শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে পরিণত হইয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া কিশোরী একদিকে চলিল; বজ্র সিক্ত বস্ত্রে তাহার পশ্চাতে চলিল। যাইতে যাইতে সে ভাবিতে লাগিল, আজ রাত্রিরটা কোনও ক্রমে কাটাইয়া কালই সে গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। কর্ণসুবর্ণে আর নয় যথেষ্ট হইয়াছে। নাগরিক জীবন তাহার জন্য নয়, সে বেতসগ্রামে ফিরিয়া যাইবে। মার কাছে, গুঞ্জার কাছে ফিরিয়া যাইবে।

আশ্চর্য এই যে বিম্বার বা বটেশ্বরের প্রতি সে বিশেষ ক্রোধ অনুভব করিল না। প্রথমে নাবিকগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহার মনে যেরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তখন বিম্বাধর বা বটেশ্বরকে হাতের কাছে পাইলে বোধকরি দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিত। কিন্তু এখন তাহার মনে সামান্য তিক্ততা ভিন্ন আর কিছু নাই। সর্প দংশন করে, বাঘ-ভালুক উদরের দায়ে জীবহিংসা করে; ইহা তাহাদের স্বভাব। ক্ৰোধ করিয়া লাভ কি? তাহাদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিলেই হইল।

অল্প কিছুদূর চলিবার পর কিশোরী বজ্রকে লইয়া একটি কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মাটির কুটির, খড়ের চাল। আশেপাশে আরও কয়েকটি কুটির রহিয়াছে তাহা আবছায়াভাবে অনুমান করা যায়।

দ্বারের পাশে প্রদীপ রাখিয়া কিশোরী বলিল— তুমি বোসো, আমি আয়িকে ডাছি।

বজ্র ভিজা কাপড়ে দাওয়ার নীচে দাঁড়াইয়া রহিল, কিশোরী ভিতরে গেল। পরক্ষণেই এক বৃদ্ধার স্বর শুনা গেল—ওলো গঙ্গা, তুই এলি। কোথায় গিছলি বল্ দেখি!

তারপর কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথা হইল। বুড়ি বাহিরে আসিল। বজ্রকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—ওমা, এ যে সোনার কার্তিক! এস বাছা, এস। হাতিঘাটে জলে পড়ে গিছলে! খুব বেঁচে গেছ বাছা, ভগবান রক্ষে করেছেন। তা আজ রাত্তিরটা আমার দাওয়ায় থাকো, কাঙ্গালের শাক-ভাত খাও। ওরে গঙ্গা, শুকনো কাপড় এনে দে, পাটি পেতে দে।

গঙ্গা শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিল, দাওয়ায় পাটি পাতিয়া দিল। বজ্র বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া পাটিতে লম্বা হইল; ক্লান্তির সহিত একটি পরম নিশ্চিন্ত তাহার দেহমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অল্পকাল মধ্যে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

দণ্ড দুই তিন পরে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন গঙ্গা তাহার পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে বলিতেছে— ওঠো, ভাত হয়েছে, খাবে চল।

বজ্র ঘুমভরা চোখে উঠিয়া গিয়া খাইতে বসিল। কুটিরের একটিমাত্র ঘরে পিঁড়ি পাতিয়া আসন করা হইয়াছে; সম্মুখে কলাপাতায় স্তূপীকৃত ভাত। গরম ভাতে ঘিয়ের ছিটা; ব্যঞ্জনের মধ্যে ও-বেলার শাকচচ্চড়ি, কচু-ডাঁটার ঘণ্ট, সরিষাবাটা দিয়া ইল্লিশ মাছের ঝাল ও কাসুন্দী। খাইতে খাইতে বজ্রের বেতসগ্রাম ও মায়ের রান্না মনে পড়িয়া গেল।

আয়ি বুড়ি একটু বেশি কথা বলে, সে নানা অসংলগ্ন কথা বলিয়া চলিল। তারপর বজ্রের আহার শেষ

হইয়া আসিয়াছে তখন সে বলিল— ঘরে অতিথ আসা তো গেরস্তর ভাগ্যি। তা বাছা, আমার এমন পোড়া কপাল, ঘরে কি ভাল বিছানা আছে! তুমি বড় ঘরের ছেলে, খাট-পালঙ্কে শোয়া অভ্যেস, তুমি কি আমার কাঁথা কানিতে শুয়ে ঘুমতে পারবে?

বজ্ৰ বলিল—খুব পারব আয়ি। আমি তোমাদেরই মত গাঁয়ের মানুষ। আমার কোন কষ্ট হবে না।

বুড়ি বলিল— তা বললে শুনব কেন বাছা। তোমার যে সোনার অঙ্গ। আহা, গায়ের রঙ যেন মমলে বাঁধা খাঁড়ি মসূর! তাই ভাবছিলাম কি, কোদণ্ড ঠাকুরকে গিয়ে বলি, তিনিই না হয়। আজ রাত্তিরটা তোমায় ঘরে ঠাঁই দিন।

বজ্ৰ চমকিয়া মুখ তুলিল—কোদণ্ড ঠাকুর! তিনি কে?

বুড়ি বলিল—বামুন গো। আগে মস্ত লোক ছিলেন, এখন অবস্থা পড়ে গেছে তাই আমাদের মত চাষী-মালীদের মধ্যে আছেন। তাঁকেই বলি গিয়ে, তিনি একলা মানুষ, তোমাকে ঘরে থাকতে দিতে পারবেন। আমার এখানে তো দাওয়ায় পড়ে থাকতে হবে।

বজ্ৰ ভাবিতে লাগিল, ইনি কি সেই কোদণ্ড মিশ্র যাঁহার কথা শীলভদ্র বলিয়াছিলেন? তাহার পিতামহ শশাঙ্কদেবের সচিব…কাল প্রাতে বজ্র গ্রামে ফিরিয়া যাইবে, তৎপূর্বে পিতামহের সচিবকে একবার দেখিয়া যাইবে না?

আহার সমাধা করিয়া বলিল—বেশ, তিনি যদি আমাকে থাকতে দেন, তাঁর ঘরেই থাকব।

–

আয়ি বুড়ির কুটিরের কয়েক ঘর অন্তরে কোদণ্ড মিশ্রের গৃহ। ইহাও মাটির কুটির, খড়ের ছাউনি। গত বিশ বৎসর কোদণ্ড মিশ্র এই কুটিরে বাস করিতেছেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নাই।

কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। বদ্ধ দ্বারের অন্তরালে দুইজন বসিয়া মন্ত্রণা করিতেছেন; একজন স্বয়ং কোদণ্ড মিশ্র, অন্য ব্যক্তির নাম কোকবর্মা।

কোদণ্ড মিশ্রের সামান্য পরিচয় পূর্বে পাওয়া গিয়াছে। তিনি শশাঙ্কদেবের একজন মন্ত্রী ছিলেন। শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর মানবদেবের হ্রস্ব রাজত্বকালে মন্ত্রীদের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল, কোদণ্ড মিশ্র তাহাতে জয়ী হইতে পারেন নাই; কুটিলতার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি রাজসভা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এই নিভৃত দীন পল্লীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন।

তারপর ভাস্করবর্মা আসিয়া রাজ্য গ্রাস করিলেন; বিজয়ী মন্ত্রীরা নূতন রাজার কোপানলে ভস্মীভূত হইলেন। কেবল কোদণ্ড মিশ্র বাঁচিয়া গেলেন; ভাস্করবর্মা অবজ্ঞাভরে এই স্বয়ং নির্বাসিত মন্ত্রীকে গ্রাহ্য করিলেন না।

তদবধি বিশ বৎসর ধরিয়া কোদণ্ড মিশ্র নূতন রাজবংশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। চাণক্য যেমন নন্দ বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি বর্ম বংশ শেষ না করিয়া ছাড়িবেন না। ভাস্করবর্মার রাজ্যকালে তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই; কিন্তু এখন অগ্নিবর্মাকে পাইয়া আশা হইয়াছে শীঘ্রই তাঁহার চক্রান্ত ফলবান হইবে। সমস্তই প্রস্তুত, কেবল একটি বাধা; অগ্নিবর্মার পরিবর্তে সিংহাসনে বসিতে পারে এমন যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইতেছে না।

কোদণ্ড মিশ্রের বয়স এখন সত্তর। অস্থিচর্মসার ব্রাহ্মণ; তাঁহার জীবনে আর কোনও কাম্য নাই, স্বনির্বাচিত রাজাকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইয়া নিজে মন্ত্রিত্ব করিবেন এই সংকল্প লইয়া বাঁচিয়া আছেন।

আজ রাতে্র কোদণ্ড মিশ্র যাহার সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন সেই কোকবর্মা তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। কোকবর্মার বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু আকৃতি দেখিয়া

অধিক বয়স মনে হয়। মাংসল দেহ, কদাকার মুখে মসূরিকার চিহ্ন, চক্ষু দুটি কুঁচের মত রক্তবর্ণ। তাহার মুখ দেখিয়া ভেকের মুখ মনে পড়িয়া যায়।

কোকবর্মা গৌড়রাজে্যর একজন সেনাপতি। সে জাতিতে উগ্র, বর্ধমানভুক্তির এক মালিক। উগ্রগণ তৎকালে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন, বাহুবল ও যুদ্ধে পরাক্রমের জন্য তাঁহাদের খ্যাতি ছিল। কোকবর্মা এই উগ্রগণের পরম্পরাগত অধিনায়ক। অগ্নিবর্মার যৌবরাজ্যকালে সে তাঁহার বয়স্য ছিল, গুপ্তব্যসনে সহযোগিতা করিত। তারপর অগ্নিবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার কৃপায় এবং উগ্রগণের অধিনায়কত্ব হেতু সেনাপতি পদ লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু সেনাপতির গুরু দায়িত্বের প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র নিষ্ঠা ছিল না। সে ঘোর নীচকমা ও বিবেকহীন পাষণ্ড। চাটুবৃত্তি যেমন তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল তেমনি প্রয়োজন হইলে কৃতঘ্নতা

করিতেও সে পশ্চাৎপদ ছিল না।

রানী শিখরিণীকে যেদিন সে প্রথম দেখিল সেদিন তাহার অন্তরে কদর্য লালসা উদি্ৰক্ত হইয়াছিল। সেইদিন হইতে সে মনে মনে রাজার শত্রু হইয়াছিল।–রানী শিখরিণী তখন গুপ্ত প্রণয়লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং কোকবর্মার আশা জন্মিল সেও বঞ্চিত হইবে না; সে দূতীর হস্তে রানীকে লিপি পাঠাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কোনও ফল হইল না; রানী তাহার ন্যায় কুৎসিত পুরুষকে অনুগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন না। কোকবর্মা অনেক চেষ্টা করিয়াও লালসা চরিতার্থ করিতে পারিল না। উপরন্তু তাহার প্রণয়পত্রগুলি রানীর হস্তে মারাত্মক অস্ত্র হইয়া রহিল।

এইভাবে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া কোকবর্মার লিপ্সা আরও তীব্র হইয়া উঠিল। ছলে বলে যেমন করিয়া হোক রানীকে বশে আনিতে হইবে। কিন্তু শিখরিণী যতদিন রানীর পদে প্রতিষ্ঠিত আছে ততদিন তাহাকে লাভের আশা নাই। ধীরে ধীরে কোকবর্মা কোদণ্ড মিশ্রের ষড়যন্ত্র জালে জড়িত হইয়া পড়িল।

বর্তমানে কোকবর্মা ও কোদণ্ড মিশ্রের মধ্যে যে আলোচনা হইতেছে তাহা নূতন নয়, পূর্বে বহুবার হইয়া গিয়াছে। কোদণ্ড মিশ্র বলিতেছেন— কোকবর্মা, তুমি রাজা হও। এমন সুযোগ আর পাবে না।

কোকবর্মা ভেকমুণ্ড নাড়িয়া বলিল— রাজা হতে চাই না, আমি শুধু রানীকে চাই।

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন— মূর্খ! রাজ্য পেলে সেই সঙ্গে রানীকেও পাবে। দেখ, এখন কর্ণসুবর্ণে তোমার দুহাজার উগ্র ছাড়া আর কোনও সৈন্য নেই, অন্য সব সেনাপতি সৈন্য নিয়ে দণ্ডভুক্তির সীমানা রক্ষা করছে, জয়নাগকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এই সুযোগে তুমি সিংহাসনে বসলে কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না।

কোকবর্মা দ্রংষ্ট্ৰাবহুল হাসিয়া বলিল— ঠাকুর, আপনার কথা শুনতে ভাল। কিন্তু এখন গৌড়ের সিংহাসনে বসা আর শূলে বসা একই কথা। জয়নাগ অতি ধূর্ত এবং কুটিল, সে একদিন

একদিন গৌড়রাজ্য গ্রাস করবেই।

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন— আমিও ধূর্ত, এবং কুটিল, আমি কৌটিল্যের শিষ্য। আমি যতদিন মন্ত্রী আছি ততদিন জয়নাগ গৌড়ে দন্তস্ফুট করতে পারবে না।

কোকবর্মা রূঢ়ভাবে বলিল— কিন্তু আপনি আর কতদিন?— তারপর? আমার এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকবার ইচ্ছা আছে, জীবন সম্ভোগ আমার পূর্ণ হয়নি।

কোদণ্ড মিশ্র ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন— তুমি অদূরদর্শীর মত কথা বলছ। রাজার মত জীবন সম্ভোগের সুযোগ আর কার আছে? আজ তুমি রানী শিখরিণীর জন্য লালায়িত, কাল তার প্রতি তোমার অরুচি হবে; নূতন সম্ভোগতৃষ্ণা জাগবে। এ সুযোগ ছেড় না কোকবর্মা। মানুষের জীবনে এমন সুযোগ একবারই আসে। সমস্ত প্রস্তুত। অগ্নিবর্মার অন্তরঙ্গ অর্জুনসেন তাকে মদন-রস খাইয়ে উন্মত্ত করে রেখেছে, আমার সঙ্কেত পেলেই তাকে বিষ খাওয়াবে। তুমি ইচ্ছা করলে কালই গৌড়ের রাজা হতে পার।

কোকবর্মা কিন্তু ভিজিবার পাত্র নয়, দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল— ঐটি হবে না। আমি অগ্নিবর্মাকে সিংহাসন থেকে নামাতে রাজী আছি, তার সিংহাসনে বসতে রাজী নই। আমার শেষ কথা শুনুন। অগ্নিবর্মার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, আমি আমার সৈন্য নিয়ে রাজপুরী দখল করব; রাজপুরীতে যা ধনরত্ন আছে লুঠ করব, রানীকে লুঠ করব, তারপর নিজের মণ্ডলে ফিরে যাব। ইতিমধ্যে আপনার যাকে ইচ্ছা রাজা করুন আমার আপত্তি নেই।

কোদণ্ড মিশ্র হতাশভাবে বলিলেন—কিন্তু রাজা পাব কোথায়? কে এমন আছে যাকে দেশের লোক রাজা বলে মেনে নেবে? সেনাপতিরা যাকে স্বীকার করবে? আজ যদি শশাঙ্কদেবের একটা বংশধর থাকত—

শশাঙ্কদেবের বংশধর তখন ঠিক দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বদ্ধ দ্বারে টোকা পড়িল। কোকবমা চমকিয়া তরবারির উপর হাত রাখিল; কোদণ্ড মিশ্রও শঙ্কিতভাবে দ্বারের পানে চাহিল। তখন দ্বারে আবার করাঘাত পড়িল এবং আয়ি বুড়ির স্বর আসিল— ঠাকুর, জেগে নাকি গো? একবার দোর খুলবে? আমি গঙ্গার আয়ি।

কোদণ্ড মিশ্র অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন কিন্তু তাঁহার শঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হইল না। কোকবর্মাকে তিনি নীরব অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঘরের একটি কোণ দেখাইয়া দিলেন। কোণে দড়ি হইতে একটি কাপড় শুকাইতেছিল, কোকবর্মা তাহার পিছনে গিয়া লুকাইল। কোদণ্ড মিশ্র তখন দীপ হস্তে উঠিলেন, দ্বার খুলিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বিরক্ত স্বরে বলিলেন— এত রাত্রে তোমার আবার কী চাই গঙ্গার আয়ি?

কিন্তু আয়ি বুড়িকে উত্তর দিতে হইল না, তৎপূর্বেই কোদণ্ড মিশ্রের দৃষ্টি বজ্রের উপর পড়িল। তিনি দ্রুত নিশ্বাস টানিয়া বলিয়া উঠিলেন— কে? কে? কে তুমি?

বজ্র এতক্ষণ আলোক চক্রের কিনারায় দাঁড়াইয়া ছিল, এখন কোদণ্ড মিশ্রের সম্মুখে আসিয়া শান্তস্বরে বলিল— আপনি আর্য কোদণ্ড মিশ্র? শশাঙ্কদেবের মন্ত্রী ছিলেন?

কোদণ্ড মিশ্র স্খলিত স্বরে বলিলেন—হাঁ। তুমি–?

বজ্র যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিল— আমার নাম বজ্রদেব।

বজ্রদেব! তুমি কি! না না, এখন কিছু বোলো না। এস, আমার ঘরে এস।

কোদণ্ড মিশ্র হাত ধরিয়া বজ্রকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইলেন এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আয়ি বুড়ি কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আপন মনে বিজবিজ করিয়া বকিতে বকিতে নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে কোদণ্ড মিশ্র কম্পিত হস্তে দীপদণ্ডে প্রদীপ রাখিলেন, দীর্ঘকাল সম্মোহিতের ন্যায় বজ্রের পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন— যদি বিশ বছর কেটে না যেত, বলতাম তুমি মানবদেব।

বজ্ৰ বলিল— মানবদেব আমার পিতা।

বৎস, উপবিষ্ট হও। তুমি দৈব প্রেরিত হয়ে এসেছ। তোমার নাম বজ্রদেব। বজ্রের মতই আমি তোমাকে ব্যবহার করব।

উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন। এতক্ষণে কোকমা বস্ত্রের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল। বজ্রকে কুটিল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—এ কে?

কোদণ্ড মিশ্র উদ্দীপ্ত চক্ষে বলিলেন— মানবদেবের পুত্র বজ্রদেব! কোকবর্মা, এতদিনে রাজা পাওয়া গেছে।

কোকবর্মা বজ্রের প্রতি তির্যক কটাক্ষপাত করিয়া বলিল— মানবদেবের পুত্র! মানবদেবের পুত্র ছিল না। হতে পারে এ ব্যক্তি তার দাসীপুত্র।

বজ্র কোকবর্মার পানে চক্ষু তুলিল, স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া ধীর স্বরে কহিল— আমার পিতার সঙ্গে আমার মাতার বিবাহ হয়েছিল।

কোকবর্মা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কোদণ্ড মিশ্র বাধা দিয়া বলিলেন— ও প্রসঙ্গ অবান্তর। তুমি নিঃসন্দেহে মানবদেবের পুত্র। শুধু তোমার আকৃতি নয়, তোমার বাহুর অঙ্গদ তার সাক্ষী। ও অঙ্গদ আমি চিনি। কর্ণসুবর্ণে এমন অনেক প্রাচীন লোক আছে যারা তোমাকে মানবদেবের পুত্র বলে চিনতে পারবে। আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। শশাঙ্কদেবের পৌত্রকে সিংহাসনে বসালে গৌড়দেশে কেউ আপত্তি করবে না।

কোকবর্মা ঈষৎ মুখ-বিকৃতি করিয়া বলিল—যাক রাষ্ট্রবিপ্লবের তাহলে আর কোনও বাধা নেই!

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন— না, আর বাধা নেই। কোকবর্মা, তুমি আজ ফিরে যাও। তোমার সৈন্যদের প্রস্তুত রেখো। ঠিক সময়ে আমি তোমাকে সংবাদ পাঠাব।

ভাল। আমার পণ মনে আছে?

আছে। তুমি যা চাও তাই পাবে! তোমার বাহুবলই নির্ভর।

কোকবর্মা বিদায় লইল। খেয়াঘাটের অন্ধকারে তাহার ডিঙি বাঁধা ছিল। কোকবর্মা যাইবার সময় বজ্রের সুঠাম সুন্দর দেহের প্রতি একটা সামর্ষ ঈষাবঙ্কিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল। সুদর্শন পুরুষ সে সহ্য করিতে পারিত না।

সে-রাত্রে বজ্র ও কোদণ্ড মিশ্র শয্যাগ্রহণ করিলেন না; প্রদীপের দুই পাশে বসিয়া সমস্ত রাত্রি কথা হইল। কোদণ্ড মিশ্র মাঝে মাঝে উঠিয়া প্রদীপের তৈল পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন।

বজ্র আপন জীবন বৃত্তান্ত বলিল; গ্রামের জীবন, গ্রাম হইতে যাত্রা, শীলভদ্রের সহিত সাক্ষাৎ, কর্ণসুবর্ণে বাস, বহিত্রের অপহরণের দুশ্চেষ্টা, সমস্তই বিবৃত করিল। অপরপক্ষে কোদণ্ড মিশ্র তাঁহার বিংশবর্ষব্যাপী ষড়যন্ত্রের কাহিনী ব্যক্ত করিলেন। অবজ্ঞা, দৈন্য, বিফলতা তাঁহার সংকল্প টলাইতে পারে নাই। এতদিনে নিয়তির চক্র ঘুরিয়াছে, বর্মবংশের উচ্ছেদ করিয়া শশাঙ্কদেবের বংশধরকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইয়া তিনি ব্রত উদ্যাপন করিবেন।

বজ্র বৃদ্ধের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিল, কোনও আপত্তি করিল না। কাল প্রাতে সে যে গ্রামে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিল তাহা আর তাহার মনে রহিল না।

বাহিরে কাক কোকিলের ডাক শুনিয়া তাঁহাদের চৈতন্য হইল, রাত্রি শেষ হইয়াছে। কোদণ্ড মিশ্র বর্জের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন— বৎস, যতদিন না রাজপুরী অধিকৃত হয় তুমি এখানেই থাক, কর্ণসুবর্ণে ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। আমার অনেক কাজ, অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে, কর্ণসুবর্ণে যেতে হবে। আমি গঙ্গার আয়িকে বলে দেব, সে তোমার সেবা-যত্ন করবে।

বজ্র কুটিরের বাহিরে আসিয়া দেখিল, সম্মুখেই বিপুল-বিস্তার ভাগীরথী। পরপারের আকাশে সিন্দুরের রঙ ধরিয়াছে, এখনও সূর্যোদয় হয় নাই। স্রোতের মাঝখান দিয়া একটি হাঙ্গর-মুখ বহিত্র ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার পিছনে আরও কয়েকটি বহি। তাহারা সাগরে যাইতেছে।

বহিত্রগুলির পট্টপত্তনের উপর মানুষের চলাফেরা দেখা যাইতেছে। নাবিকেরা পাল তুলিতেছে; গুণবৃক্ষের শীর্ষে আড়কাঠের উপর বসিয়া দিশারু দিনির্ণয় করিতেছে।

বজ্র হাঙ্গর-মুখ বহিত্রটিকে চিনিল। কিন্তু উহার খোলের মধ্যে যে বিম্বাধর ও বটেশ্বর বন্দী আছে তাহা জানিতে পারিল না।

–

দিনটা আলস্য ও কর্মহীনতার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল।

কোদণ্ড মিশ্র প্রভাতেই স্নানাদি সমাপন করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধের জীর্ণ শরীরে কর্মপ্রেরণা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বজ্র শূন্য কুটিরে কিয়ৎকাল বসিয়া রহিল, তারপর আলস্য ভঞ্জন করিয়া বাহির হইল। তাহার মনের অবস্থা এখন স্তিমিত; সে যেন বিবাহের বর; তাহাকে ঘিরিয়া সকল তৎপরতা, অথচ সে নিজে নিষ্ক্রিয়।

বজ্র বাহিরে আসিয়া কাল রাত্রে যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেইদিকে চলিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটির, তাহার চারিপাশে শাক কন্দ ফল ফুলের উদ্যান। কুটিরগুলিতে মানুষ নাই, বোধহয় সকলেই কর্ণসুবর্ণে হাটে গিয়াছে। ইহাদের গৃহে চুরি করিবার মত তৈজস কিছু নাই, তাই তাহাদের মনেও কোনও দুশ্চিন্তা নাই।

এইরূপ কয়েকটি গৃহের পরে একটি কুটিরের সম্মুখীন হইয়া বজ্র গঙ্গাকে দেখিতে পাইল। গঙ্গা দাওয়ায় বসিয়া পায়ের উপর সলিতা পাকাইতেছিল, হাসিমুখে বজ্রকে অভ্যর্থনা করিল। বলিল—এস। আয়ি এক কাঁদি কলা আর ইচড় নিয়ে কানসোনায় বেচতে গেছে। এখুনি আসবে।

গঙ্গা দাওয়ায় পাটি বিছাইয়া দিল; ধামিতে করিয়া এক ধামি মুড়ি ও গুড় আনিয়া বর্জকে খাইতে দিল, উঠানের লতা হইতে ক্ষীরিকা পাড়িয়া দিল। বজ্র পরম তৃপ্তির সহিত মুড়ি চিবাইতে লাগিল।

গঙ্গার আজ আর শঙ্কা সঙ্কোচ নাই, সে সলিতা পাকাইতে পাকাইতে গল্ গল্ করিয়া কথা বলিতে লাগিল; আর থাকিয়া থাকিয়া বজ্রের অঙ্গদের পানে বিমুগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। বজ্র তাহা দেখিয়া বলিল—দেখবে? বলিয়া অঙ্গটি খুলিয়া তাহার হাতে দিল।

গঙ্গা যেন স্বর্গ হাতে পাইল। দুই চক্ষে আনন্দ এবং সন্ত্রম ভরিয়া সে অঙ্গদটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ দেখিবার পর গভীর পরিতৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া অঙ্গদ বর্জকে ফিরাইয়া

দিল। বজ্র লক্ষ্য করিল, গঙ্গার মুখে ক্ষণেকের জন্যও লোভ বা গৃধুতা প্রকাশ পাইল না। যাহাদের কিছুই নাই তাহারাই বোধকরি নিলোভ হইতে পারে।

আয়ি বুড়ি ফিরিয়া আসিল। কলা ও উঁচড় বিক্রি করিয়া সে কাঁকড়া কিনিয়াছে; ঘটা করিয়া অতিথির জন্য পঞ্চ ব্যঞ্জন রাঁধিতে বসিল। কাঁকড়া কুটিতে বসিয়া গঙ্গার আহ্লাদের সীমা নাই।

দ্বিপ্রহরে বজ্ৰ ভাগীরথীতে স্নান করিয়া আসিল। তারপর উদর পূর্ণ করিয়া বুড়ির রান্না অতি মুখরোচক অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিল।

আহারের পর হরীতকী চর্বণ করিতে করিতে বজ্র কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে ফিরিয়া গেল, দেখিল তিনি এখনও আসেন নাই। সে নল-পাটি পাড়িয়া শয়ন করিল। কাল রাত্রে জাগরণ গিয়াছে, তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল। ক্রমে সে অশান্ত অর্ধনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বজ্র দেহের জড়িমা দূর করিয়া বাহিরে আসিল। কোদণ্ড মিশ্রের দেখা নাই। তিনি এখনও ফিরিয়া আসেন নাই, কিম্বা হয়তো ফিরিয়াছিলেন, আবার বাহির হইয়াছেন; বজ্র ঘুমাইয়াছিল তাই জানিতে পারে নাই।

বজ্র অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ ইতস্তত করিল, তারপর ভাগীরথীর তীর ধরিয়া ভ্রমণে বাহির হইল। নিশ্চেষ্টভাবে কুটিরে বসিয়া থাকিয়া লাভ নাই।

সে উত্তরমুখে চলিল। এখানে জনবসতি অধিক নাই, স্থানে স্থানে দুই চারিটি বিচ্ছিন্ন কুটির। শূন্য তীর ধরিয়া চলিতে চলিতে সে ক্রমে ময়ূরাক্ষী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইল। ময়ূরাক্ষীর ধারা ভাগীরথীর তুলনায় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু যেস্থানে দুই স্রোত মিলিত হইয়াছে সে স্থান

তরঙ্গ সমাকুল। গত রাত্রে বজ্র এই স্রোত অন্ধকারে পার হইয়াছিল।

এই সঙ্গমস্থলের অপর পারে কোণের উপর বহু শিখরযুক্ত তুঙ্গ রাজপ্রাসাদ। এদিকটা প্রাসাদের পশ্চাদভাগ। দুই দিক হইতে উচ্চ প্রাকার আসিয়া নদীর কিনারায় দুইটি বিপুল স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে, মাঝের অবকাশ স্থলে অবরোধের স্নান-ঘাট। সারি সারি দীর্ঘ সমান্তরাল সোপান উচ্চ সৌধতল হইতে নামিয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

বজ্ৰ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। দুই তীরের মাঝখানে অনুমান তিন চারি রজ্জুর ব্যবধান। অস্তমান সূর্যের তির্যক আলোকে প্রাসাদ ও ঘাট স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রাসাদ যেন সুপ্ত, কোথাও কর্মচঞ্চলতা নাই; ঘাটে কয়েকটি পুরনারী জলে নামিয়া গা ধুইতেছে। আসন্ন দুর্যোগের কোনও পূর্বাভাস সেখানে নাই।

বজ্র ময়ূরাক্ষীর তীর ধরিয়া আবার চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি পরপারে প্রাসাদের উপর ন্যস্ত হইয়া রহিল। তাহার অন্তরে কোনও বিপুল হৃদয়াবেগ উত্থিত হইল না, কেবল নির্লিপ্ত শ্লথ চিন্তার ক্রিয়া চলিতে লাগিল; তাহার পিতামহের রচিত ঐ রাজপুরী...কোদণ্ড মিশ্রের চেষ্টা সার্থক হইবে কি?...কপর্দকহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটা রাজ্য ওলট-পালট করিয়া দিবে...ইহা কি সম্ভব? না ইহা স্বপ্ন?—

রাজপুরী পিছনে পড়িয়া রহিল, বজ্র খেয়াঘাটের নিকট উপস্থিত হইল। এখানে খেয়াঘাটের আশেপাশে জনবসতি অধিক। খেয়াতরী যাত্রীদের পারাপার করিতেছে; ওপারেও ক্ষুদ্র একটি খেয়াঘাট। বজ্র অদূরে উচ্চ পাড়ের উপর এক বৃক্ষতলে বসিয়া দেখিতে লাগিল। দর্শনীয় কিছু নয়; তবু তৃপ্ত মনে বসিয়া দেখা যায়।

অল্পকাল পরে সূর্যাস্ত হইল। খেয়ার মাঝি নৌকা বাঁধিয়া প্রস্থান করিল। ঘাট শূন্য হইয়া গেল।

বজ্ৰ উঠিয়া আবার নদীতীর ধরিয়া ফিরিয়া চলিল। রাজপ্রাসাদের সমান্তরালে আসিয়া দেখিল যেখানে প্রাসাদ ছিল সেখানে পিণ্ডীভূত অন্ধকার। সেই অন্ধকারের জঠর হইতে দুই চারিটি বর্তিকার ক্ষীণ রশ্মি নদীবক্ষে প্রতিবিম্ব ফেলিয়া কাঁপিতেছে।

বজ্র যখন কোদণ্ড মিশ্রের কুটির সম্মুখে ফিরিয়া আসিল তখন দিবালোক সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। কোদণ্ড মিশ্র ফিরিয়াছেন, কুটির কক্ষেই আছেন; বদ্ধ দ্বারের ফাঁকে আলো দেখা যাইতেছে।

বজ্ৰ দাওয়ায় উঠিয়া ঘরের মধ্যে মৃদু জল্পনার শব্দ শুনিতে পাইল। সে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া পড়িল— হয়তো কোনও গূঢ়-পুরুষ আসিয়াছে। বজ্র একটু দ্বিধা করিল, তারপর দ্বারের ফাঁক দিয়া তাহার দৃষ্টি ভিতরে প্রবেশ করিল। সেখানে কোদণ্ড মিশ্রের সম্মুখে যাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিল তাহাতে সে বিস্ময়ে পিছাইয়া আসিল।

কুহু! কোদণ্ড মিশ্রের সহিত মুখোমুখি বসিয়া কুহু কথা কহিতেছে! তাহার অঙ্গ ঘিরিয়া নীল রঙের ঊণা, কিন্তু চিনিতে কষ্ট হয় না—সেই মিষ্ট-দুষ্ট হাসিভরা মুখ! কুহু কোথা হইতে আসিল? কোদণ্ড মিশ্রের সহিত তাহার কী সম্বন্ধ?

দ্বারের বাহিরে নির্বাক দাঁড়াইয়া বজ্ৰ শুনিতে পাইল, কোদণ্ড মিশ্র বলিতেছেন— এই লিপি নাও, অর্জুনসেনকে আজ রাত্রেই দিও। আর মুখে বোলো, সমস্ত প্রস্তুত; অমাবস্যার তিথি যেন ভ্রষ্ট না হয়।

কুহু বলিল— বলব। —অমাবস্যা কবে?

পরশু। সেই রাত্রির মধ্যযামে—

যে আজ্ঞা। আজ তাহলে উঠি। ফিরতে দেরি করলে রানী সন্দেহ করবে।

স্বস্তি।

কুহু সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। তারপর বজ্রকে দেখিয়া সেও বজ্রাহতবৎ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুইজনেই হতবাক।

এই সময় ঘরের ভিতর হইতে কোদণ্ড মিশ্রের কণ্ঠস্বর আসিল—কে? বাহিরে কে?

বজ্ৰ চমকিয়া বলিল— আমি বজ্র।

এস বৎস, ভিতরে এস।

বজ্র দ্বিধাভরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলে কুহু চকিতে হাত তুলিয়া কি যেন ইশারা করিল, তারপর বাহিরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বজ্র কোদণ্ড মিশ্রের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল। বৃদ্ধের মুখে চোখে তীব্র উত্তেজনা, শুষ্ক দেহে তিলমাত্র অবসাদ নাই। তিনি নিম্নকণ্ঠে আজিকার সমস্ত দিনের কর্মতৎপরতা বজ্রকে শুনাইতে লাগিলেন। কর্ণসুবর্ণে এখনও অনেক ধার্মিক ও সম্রান্ত ব্যক্তি আছে যাহারা বর্তমান রাজারানীর কুক্রিয়া ও জঘন্য জীবনযাত্রায় উৎত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শশাঙ্কদেবের বংশধর সিংহাসনে বসিলে তাহারা আনন্দিত হইবে, সহায়তাও করিবে। ব্যবস্থা সমস্তই প্রস্তুত। অমাবস্যার রাত্রে অগ্নিবর্মার নারকীয় জীবন শেষ হইবে। পরদিন প্রাতে কোকবর্মার সৈন্যগণের সাহায্যে বর্জ রাজপুরী অধিকার করিবে। নগরে শাসন-ডিণ্ডিম প্রচারিত হইবে; অগ্নিবর্মার মৃত্যু এবং বজ্রদেবের অভিষেক ঘোষিত হইবে। কোকবর্মা যাহা চায় তাহা লইয়া নিজের দেশে চলিয়া যাইবে। দুই শত বাছাই করা খস্ যোদ্ধা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহারা রাজপুরী রক্ষা করিবে। কোদণ্ড মিশ্র তখন নিশ্চিন্ত হইয়া নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করিবেন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে।

বজ্র মনোযোগ দিয়া শুনিল, কিন্তু মনের মধ্যে কোনও প্রকার তীব্র আগ্রহ অনুভব করিল না। তাহাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন, অথচ তাহার অন্তর যেন এই জটিলতা-কুটিলতায় সায় দিতেছে না। পিতা-পিতামহের সিংহাসন তাহার প্রাপ্য, সে তাহা চায়। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির কূটচক্রান্ত, বিষপ্রয়োগে নরহত্যা, সে স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ইহা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা হইলে সে অধিক সুখী হইত।

কিন্তু মনের সূক্ষ্ম ভাবনা মুখে প্রকাশ করিতে সে অভ্যস্ত নয়। প্রকাশ করিয়াই লাভ কি। সে শুধু জিজ্ঞাসা করিল—আমার কর্তব্য কিছু আছে কি?

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন— উপস্থিত কিছু না। তুমি কেবল অমাবস্যার রাত্রি পর্যন্ত নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখবে, আর কোনও কর্তব্য নেই। আমার ঘরে এখন অনেক লোকের যাতায়াত হবে, তোমার এখানে না থাকাই ভাল। তুমি আয়ি বুড়ির ঘরে থাকবে।

আরও দুই চারি কথার পর বজ্র বাহিরে আসিল। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়াছে, নিম্নে কুটিরগুলিতে মৃৎ-প্রদীপের ক্ষুদ্র শিখা। বজ্র অন্যমনে আয়ি বুড়ির কুটিরের দিকে পা বাড়াইয়াছে। এমন সময় একজন আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

মধুমথন!

কুহু!

কুহু এতক্ষণ বাহিরের অন্ধকারে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। বজ্র তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল — তুমি এখানে?

কুহু প্রতিধ্বনি করিল— তুমি এখানে?

বজ্ৰ সংক্ষেপে নিজের নদীসন্তরণ কাহিনী বলিল, তারপর প্রশ্ন করিল—কিন্তু কোদণ্ড মিশ্রের কাছে তুমি এলে কি করে? তাঁর সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ?

কুহু বলিল— আছে, পরে বলব। কাল আমি মদিরাগৃহে গিয়েছিলাম। দেখলাম, দোর বন্ধ, কেউ নেই। কী দুঃখ যে হয়েছিল!

বজ্র লক্ষ্য করিল কুহু হাত ধরিয়া তাহাকে একদিকে লইয়া যাইতেছে। সে বলিল—কোথায় যাচ্ছ?

কুহু বলিল— চল, আমাকে রাজপুরীতে পৌঁছে দেবে।

কিন্তু–খেয়া তো বন্ধ। নদী পার হতে কি করে?

আমার উপায় আছে। এস।

কুহু তাহার বাহুর সহিত বাহু জড়াইয়া লইল। দুইজনে নক্ষত্রবিদ্ধ অন্ধকারের ভিতর দিয়া চলিল।

খেয়াঘাটে খেয়াতরীর পাশে একটি মোচার খোলার মত ছোট্ট ডিঙি বাঁধা আছে। এটি অবরোধের নারীদের ব্যবহার্য ডিঙি, ঘাটের এক কোণে স্তম্ভের গায়ে অর্ধনিমজ্জিত হইয়া বাঁধা থাকে; পুরীর দাসীরা প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করে। কুহু ও বজ্র সেখানে উপস্থিত হইলে কুহু বলিল— তুমি আগে ওঠ। বৈঠা ধর।

বজ্ৰ উঠিয়া বসিয়া বৈঠা করিল। কুহু পিছনের গলুইয়ে উঠিয়া বাঁধন খুলিয়া দিল। বজ্র জিজ্ঞাসা করিল — রাজপুরী কোন দিকে? কিছুই যে দেখা যাচ্ছে না।

কুহু বলিল— ভাবনা নেই, দুবার দাঁড় টেনে স্রোতের মুখে ডিঙি ছেড়ে দাও, আপনি রাজপুরীর ঘাটে গিয়ে লাগবে।

বজ্র তাহাই করিল। আঁধারে ডিঙি ভাসিয়া চলিল।

এতক্ষণে বজ্র অন্তরের মধ্যে একটা সহর্ষ উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিল। অসংখ্য অপরিচিত ব্যক্তির ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে সে যেন হঠাৎ একান্ত আপনার জনকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। মনের আনন্দে হাসিয়া উঠিয়া সে বলিল— কুহু, তোমার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে তা একবারও ভাবিনি।

কুহু বলিল— আমিও না। কিন্তু ঘাট এসে পড়েছে।

ঘাটের পাষাণে ডিঙি ঠেকিল। দুইজনে অবতরণ করিল। কুহু স্তম্ভের গায়ে লোহার আংটায় ডিঙি বাঁধিল, তারপর আসিয়া বজ্রের হাত ধরিল।

বজ্ৰ বলিল— এবার আমি ফিরে যাই?

কুহু বজ্রের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল— মহারাজ বজ্রদেব, আজ আপনাকে ছাড়ব। দাসীর ঘরে পায়ের ধুলো দিতে হবে।

মহারাজ বজ্রদেব! এই সম্বোধন শুনিয়া বজ্র যেন ক্ষণেকের জন্য মন্ত্রমূঢ় হইয়া গেল। কুহু হাত ধরিয়া তাহাকে রাজপুরীর মধ্যে লইয়া চলিল।

–

রাজপুরীতে প্রবেশ করিবার সময় বজ্রের পা কাঁপিয়া গেল, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইল, কণ্ঠের নিকট বাষ্পপিণ্ড উঠিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। পিতৃপুরুষের ভবনে এই তাহার প্রথম পদার্পণ।

রাজপুরীতে দীপ জ্বলিয়াছে, কিন্তু পুরীর পিছন দিকে বেশি আলো নাই। কুহু আলো-আঁধারির ভিতর দিয়া এক সঙ্কীর্ণ সোপানের সম্মুখীন হইল। রাজ-অবরোধের দাসী-কিঙ্করীদের ব্যবহারের জন্য এরূপ সোপান অনেক আছে। কুহু বজ্রের হাত ধরিয়া উপরে চলিল।

দ্বিতলের এক কোণে কুহুর কক্ষ। দূরে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। কুহু নিজ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল তাহার দাসী মালতী দ্বারের পাশে দুই পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। বজ্রকে পিছনে রাখিয়া কুহু আগাইয়া গেল।

মালতী উঠিয়া কুহুর পিছনে চোখ বাঁকাইয়া চাহিল। অবরোধে পুরুষের আবির্ভাব মালতীর চোখে নূতন নয়, তবে এ মানুষটা নূতন রটে; আবছায়া আলোতে দেখিয়াও চাহিয়া থাকিতে হয়। কুহু বজ্রকে যথাসম্ভব আড়াল করিয়া বলিল— মালতী, তোকে আর দরকার নেই। তুই যা।

মালতী চোখ ঘুরাইল, অঙ্গভঙ্গি করিল, তারপর দুষ্টামি-ভরা সুরে বলিল—এত রাত্তিরে কোথায় যাব গো ঠাকরুন?

কুহু ফিসফিস্ করিয়া বলিল—তোর মনের মানুষ নেই? তার কাছে যা। আজ আর ফিরতে হবে না, একেবারে কাল সকালে ফিরিস।

মালতী একগাল হাসিল। তাহাকে আর দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না, অঞ্চলপ্রান্ত উড়াইয়া সে নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

কুহু বজ্ৰকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, ভিতর হইতে দ্বারের খিল আঁটিয়া দিল।

ঘরটি খুব বড় নয়, ছোটও নয়। চারি কোণে দীপদণ্ডে চারিটি প্রদীপ, মসৃণ মণিহর্ম্যতলে আলোক প্রতিফলিত হইতেছে। বাতায়নের পাশে খট্টিকার উপর শুভ্র শয্যা। উপাধানের উপর মল্লিকা ফুলের স্থূল মালা শোভা পাইতেছে। ঘরের বাতাস কস্তুরী ও পুষ্পগন্ধে আমোদিত।

কুহু হাত ধরিয়া বর্জকে খট্টিকার উপর বসাইয়া দিল; মুগ্ধবিধুর চক্ষে চাহিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া ধরা-ধরা গলায় বলিল— ধুলোয় মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি তা কি আগে জানতাম! মহারাজ বজ্রদেব, যখন মাথায় রাজমুকুট ধারণ করবেন তখন এই পাপিষ্ঠা দাসীর কথা কি মনে থাকবে?

বজ্র কুহুকে টানিয়া তুলিয়া পাশে বসাইল, বলিল— কুহু, তুমি জানো না, তোমাকে পেয়ে আমি কী পেয়েছি। এই জনারণ্যে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু।

কুহু আদরে গলিয়া গেল, বজ্রের কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল— মনে থাকবে?

থাকবে। তোমাকে চিরদিন মনে থাকবে।

কুহু পরিপূর্ণ তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল, তারপর উঠিয়া মল্লিকা ফুলের মালাটি বজ্রের গলায় রাইয়া দিল। মালাটি সে আজ বৈকালে রানীর আদেশে গাঁথিয়াছিল; সেই মালা আর একজনের গলায় উঠিবে তখন কে জানিত! তৃপ্তির মধ্যেও রানীর কথা কুহুর মনে পড়িয়া গেল। রাক্ষসীটার কাছে যাইতে হইবে; ছলে-ছুতায় আরও দুইটা দিন তাহাকে ভুলাইয়া রাখা দরকার—

ঈষৎ অন্যমনা হইয়া কুহু একটা কুলঙ্গির কাছে গেল। কুলঙ্গিতে নানাবিধ মিষ্টান্ন ছিল, একটি স্থালীতে তাহা লইয়া বজ্রের কাছে ফিরিয়া গেল।

বজ্ৰ বলিল— এ কী?

কুহু বলিল— একটু খাও।

কুহু দুই হাতে থালি ধরিয়া রহিল, বজ্র মিষ্টান্ন তুলিয়া খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে বলিল—কোদণ্ড মিশ্রের সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ তা তো বললে না।

কুহু বলিল— আমার মা এই রাজপুরীর দাসী ছিল। কোদণ্ড ঠাকুর মাকে চিনতেন। মা মরবার সময় ঠাকুরকে বলে যায় তিনি যেন আমার দেখাশুনা করেন। তা ঠাকুর আর আমার কী দেখাশুনা করবেন, আমিই তাঁর দেখাশুনা করি।—ও কি, আর একটু খাও।

আর না, অনেক খেয়েছি।

এই ক্ষীরের পুলি খেতেই হবে।—বলিয়া কুহু ক্ষীরের পুলি বজ্রের মুখে তুলিয়া দিল।

আহার শেষ হইলে বজ্র বলিল—তুমি আর আমাকে মধুমথন বলবে না?

বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তোমার সত্যি নাম পরমভট্টারক শ্রীমন্ মহারাজা বজ্রদেব। মধুমথন তোমার মিথ্যে নাম।

বজ্র একটু অন্যমনস্ক হইল; গুঞ্জার মুখখানি তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। সে বলিল— মিথ্যে নয়, দুটো নামই সত্যি। তুমি আমাকে মধুমথন বলেই ডেকো।

কুহু জিভ কাটিল— রাজাকে কি অন্য নামে ডাকতে আছে?

রাজা তো এখনও হইনি। হব কিনা তারই বা ঠিক কি?

কুহুর মুখ দৃঢ় হইল; সে বলিল— তুমি রাজা হবে।

বেশ। যতদিন রাজা না হই ততদিন মধুমথন বলে ডেকো।

সে ভাল। তিন রাত্রির জন্য তুমি আমার মধুমথন। কুহু বজ্রের খুব কাছে সরিয়া আসিল।

বজ্র উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল— এবার কিন্তু আমি ফিরে যাব। কোদণ্ড মিশ্র বলেছেন—

কুহু তাহার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া তাহাকে উঠিতে দিল না। বলিল— কোদণ্ড ঠাকুর কি বলেছেন আমি শুনেছি। কিন্তু এখন তোমার যাওয়া হবে না। ভোর হবার আগেই আমি তোমাকে ডিঙিতে করে পৌঁছে দেব।

কিন্তু—এখন রাত কত?

এখনও প্রথম প্রহর শেষ হয়নি।

বজ্র হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল— না, আমি ফিরে যাই। তুমি যেতে না পারো আমি সাঁতরে ময়ূরাক্ষী পার হতে পারব।

কুহু কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার অধরে একটি গুপ্ত হাসি খেলিয়া গেল। সে বজ্রের বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল— আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, আমার একটা কাজ আছে সেটা সেরে এসে আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।

কি কাজ?

রানীর কাছে যাইতে হবে একথা কুহু বলিল না, বজ্রের কাছে রানীর নাম উচ্চারণ করিল না। বলিল— কোদণ্ড ঠাকুর চিঠি দিয়েছেন, রাজার অন্তরঙ্গ অর্জুনসেনকে দিতে হবে।

কতক্ষণ সময় লাগবে?

দু দণ্ড— বেশি নয়।

দু দণ্ড বসে থাকব?

কুহু কুহকভরা হাসিল— বসে থাকবে কেন? আমার বিছানায় শুয়ে থাকো।

বজ্র কোমল শয্যার প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টি করিয়া বলিল— যদি ঘুমিয়ে পড়ি?

অধরের একটি ভঙ্গুর ভঙ্গি করিয়া কুহু বলিল— যদি ঘুমিয়ে পড়, আমি এসে তোমাকে জাগিয়ে দেব।

বজ্র শয়ন করিল। কুহু তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে ঘর হইতে বাহির হইল।

ঘরের বাহিরে আসিয়া কুহু সতর্কভাবে চারিদিকে চাহিল। কেহ কোথাও নাই, পুরীর এ অংশ নিশুতি হইয়া গিয়াছে। কুহু নিঃশব্দে দ্বারের শিকল তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে চলিল।

চতুস্তলে রানী শিখরিণীর শয়নকক্ষ। কুহু প্রবেশ করিলে রানী অধোত্থিতা হইয়া প্রশ্নবিস্ফারিত চক্ষে চাহিলেন। ব্যজনরতা দাসী কুহুর ইঙ্গিতে সরিয়া গেল।

কুহু মনে মনে যে-কাহিনী গড়িয়া রাখিয়াছিল ম্রিয়মাণ কণ্ঠে তাহা বলিল। আজও পানশালা বন্ধ, শৌণ্ডিক কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সম্ভবত আগন্তুক যুবকও নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু জানিবার উপায় নাই, পানশালা শূন্য। এদিকে কুহুর অবস্থা শোচনীয়; হাঁটিয়া হাঁটিয়া তাহার পা দুটার আর কিছু নাই। এখন দেবী আজ্ঞা করুন—সে কী করিবে।

দেবী প্রজ্বলিত চক্ষে বলিলেন— তুই দূর হয়ে যা— দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা, তোর মুখ দেখতে চাই না।

কুহু করুণ নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর যুক্তকরে প্রণাম করিয়া ক্লান্তমন্থর পদে দ্বারের দিকে চলিল। দ্বারের বাহিরে গিয়া সে একবার চকিত-বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া চাহিল। তাহার চক্ষে প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ নিমেষে দেখা দিয়া নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইল। তারপর সে দ্রুতপদে রাজার প্রমোদভবনের দিকে চলিল। অন্তরঙ্গ অর্জুনসেন রাজার কাছেই আছে, তাহাকে কোদণ্ড মিশ্রের লিপি দিয়া রানী শিখরিণীর সর্বনাশের ব্যবস্থা পাকা করিয়া তবে সে নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবে।

রানী শিখরিণী কিন্তু কুহুর ঐ চকিত কটাক্ষ দেখিয়াছিলেন। তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। ব্যর্থতার ক্রোধ অপগত হইয়া তাঁহার ললাটে সংশয়ের ভ্রূকুটি দেখা দিল।

ব্যজনকারিণী দাসী ফিরিয়া আসিয়া আবার রানীকে বাতাস করিবার উদ্যোগ করিলে রানী জিজ্ঞাসা

করিলেন— বল্লী, কুহু কোনদিকে গেল দেখলি?

বল্লী চমকিয়া বলিল–তা তো দেখিনি দেবি। নিজের ঘরে গিয়েছে বোধহয়। দেখবো?

না— থাক।

রানী শিখরিণী আরও কিছুক্ষণ অধর দংশন করিতে করিতে চিন্তা করিলেন। তারপর সহসা শয্যা হইতে নামিয়া বাঞ্চল সংবরণ করিতে করিতে বলিলেন—বল্লী, আয় আমার সঙ্গে, কুহুর ঘরে আমাকে নিয়ে চল।

বল্লী ভীতচক্ষে রানীর পানে চাহিল। রানীর মুখ দেখিয়া তাহার বুক শুকাইয়া গেল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সে নীরবে অগ্রবর্তিনী হইয়া রানীকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

কুহুর শয্যায় শয়ন করিয়া বজ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাতায়ন দিয়া নদীর জল-ছোঁয়া বাতাস প্রবেশ করিয়া তাহার কপালে বুকে স্নিগ্ধ করাঙ্গুলি বুলাইয়া দিতেছিল। আজ দ্বিপ্রহরে বজ্র ঘুমাইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার দেহের গ্লানি দূর হয় নাই। কুহুর কোমল শয্যায় শুইয়া মৃগমদ ও পুষ্পগন্ধে আচ্ছন্ন হইয়া সে গুঞ্জাকে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

গুঞ্জা যেন তাহার পাশে বসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিতেছে, বুকে কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছে। বলিতেছে তোমার মাথায় ও কি? সোনার মুকুট। ছি ছি ফেলে দাও, আমি তোমাকে পলাশ ফুলের মালা পরিয়ে দেব–

গুঞ্জা! কুঁচবরণ কন্যা!...

কিন্তু এ কে? এ তো গুঞ্জা নয়! এ কি কুহু!...না, কুহুর মুখ এত সুন্দর নয়, গুঞ্জার মুখও এত সুন্দর নয়। মুখখানা যেন চেনা চেনা...কী তপ্ত নিশ্বাস, বুকের উপর পড়িয়া বুক যেন পুড়াইয়া দিতেছে—

গুঞ্জা কোথায় গেল?...এই নারীর চোখের দৃষ্টি এত তীব্র কেন? না—না। ...মনে পড়িয়াছে— রানী শিখরিণী! কিন্তু—না—না! গুঞ্জা কোথায়?

রানী শিখরিণী সরিয়া গেল...দ্বার খুলিয়া বাহিরে কাহার সহিত কথা কহিল, আবার দ্বার বন্ধ। করিয়া ফিরিয়া আসিল— তাহার হাতে একগুচ্ছ ধূমনিঃস্যন্দী ধূপশলাকা...কিসের ধূপ! রানী শলাকাগুলি তাহার মুখের কাছে নাড়িতেছে...

ধূপের গন্ধে মাদকতা আছে। বজ্রের শরীর যেন বিবশ হইয়া আসিতেছে। শরীরে অনুভূতি আছে, চেষ্টা নাই—মন কিন্তু সজাগ; সে জাগিয়া আছে, তবু যেন ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে...

তাহার চোখে রানী নিদালীর মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সে চোখের পাতা খুলিতে পারিতেছে না...অথচ সে জাগিয়া আছে, সমস্তই অনুভব করিতেছে—

গুঞ্জা, তুমি কোথায়? সোনার মুকুট ভাল নয়, তুমি আমাকে পলাশ ফুলের মালা পরাইয়া দাও—

গুঞ্জা! তুমি কি রানীর ছদ্মবেশে আমার কাছে আসিয়াছ! তাই কি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না! কুঁচবরণ কন্যা–!

রাজার প্রমোদভবন অবরোধ হইতে অনেকখানি দূরে, প্রাসাদের অন্য প্রান্তে। কুহু অলিন্দ দিয়া সেই দিকে চলিল। কখনও এক প্রস্থ সোপান অবরোহণ করিয়া কখনও এক প্রস্থ আরোহণ করিয়া খদ্যোতের মত নিঃশ্বদ সঞ্চারে চলিল। যতই প্রমোদভবনের কাছে আসিতে লাগিল ততই বাদ্যযন্ত্রের শ্বদ স্পষ্টতর হইতে লাগিল ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি।

অবশেষে কুহু প্রমোদকক্ষের দ্বারে পৌঁছিল।

প্রমোদকক্ষটি আয়তনে বৃহৎ, কিন্তু সর্বত্র সমভাবে আলোকিত নয়। মধ্যস্থলে অনেকগুলি উচ্চ দীপদণ্ড চক্রাকারে সাজানো রহিয়াছে, ছাদ হইতেও শৃঙ্খল-লম্বিত দীপাধার ঝুলিতেছে। কিন্তু এই চক্রের বাহিরে অধিক আলো নাই, কোণে কোণে ছায়ান্ধকার; কক্ষে অনেকগুলি মানুষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—তাহা সহসা ধরা যায় না।

মানুষগুলি কিন্তু সকলেই স্ত্রীজাতীয়। এমন কেহ নাই যে রূপসী ও নবীনা নয়; তাহাদের বেশভূষা সংক্ষিপ্ত, বুকে কাহারও কাঁচুলি আছে, কাহারও নাই। তাহারা গুচ্ছে গুচ্ছে হমতলে বসিয়া আছে, কেহ বা আস্তরণের উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে। যাহারা আলোকচক্র হইতে দূরে আছে তাহাদের অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। আলোকচক্রের মাঝখানে এক বিরলবসনা সভানন্দিনী নৃত্য করিতেছে; আলোকবিভ্রান্ত প্রজাপতির ন্যায় তাহার নৃত্যের ভঙ্গি। তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তিনটি যুবতী বীণা, মৃদঙ্গ ও মঞ্জীরা বাজাইতেছে— ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি।

রাজা অগ্নিবর্মা যে এই কক্ষে আছেন তাহা সহসা লক্ষ্যগোচর হয় না। কেন্দ্রীয় দীপচক্র হইতে অল্প দূরে একটি স্তম্ভে পৃষ্ঠ অর্পণ করিয়া তিনি বসিয়া আছেন। অগ্নিবর্মার অস্থিসার মুখে শ্মশ্রু গুম্ফ নাই, বক্ষও কেশহীন; মাথার চুল নারীর মত দীর্ঘ। তিনি স্তিমিতচক্ষে নর্তকীর পানে চাহিয়া আছেন। ছাগ-চক্ষুর ন্যায় ভাবলেশহীন চক্ষুর্দয়, কিন্তু তাহাদের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন উন্মাদনা।

কুহু উঁকি দিয়া দেখিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিল না। অর্জুনসেন রাজার অন্তরঙ্গ, নিজস্ব বৈদ্য, সর্বদা রাজার সন্নিধানে থাকা তাহার কর্তব্য। কিন্তু কুহু প্রমোদকক্ষের ছায়াচ্ছন্ন কোণে কোণে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ভিতরে নৃত্যের তাল ক্রমে দ্রুত হইতেছে। দ্বারের কাছে এক বিপুলকায়া প্রৌঢ়া রমণী হাতে খোলা তলোয়ার লইয়া বসিয়া আছে, সে এই প্রমোদকক্ষের দৌবারিকা। কিন্তু দ্বার রক্ষার দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, নৃত্যলীলার দিকেও নাই। সে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে।

কুহু দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্বিধায় পড়িল। অন্তরঙ্গ অর্জুনসেনকে সে কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইবে?

খুঁজিলেই কি পাওয়া যাইবে? কুহু ভাবিল, আজ থাক, কাল পত্র দিলেই হইবে। নিজের ঘরের দিকে কুহুর মন টানিতেছিল।

কুহু ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, দেখিল অলিন্দ দিয়া অর্জুনসেন আসিতেছে। তাহার পিছনে এক কিঙ্করী, কিঙ্করীর হস্তে পূর্ণ পানপাত্র।

অন্তরঙ্গ অর্জুনসেনের বয়স পঁয়ত্রিশ, নধর মসৃণ আকৃতি, মাথায় তৈলসিক্ত কুঞ্চিত কেশ, কুঞ্চিত গুম্ফ, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, যেন সর্বদাই বাষ্পোৎফুল্ল। কুহুকে দেখিয়া সে গতি শ্লথ করিল, কিঙ্করীকে বলি তুমি মহারাজকে পানীয় দাও গিয়ে, আমি যাচ্ছি।

কিঙ্করী প্রমোদকক্ষে প্রবেশ করিল। কুহু মৃদুস্বরে অর্জুনসেনকে কোদণ্ড মিশ্রের বার্তা জানাইল ও সঙ্কেতলিপি দিল।

অর্জুনসেনের বাষ্পেফুল্ল চোখে একটু কৌতুক দেখা দিল, সে স্নিগ্ধস্বরে বলিল— অমাবস্যার রাত্রি? ভাল। নিবন্ত প্রদীপে ফু দেওয়া বৈ তো নয়, তা দেব। আর্য কোদণ্ড মিশ্রকে আমার প্রণাম দিয়ে বোলো, শ্ৰীমন্মহারাজ একদিন আমাকে অম্বষ্ঠ বৈদ্য বলেছিলেন সে কথা আমার মনে আছে।

কুহু একবার অর্জুনসেনের স্নিগ্ধ মুখের পানে চাহিল, একবার দ্বারের ভিতর দিয়া পানপাত্র হস্তে উপবিষ্ট মহারাজের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল, তারপর নিঃশব্দ ক্ষিপ্রচরণে ফিরিয়া চলিল।

-

– -

কুহুর ঘরের বাহিরে অলিন্দের প্রদীপটি নিব-নিব হইয়াছিল, তাহার অস্থির প্রতিচ্ছায়া ভৌতিক আকার গ্রহণ করিয়া প্রাচীরগাত্রে নৃত্য করিতেছিল।

কুহু কোনও দিকে না চাহিয়া নিজের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, হাত তুলিয়া শিকল খুলিতে গিয়া থমকিয়া গেল। শিকল খোলা! কুহুর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল, সে দ্বারে হাত রাখিয়া চাপ দিল। দ্বার খুলিল না, ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ। কুহুর দেহের রক্ত হিম হইয়া গেল,

সে বুদ্ধিভ্রষ্টের মত দ্বারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় পিছন হইতে কেহ তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। কুহু ভীতচক্ষে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল— বল্লী! বল্লী হাত ধরিয়া তাহাকে দূরে টানিয়া লইয়া গেল, ফিসফিস্ করিয়া বলিল— কুহু, আজ তুমি মরেছ।

কুহু চাপা গলায় বলিল—আমার ঘরে কে দোর দিয়েছে?

তা এখনও বোঝোনি? রানী। –তোমার ঘরে কি কেউ ছিল?

ছিল কেউ।

বুঝেছি। কিন্তু তাকে আর পাবে না, রানী তাকে বশ করেছে। তোমার নাগর শক্ত মানুষ বলতে হবে, বশীকরণ-ধূপ দিয়ে তাকে বশ করতে হয়েছে।

গলা আরও নিম্ন করিয়া বল্লী যাহা দেখিয়াছিল এবং যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহা বলিল। শুনিয়া কুহু হাত কামড়াইল।

বল্লী বলিল— হাত কামড়ালে কি হবে? এখন পালাও, রানী যদি তোমাকে পায় তোমার ধড়ে মাথা থাকবে না।

কুহু তাহা বুঝিয়াছিল। রানীর ঈপ্সিত বস্তু সে নিজের জন্য লুকাইয়া রাখিয়া রানীকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, রানী তাহা জানিতে পারিয়াছে। ধরা পড়িলে আর রক্ষা নাই, রানী তাহাকে তুষানলে পুড়াইয়া মারিবে। কুহু আর কাল ব্যয় না করিয়া রাজপুরীর কুটিল চক্রবূ্যহের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কুহু শৈশব হইতে রাজ-অবরোধে পালিত, অবরোধের অন্ধিসন্ধি তাহার নখদর্পণে। সে একটি অতি নিভৃত গূঢ় কক্ষে গিয়া লুকাইয়া রহিল। এখানে কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না।

ধূলিমলিন অন্ধকার কোটরে একাকিনী বসিয়া উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কুহু তীব্র প্রতিহিংসা-চিন্তায় মনের বগা ছাড়িয়া দিল। তাহার ইচ্ছা হইল রাজাকে গিয়া সংবাদ দিবে, অগ্নিবর্মার হাত ধরিয়া ব্যভিচার-রতা রানীকে ধরাইয়া দিবে। কিন্তু তাহাতে বজ্রের প্রাণনাশ অনিবার্য। কুহু রুদ্ধবীর্য সর্পিণীর মত সারা রাত্রি তর্জন করিতে লাগিল।

তৃতীয় প্রহরের ভেরী বাজিয়া গেলে কুহু নিঃশব্দে উঠিয়া গুপ্ত কক্ষের বাহিরে আসিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে; রাজপুরীর অলিন্দপথে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকে গাঢ় তমিস্রা, একটি দীপও জ্বলিয়া নাই।

নিজের দ্বারের কাছে আসিয়া কুহু সন্তর্পণে হাত দিয়া অনুভব করিল, দ্বার খোলা। সে কক্ষে প্রবেশ করিল, কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শুনিল, শয্যা হইতে একজনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসিতেছে।

কুহু দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, ঘরের কোণে গিয়া কম্পিত হস্তে প্রদীপ জ্বালিল, তারপর ছুটিয়া গিয়া শয্যার পাশে দাঁড়াইল।

বজ্র চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছে, ধীরে ধীরে তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে। কুহু তাহার বাহু ধরিয়া নাড়িল, কানে কানে নাম ধরিয়া ডাকিল মধুমথন! বজ্র কিন্তু জাগিল না। ইহা কি নিদ্রা? না মাদকজাত মোহাচ্ছন্নতা?

বজ্রের সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া কুহুর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। বল্লী না দেখিয়াও যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহা সত্য। কুহু দন্তে অধর কাটিয়া রক্তাক্ত করিল।

এদিকে রাত্রি ফুরাইয়া আসিতেছে। রানী চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আবার কখন তাহার কি মতি হইবে কে জানে! কুহু ত্বরান্বিত হইয়া বজ্রের পরিচর্যা আরম্ভ করিল। মারণ উচাটন বশীকরণের যেমন ঔষধ ও প্রক্রিয়া আছে তাহার প্রতিষেধক ঔষধ প্রক্রিয়াও আছে। কুহু বজ্রের মাথায় শীতল জল দিল, সিক্ত বস্ত্র দিয়া বক্ষস্থল মুছিয়া দিল, আরও নানা প্রক্রিয়া করিল।

অবশেষে বজ্র রক্তাভ চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

তাহার দেহমনের জড়তা কাটিতে আরও কিছুক্ষণ গেল। সে উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিল— আমি এখানে কেন?

কুহু তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল— তুমি রাজপুরীতে এসেছিলে মনে নেই? আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে।

বজ্র স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল— ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু–

কুহু বলিল— তারপর বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিলে। ও কথা ভুলে যাও। রাত আর নেই। চল, তোমাকে কোদণ্ড ঠাকুরের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কোদণ্ড ঠাকুর!–চল।

কুহুর হাত ধরিয়া বজ্র ঘাটে আসিল। পূর্বাকাশে তখনও ঊষার উদয় হয় নাই, শুকতারা প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ দপ্ দপ্ করিতেছে।

কুহু বর্জকে ডিঙিতে বসাইল, হাতে বৈঠা ধরাইল দিল। বজ্র যন্ত্রবৎ বৈঠা টানিতে লাগিল।

তাহারা যখন কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে পৌঁছিল তখনও তাঁহার ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তিনি উষ্ণ মস্তিষ্কে কুটির মধ্যে পদচারণা করিতেছেন। এই এক অহোরাত্রের মধ্যে বৃদ্ধের দেহ আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট; চক্ষে জ্বরাক্রান্ত দৃষ্টি। বজ্রকে দেখিয়া তিনি দুই হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন— বজ্র! তুমি কোথায় গিয়েছিলে বৎস? তোমাকে খুঁজে

পেয়ে আমি ভেবেছিলাম আমার সমস্ত আয়োজন বুঝি পণ্ড হল! কোথায় ছিলে তুমি? বজ্র নিরুত্তর রহিল। কোদণ্ড মিশ্র কুহুর পানে চাহিলেন। কুহু তাঁহার কাছে সরিয়া গিয়া হ্রস্বকণ্ঠে ব্যাপার বুঝাইয়া দিল, নিজের অভিসন্ধিটুকু গোপন রাখিয়া বাকি সব সত্য কথা বলিল। শুনিয়া কোদণ্ড মিশ্র বিস্ফারিত নেত্রে বজ্রের পানে চাহিলেন, বলিলেন— কি বিপত্তি! যদি ধরা পড়ত! যদি প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ত! কিন্তু যাক, বাঘিনীর কবল থেকে ফিরে এসেছে এই যথেষ্ট। বজ্র, এখন থেকে তুমি আর কোথাও যাবে না, সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা এখানে থাকবে। কুহু, তুমিও আর অবরোধে ফিরে যেও না, বাঘিনী তোমাকে পেলে নিশ্চয় হত্যা করবে।

কুহু প্রজ্বলিত চক্ষে বলিল—আমি ফিরে যাব, এমনভাবে লুকিয়ে থাকব যে রানীর সাধ্য নেই আমাকে খুঁজে বার করে। কোকবর্মা রানীকে চুলে ধরে টেনে নিয়ে যাবে নিজের চোখে দেখব তবে আমার বুক ঠাণ্ডা হবে। বজ্রের কাছে গিয়া বলিল— অমাবস্যার পরদিন রাজপুরীতে আবার দেখা হবে।

কুহু চলিয়া গেল। বজ্র বাহিরে আসিয়া ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইল। নদীর ওপারে চক্রবাক-পক্ষের ন্যায় ঈষৎ রক্তিমা দেখা দিয়াছে, আর একটি নূতন দিনের সূচনা হইতেছে। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া বজ্রের মস্তিষ্কের কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গেল। তাহার মনে হইল, সেই যে বটেশ্বর ও বিম্বাধরের সঙ্গে সে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল তাহার পর এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে।

সূর্যোদয় হইলে বজ্র স্নান করিতে জলে নামিল। গঙ্গার স্নিগ্ধশীতল জলে অবগাহন করিয়া তাহার দেহমন সুস্থ হইল।

এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নাই, দুই হাতে সবেগে গাত্রমার্জন করিতে করিতে তাহার চোখে পড়িল, বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয়! সোনার অঙ্গুরীয়, মাঝখানে গাঢ় নীল একটি মণি। বজ্ৰ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অনেকক্ষণ অঙ্গুরীয়টি নিরীক্ষণ করিল। কোথা হইতে আসিল অঙ্গুরীয়? কে পরাইয়া দিল? গত রাত্রের তাহার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের এমন অবিচ্ছেদ্য জড়াজড়ি হইয়া গিয়াছিল যে কিছুই সে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছিল না। কিন্তু এই আংটি নিশ্চয় স্বপ্ন নয়। আংটির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল ইহার সহিত যেন কোন অজ্ঞাত অশুচিতার স্পর্শ লাগিয়া আছে। সে আংটি খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু ফেলিতে গিয়া সে থামিয়া গেল। আংটি এত সুন্দর, তাহার নীলবর্ণ মণি হইতে এমন অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে যে সে তাহা জলে ফেলিয়া দিতে পারিল না। বিশেষত মূল্যবান কোনও বস্তু নষ্ট করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে একটু চিন্তা করিয়া আবার উহা অঙ্গুলিতে পরিধান করিল।

স্নান শেষে সে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিল এবং সিক্তবস্ত্রে গঙ্গার কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আজও বুড়ি কানসোনার হাটে গিয়াছে। গঙ্গা পা ছড়াইয়া বসিয়া সলিতার পাঁজ কাটিতেছিল, হাসিমুখে উঠিয়া শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিল, ধামিতে মুড়ি শসা কলা গুড় নারিকেল আনিয়া সম্মুখে রাখিল।

অধমুদিত চক্ষে খাইতে খাইতে বজ্র বলিল—গঙ্গা, তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি। কী জিনিস? গঙ্গা উৎসুক আনন্দে চাহিল।

বজ্র আংটি খুলিয়া তাহার হাতে দিল। আংটি হাতে লইয়া গঙ্গার মুখে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল; ভয় সন্ত্রম আনন্দ সঙ্কোচ ক্ষণকালের জন্য তাহাকে নির্বাক করিয়া দিল। তারপর সে রুদ্ধশ্বাসে বলিল—এ আমার জন্যে এনেছ! এত সুন্দর আংটি! এ নিয়ে আমি কি করব?

বজ্র বলিল—এখন রেখে দেবে। যখন তোমার বিয়ে হবে তখন এই আংটি বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে। সেই টাকা নিয়ে তুমি আর তোমার বর সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করবে।

লজ্জায় আহ্লাদে গঙ্গার মুখখানি সিন্দুরবর্ণ হইয়া উঠিল।

–

অমাবস্যার পরদিন প্রত্যুষে কর্ণসুবর্ণের অধিবাসীরা শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্বেই শুনিল, রাজপথ দিয়া ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে একদল পদাতিক সৈন্য চলিয়াছে। সকলে দ্বার গবাক্ষ খুলিয়া দেখিতে লাগিল। পথ দিয়া দীর্ঘ সর্পিল সেনাদল চলিয়াছে। তাহাদের পৃষ্ঠে চর্ম, হস্তে শল্য, কটিবন্ধে তরবারি। তাহারা রাজপ্রাসাদের দিকে চলিয়াছে।

সেনাদলের অগ্রভাগে একটি সুসজ্জিত রথ। রথের ছত্র নাই, মুক্ত রথে পাশাপাশি বজ্র ও কোদণ্ড মিশ্র দাঁড়াইয়া আছেন। কোদণ্ড মিশ্রের শীর্ণ হস্তে অশ্বের রশ্মি, তিনি রথ চালাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, শুদ্ধ প্রাণশক্তির বলে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষে বিজয় গর্ব পরিস্ফুট। তাঁহার পাশে বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া বজ্ৰ দাঁড়াইয়া। বজ্রের মাথায় ধাতুময় শিরস্ত্রাণ, বক্ষে বর্ম, মুখে বজ্রকঠোর দৃঢ়তা। সে অচঞ্চলচক্ষে সম্মুখ দিকে চাহিয়া আছে।

রথের অগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে কোকবর্মা। সে কদাকার মুখে বিকৃত ভঙ্গিমা লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া আছে, দেহে লৌহজালিক, হস্তে বিনিষ্ক্রান্ত অসি। সে দক্ষিণে বামে মর্কট-চক্ষু ফিরাইয়া পথিপার্শ্বস্থ জনগণের মুখভাব পর্যবেক্ষণ করিতেছে, যেন মুখ দেখিয়া তাহাদের মনোভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছে।

সর্বাগ্রে শাসন-ডিণ্ডিম ধ্বনিত করিয়া ঘোষক পদব্রজে চলিয়াছে। চলিতে চলিতে ডিণ্ডিম থামাইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে নগরবাসিগণ, অবহিত হও। অগ্নিবর্মার কালান্ত হয়েছে। কিন্তু গৌড়ের সিংহাসন শূন্য নয়। পুরুষব্যাঘ্র মহারাজ শশাঙ্কদেবের পৌত্র, অমিতবীর্য মহারাজ মানবদেবের পুত্র পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ বজ্রদেব তাঁর পিতৃপুরুষের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তোমরা মহারাজ বজ্রদেবের জয় ঘোষণা কর।

নাগরিকেরা কিন্তু জয় ঘোষণা করিতেছে না। তাহারা উৎসুক নেত্রে শোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করিতেছে, কিন্তু এই রাজ-পরিবর্তন ব্যাপারে নিজেদের অংশভা মনে করিতেছে না। কোন রাজা মরিল, কোন নূতন রাজা আসিল, এ বিষয়ে তাহাদের কৌতূহল থাকিতে পারে কিন্তু তদধিক কিছু নয়। কে যাইবে রাজা মহারাজার

ব্যাপারে মাথা গলাইতে? নিরুপদ্রবে বাঁচিয়া থাকিতে

পারিলেই যথেষ্ট।

জনগণের মধ্যে কেবল একদল লোক এই আকস্মিক ঘটনাসম্পাতে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা জয়নাগের দল। জয়নাগের ষড়যন্ত্র প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল; সাধারণ যাত্রিকের বেশে তাঁহার দলের পাঁচ সহস্র যোদ্ধা কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। স্বয়ং জয়নাগ ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। গৌড়ের সেনাপতিরা যে-সময় দণ্ডভুক্তির সীমান্ত ঘিরিয়া বসিয়া জয়নাগের গতিরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন, চতুর জয়নাগ সেই অবকাশে জলপথে কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিয়া রাজ্যের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবার কৌশল করিয়াছিলেন। গৌড়ের সেনাপতিগণ যতক্ষণে সংবাদ পাইয়া রাজধানী রক্ষার জন্য ফিরিবে, ততক্ষণে পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত এবং সম্মুখে প্রতিবদ্ধ হইয়া ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। জয়নাগের এই কূটকৌশল কার্যে পরিণত হইতে আর দুই চারিদিন মাত্র বিলম্ব ছিল, সহসা এই নূতন সংস্থার উদ্ভব হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল।

সে যাহা হউক, কোকবর্মার সৈন্যদল ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে রাজপুরীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। অগ্নিবর্মার মৃত্যুসংবাদ রাজপুরীতে গোপন ছিল না, রক্ষী প্রতীহার দৌবারিক যে যেখানে ছিল পলায়ন করিয়াছিল। তৎপরিবর্তে কোদণ্ড মিশ্রের সংগৃহীত দুইশত পণ্য-যোদ্ধা পুরদ্বার রক্ষা করিতেছিল। ইহারা খ-পুকস-হূন-যবন শ্রেণীর যোদ্ধা; ইহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, যে বেতন দিবে তাহার জন্যই যুদ্ধ করিবে! ইহারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, যাহার বেতন লইয়াছে তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

কোদণ্ড মিশ্রের আজ্ঞায় তাহারা তোরণদ্বার খুলিয়া দিল। কোকবর্মা সদলবলে পুরভূমিতে প্রবেশ করিল এবং পঞ্চাশজন বাছা বাছা অনুচর লইয়া অন্তঃপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। আর সকলে পুরী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। চিৎকার আর্তনাদ হুড়াহুড়ির শব্দে রাজপুরী পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কোদণ্ড মিশ্র বজ্রকে লইয়া রাজভবনের একদিকে চলিলেন। খস্-পুক্কসদের কয়েকজন

প্রধান যোদ্ধা রক্ষিরূপে তাঁহাদের সঙ্গে রহিল।

কোদণ্ড মিশ্র রাজার প্রমোদভবনে উপনীত হইলেন। লুণ্ঠনকারীরা এখনও এদিকে আসে নাই, কেবল একজন পুরুষ প্রমোদভবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, সে রাজার অন্তরঙ্গ অর্জুনসেন। তাহার কেশকলাপ সুবিন্যস্ত, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, বাষ্পেফুল। অর্জুনসেন প্রফুল্ল মুখে বলিল— আর্য কোদণ্ড মিশ্র, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। মহারাজের জয় হোক।

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন—অগ্নিবর্মার দেহ কোথায়?

এই যে। আসুন। অর্জুনসেন অগ্রবর্তী হইয়া তাহাদের ভিতরে লইয়া গেল। বিশাল ভবন শূন্য, ছায়ান্ধকার; রাত্রির ক্লেদ যেন এখনও তাহার বাতাসে লাগিয়া আছে। কোথাও পলাতকা সভানন্দিনীর দেহচ্যুত রঙ্গিন উত্তরীয় রক্তরেখার ন্যায় পড়িয়া আছে, কোথাও খলিত নূপুর গড়াগড়ি যাইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ শিলাকুট্টিমের উপর শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি শব। অর্জুনসেন বস্ত্রের প্রান্ত তুলিয়া দেখাইল। মৃত্যুর কঠিন স্পর্শে

অগ্নিবর্মার কামনা-বিধ্বস্ত দেহ চিরতরে স্থির হইয়াছে।

বজ্র একবার সেইদিকে দেখিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইল। কোদণ্ড মিশ্র কিয়ৎকাল মৃত মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বিতৃষ্ণাসূচক মুখভঙ্গি করিলেন, তারপর রক্ষীদের বলিলেন— মৃতদেহ গঙ্গার জলে নিক্ষেপ কর। হয়তো সদ্গাতি হবে।

অগ্নিবর্মার দেহ প্রাকারশীর্ষ হইতে ভাগীরথীর জলে নিক্ষিপ্ত হইল। বজ্ৰ ভাবিল তাহার পিতার দেহও এই পথে গিয়াছিল! গৌড় রাজগণের রাজপুরী হইতে নির্গমনের ইহাই বুঝি একমাত্র পথ।

অতঃপর সকলে সভাগৃহে আসিলেন।

ওদিকে রাজ-অবরোধে যে বীভৎস ব্যাপার চলিতেছিল তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। বেলা দ্বিপ্রহরে কোকবর্মা ও তাহার সৈন্যগণ লুণ্ঠনকার্য শেষ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য পুরপ্রাঙ্গণে রক্ষণ করিল; রানী শিখরিণীকে দোলায় তুলিল। তারপর বিদায় গ্রহণের পূর্বে কোকবমা কোদণ্ড মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কার্যসিদ্ধির দম্ভে তাহার কদর্য মুখ আরও কদর্য আকার ধারণ করিয়াছে, মদমত্ততার বশে দেহ টলিতেছে। সে উচ্চ বিকৃতকণ্ঠে হাস্য করিয়া বলিল— ঠাকুর, আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার আমি চললাম। তোমার রাজা আর তুমি মনের সুখে রাজত্ব কর। বলিয়া আবার ধৃষ্টতা-ভরা হাসি হাসিল।

কোকবর্মাকে দেখিয়া বজ্রের অন্তর দুঃসহ ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। নরকের পশুটাকে পদাঘাত করিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া সে মুখ ফিরাইয়া বাতায়ন সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

কোকবর্মা বোধহয় কোদণ্ড মিশ্র ও বজ্রের নিকট বহু প্রশস্তি ও চাটুবচন আশা করিয়াছিল, কিন্তু বজ্ৰকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে শ্বাপদের ন্যায় দশন নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল— কুকুরের মাথায় রাজছত্র কতদিন থাকে দেখব।

বজ্র বিদুযদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কোকবর্মা উচ্চ ব্যঙ্গহাস্য করিতে করিতে দ্রুতপদে সভাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহার মনে যতই গরল থাক, বজ্রের সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার দুঃসাহস তাহার নাই।

দুই দণ্ডের মধ্যে কোকবর্মার দল রাজপুরী ত্যাগ করিল। কোদণ্ড মিশ্রের সৈন্যদল তখন পুরী রক্ষার ভার লইল। তোরণে প্রাকারশীর্ষে সর্বত্র ধনুর্ধর রক্ষিগণ পাহারা দিতে লাগিল।

সভাগৃহে বজ্র ও কোদণ্ড মিশ্র ভিন্ন আর কেহ ছিল না; একটি রমণী দ্বারের নিকট উঁকি মারিল। বজ্ৰ অমনি ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল কুহু। তুমি কোথায় ছিলে?

কুহু হাসিয়া বলিল— লুকিয়ে ছিলাম। তারপর নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল—শ্রীমন্মহারাজ বজ্রদেবের জয় হোক।

বজ্রের মুখ কঠিন হইল। সে কুহুকে হাত ধরিয়া তুলিয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল, কোদণ্ড

মিশ্র আসিয়া বলিলেন— কুহু! ভালই হল। এখনই রাজার অভিষেক হবে। আজই

অভিষেক করব। তুমি ব্যবস্থা কর।

কুহু সবিস্ময়ে বলিল— সে কি ঠাকুর। লোকজন কৈ, সভাসদ কৈ? কার সাক্ষাতে অভিষেক হবে?

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন— আমি নগরে খবর দিয়েছি, প্রধান নাগরিকেরা এখনি আসবে। যদি না আসে তবু আমি একাই অভিষেক করব।

ভাল। বলিয়া কুহু অভিষেকের ব্যবস্থা করিতে গেল।

প্রধান নাগরিকেরা আসিলেন না, কেহই আসিল না। কোদণ্ড মিশ্র কয়েকজন রক্ষীকে ডাকিয়া রাজসভায় সমবেত করিলেন। অবরোধে যে কয়েকজন প্রৌঢ়া নারী অবশিষ্টা ছিল তাহারা আসিয়া হুলুধ্বনি করিল, লাজাঞ্জলি ছড়াইল; কুহু শঙ্খধ্বনি করিল। কোদণ্ড মিশ্র বর্জের ললাটে রাজটিকা পরাইয়া দিলেন। বজ্র পিতৃপুরুষের সিংহাসনে বসিল। এইভাবে অভিষেকের হাস্যকর অভিনয় সম্পন্ন হইল।

সভা আবার শূন্য হইলে কোদণ্ড মিশ্র সভাগৃহের এক প্রান্তে একটি বেদিকার উপর শয়ন করিলেন। বৃদ্ধের মনের অবস্থা অনুমান করা যায় না, কিন্তু দেহ যে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত তিন চারিদিন যাবৎ তিনি অন্নজল গ্রহণ করেন নাই, নিদ্রাও যান নাই; এক সর্বগ্রাসী ভাবনা তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া বেদিকার উপর শয়ান রহিলেন।

সভাগৃহের অন্য প্রান্তে বসিয়া কুহু ও বজ্র নিম্নস্বরে কথা বলিতেছিল।

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—অবরোধের অবস্থা কি?

কুহু বলিল— ভাল নয়। যেন কদলী বনে একপাল বুনো হাতি ঢুকেছিল।

আর রানী?

কুহু মলিন মুখে বলিল— রানীকে কোকবর্মা ধরে নিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম আমার আনন্দ হবে, কিন্তু দেখে কান্না এল।

বজ্ৰ সহসা বলিল—কুহু, চল এবার পালিয়ে যাই।

কুহু বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—সে কি, কোথায় পালিয়ে যাবেন?

যেখানে তোক। রাজা তো হলাম, আর কি! বলিয়া বজ্র একটু তিক্ত হাসিল।

কিন্তু কিন্তু—এখনও যে সবই বাকি!

থাক বাকি। সত্যি বলছি, কুহু, আমার রাজা হওয়ার সাধ মিটে গেছে, নাগরিক জীবনে ঘৃণা জন্মেছে। এ জীবনযাত্রা আমার জন্যে নয়। আমি চলে যেতে চাই।

কুহু গালে আঙ্গুল রাখিয়া চিন্তা করিল, বজ্রের মুখের উপর গুপ্ত স্নেহদৃষ্টি বুলাইল, শেষে কোদণ্ড মিশ্রের দিকে মাথা নাড়িয়া বলিল— কিন্তু উনি? আপনি যদি চলে যান ওঁর কি অবস্থা হবে?

বজ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—সেই একটা কথা। ওঁর এই রাজা রাজা খেলা দেখে কৌতুক আর করুণা দুইই অনুভব করছি, কিন্তু ওঁকে ছেড়ে যেতে পারছি না।

বেলা তৃতীয় প্রহরে একজন গূঢ়পুরুষ সংবাদ লইয়া আসিল। বলিল— জয়নাগ ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে রাজপুরীর দিকে আসছেন।

কোদণ্ড মিশ্র উঠিয়া বসিলেন— জয়নাগ!

গুপ্তচর জয়নাগ সম্বন্ধে সামান্য যাহা সংবাদ পাইয়াছিল তাহা বলিল। শুনিয়া কোদণ্ড মিশ্র শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পকাল পরে দ্বিতীয় গুপ্তচর আসিল। সে সংবাদ দিল—কোকবর্মা জয়নাগের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দুজনে একসঙ্গে পুরী অধিকার করতে আসছে।

কোদণ্ড মিশ্রের কণ্ঠমধ্যে অস্পষ্ট একটি শব্দ হইল। তিনি ধীরে ধীরে আবার শয়ন করিলেন।

সঙ্কল্পিত কর্মে সহসা অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া জয়নাগ চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা যে সংবাদ লইয়া আসিল তাহাতে তিনি যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলেন। বজ্রদেব নামক এক যুবক নিজেকে মানবদেবের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া অগ্নিবর্মাকে হত্যা করিয়াছে এবং নিজে রাজা হইয়া বসিয়াছে। তাহার পৃষ্ঠপোষক কেবল কোদণ্ড মিশ্র নামধারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং দুই সহস্র সেনার অধিনায়ক কোকবর্মা।

কোকবমার পরিচয় জয়নাগ পূর্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার দুই হাজার সৈন্য ব্যতীত অন্য কোনও রাজকীয় সেনাদল উপস্থিত কর্ণসুবর্ণে নাই। কোকবর্মার সেনাদল উত্তম যোদ্ধা বটে, কিন্তু কোকবর্মা স্বয়ং অতি হীন চরিত্র ব্যক্তি। উপর্যুক্ত উৎকোচ পাইলে সে যুদ্ধ করিবে না।

তারপর জয়নাগ সংবাদ পাইলেন, কোকবর্মা রাজপুরী লুঠপাট করিয়া সসৈন্যে নগরের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। জয়নাগ এই বিচিত্র সংবাদে উদ্বিগ্ন হইলেন, কোকবর্মা কোথায় যাইতেছে, কি জন্য যাইতেছে বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি ত্বরিতকর্মা কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি তৎক্ষণাৎ কোকবর্মার নিকট দূত পাঠাইলেন।

কর্ণসুবর্ণে কোকবর্মার বাসভবন ও সেনানিবাস ছিল। দূত সেখানে না গিয়া নগরের উত্তর তোরণের নিকট

কোকবর্মাকে ধরিল। জনান্তিকে উভয়ে কথা হইল। দূতের প্রস্তাব শুনিয়া কোকবমার পাপবুদ্ধি আবার জাগ্রত হইল। সে বলিল— জয়নাগের প্রস্তাবে আমি সম্মত। তিনি যে গৌড় গ্রাস করবেন তা আগেই জানতাম, তাই সময় থাকতে কর্ণসুবর্ণ ছেড়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি যখন আমাকে তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে স্থান দিচ্ছেন তখন আমি তাঁর দলে; যে কুকুরটাকে আমি সিংহাসনে বসিয়েছি, তাকে আমিই সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেব। জয়নাগকে কোনও কষ্টই করতে হবে না।

নিয়তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কোকবমা ফিরিয়া চলিল। ইতিমধ্যে জয়নাগ প্রকাশ্যভাবে নিজে সৈন্যদের সমবেত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, গোপনতার আর প্রয়োজন ছিল না। কোকবর্মা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং বন্দিনী রানীকে নিজভবনে পাহারার মধ্যে রাখিয়া জয়নাগের সঙ্গে যোগ দিল।

জয়নাগ স্থির করিয়াছিলেন নূতন রাজাকে শক্তি সংগ্রহ করিবার সময় দেওয়া হইবে না, গাছ। শিকড় গাড়িবার পূর্বেই তাহাকে উৎপাটিত করিতে হইবে। তিনি কোকবর্মাকে পার্শ্বে লইয়া সম্মিলিত সৈন্যদলের অগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে চলিলেন। নগরের অধিবাসিগণ প্রাতঃকালে যেমন শোভাযাত্রা দেখিয়াছিল অপরাহ্ণেও তেমনি শোভাযাত্রা দেখিল। কেহ একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করিল না।

–

কুহু বজ্রকে রণসাজ পরাইয়া দিল। বুকে পিঠে লোহার সাঁজোয়া, মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, কটিতে তরবারি। পরাইতে পরাইতে কুহুর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এতদিনে পাপিষ্ঠা কুহু ভালবাসিয়াছে। শুধু দেহের আসক্তি নয়, এই সরল স্বল্পবা অ-নাগরিক মানুষটি তাহার হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছে।

বাষ্পোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কুহু বলিল— চল, পালিয়ে যাই। কাজ নেই যুদ্ধে।

বজ্ৰ বলিল—আর হয় না। শত্রু আসছে, যুদ্ধ না দিয়ে পালাতে পারি না।

কিন্তু লাভ কি? ওরা সাত হাজার, আমরা মাত্র দুশো জন।

তবু যুদ্ধ করতে হবে। যতক্ষণ একজন সৈনিক যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকবে ততক্ষণ আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তা ছাড়া কোদণ্ড মিশ্র আছেন। এ আমার যুদ্ধ নয়, কোদণ্ড মিশ্রের যুদ্ধ। তিনি যতক্ষণ আজ্ঞা না দিচ্ছেন ততক্ষণ লড়তে হবে।

বজ্র তোরণের দিকে চলিল। তোরণদ্বার বন্ধ, তাহার ছায়াতলে পঞ্চাশজন যোদ্ধা প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যুদ্ধের উদ্দীপনা ছিল না। বজ্রের সসজ্জ মূর্তি দেখিয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। একজন অধিনায়ক সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিল— জয়নাগ আক্রমণ করতে আসছে একথা কি সত্য?

বজ্ৰ বলিল— সত্য। তোমরা তোরণদ্বার বন্ধ রাখো, কিন্তু এমনভাবে বন্ধ রাখো যাতে সহজে খোলা যায়।

যে আজ্ঞা।

বজ্র তখন প্রকারের উপর উঠিল। আকৃষ্ট ধনুর ন্যায় অর্ধচক্রাকৃতি প্রাকার, তাহার উপর দেড়শত সৈন্য যথেষ্ট নয়। তথাপি তাহারা প্রসারিত হইয়া সতর্কভাবে অবস্থান করিতেছে, শত্রু বিনা বাধায় প্রাকার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। বজ্র সমস্ত পরিদর্শন করিয়া বুঝিল, ইহার অধিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। কিন্তু একটা দিক এখনও অরক্ষিত আছে। রাজপুরীর পশ্চাতে স্নানঘাট অরক্ষিত, শত্রু সেই দিক দিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। যদিও এ আশঙ্কা অমূলক, জয়নাগ এত অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট নৌকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই; তবু সাবধান থাকা ভাল। বজ্র দশজন সৈনিককে ঘাট রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিল; যদি ওদিক দিয়া আক্রমণ আসে তাহারা গতিরোধ করিতে পারিবে। অন্তত সংবাদ দিতে পারিবে।

তারপর সূর্যাস্ত হইতে যখন আর দুই দণ্ড বাকি আছে তখন দূরে রাজপথের অন্য প্রান্তে জয়নাগের সৈন্যদল দেখা দিল। অগ্রে দুই অশ্বপৃষ্ঠে জয়নাগ ও কোকবর্মা, পিছনে ঘনসন্নিবিষ্ট সৈন্য-সম্বধ; যেন জাঙ্গাল ভাঙ্গিয়া বন্যার স্রোত আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে ভেরী-তূরী নাই; কিন্তু বিপুল জন-প্রবাহের সঞ্চরণ শব্দ অবরুদ্ধ গর্জনের মত শুনা যাইতেছে।

বজ্র তোরণশীর্ষে প্রাকারের উপর দাঁড়াইয়া ছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার বক্ষে হর্ষোন্মাদনা নৃত্য করিয়া উঠিল। এ দৃশ্য যেন তাহার চিরপরিচিত। অস্তোন্মুখ সূর্যের ছটায় সৈন্যদের পদোদ্ধৃত ধূলা গৈরিকবর্ণ ধারণ করিয়া বিপুল বাহিনীর ঊর্ধ্বে কুণ্ডলিত হইতেছে। তাহার ভিতর দিয়া অস্ত্রের ঝকমকি, বহুবর্ণ কেতন পতাকার আন্দোলন। বজ্র নিজের সমাসন্ন বিপদ ভুলিয়া গেল, ইহারা যে শত্রু তাহা ভুলিয়া গেল। তাহার কমধ্যে রক্তের দ্রুত প্রবাহ ঝাঁঝর-ঝল্লরীর মত রণিত হইতে লাগিল; তীব্রোজ্জ্বল চক্ষে ফুরিত নাসাপুটে সে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

তোরণ হইতে অনুমান তিনশত হস্ত দূরে আসিয়া জয়নাগ অশ্ব স্থগিত করিলেন : দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া সৈন্যদের ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা দাঁড়াইল।

জয়নাগ কোকবর্মার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। উভয়ের দৃষ্টি দুর্গের উপর; কথা কহিতে কহিতে সৈন্যদের পিছনে রাখিয়া দুই আরোহী সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

বজ্র তোরণশীর্ষ হইতে দেখিতেছিল। অশ্বারূঢ় ব্যক্তিদ্বয় কি কথা কহিতেছে সে শুনিতে পাইল না, কিন্তু কোকবর্মাকে চিনিতে পারিল। অন্য ব্যক্তি নিঃসন্দেহে জয়নাগ। বজ্রের চোখের দৃষ্টি কঠিন হইয়া উঠিল।

তোরণশীর্ষের যোদ্ধারা ধনুতে তীর যোজনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল; এখনও শত্রু বহুদূরে, তীর নিক্ষেপ করা তীরের অপব্যয় মাত্র। সকলে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছে।

বজ্র একজন নায়ককে কাছে ডাকিল। অশ্বারূঢ় ব্যক্তিদের নির্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল— ওরা এখান থেকে কত দূরে বলতে পার?

নায়ক বিচার করিয়া বলিল—আড়াইশো হাতের কম হবে না।

বজ্র বলিল— ভাল। আমাকে একটা ধনু দাও।

নায়ক বিস্মিত চক্ষু তুলিয়া বলিল—এত দূর থেকে–

বজ্র বলিল—একটা ভাল ধনু দাও।

অন্য যোদ্ধারা আসিয়া নিজ নিজ ধনু বজ্রকে দেখাইল। বজ্র একটি শার্গ ধনু বাছিয়া লইল; ধনুমুষ্টি লৌহের, দুই দিকে শৃঙ্গ। চতুর্হস্ত প্রমাণ ধনু, তাহাতে মৃগতন্তুর ছিলা। বজ্র ধনুর গুণ খুলিয়া আবার টান করিয়া গুণ পরাইল। তারপর অতি যত্নে দুইটি দ্বাদশমুষ্টি পরিমিত কঙ্কপত্রযুক্ত শর নির্বাচন করিয়া লইল।

অশ্বারূঢ় দুইজন ইতিমধ্যে আরও কিছু নিকটে আসিয়াছে; তাহারা গভীরভাবে কোনও বিষয় আলোচনা করিতেছে। কিন্তু তাহারা এখনও দুইশত হস্তের অধিক দূরে আছে; দুর্গ হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে তাহাদের নিকট পৌঁছিতে পারে, কিন্তু বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। বিশেষত জয়নাগ ও কোকবর্মা উভয়ের দেহই লৌহজালিকে আবৃত, তীর গায়ে পড়িলেও বিদ্ধ করিতে পারিবে না।

ঠিক দুইশত হস্ত পর্যন্ত আসিয়া জয়নাগ অশ্ব সংযত করিলেন; যেন অবচেতন মন তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল ইহার অধিক নিকটে যাওয়া নিরাপদ নয়। দুই অশ্ব পাশাপাশি দাঁড়াইল; দুই আরোহী প্রাসাদের দিকে চক্ষু তুলিলেন।

বজ্ৰ ইন্দ্রকোষের ছিদ্রমুখে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে ধনুতে শরসংযোগ করিল। পাশে দাঁড়াইয়া নায়ক অন্য তীরটি ধরিয়া ছিল, মৃদুস্বরে বলিল— কিন্তু এখনও দুইশত হস্ত দূরে।

বজ্ৰ শুনিতে পাইল না। শর সন্ধান করিয়া ধীরে ধীরে গুণ আকর্ষণ করিল। কর্ণ পর্যন্ত গুণ আকর্যণ করিয়া শর ছাড়িয়া দিল। টঙ্কার শ্বদ হইল, যেন এক ঝাঁক ভ্রমর একসঙ্গে গুঞ্জন করিয়া উঠিল।

কোকবর্মা হাস্য করিতে করিতে কিছু বলিতেছিল; তাহার মুখের হাসি সহসা মিলাইয়া গেল। সে নিজের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল একটি তীরের পুঙ্খ তাহার বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আছে। বজ্রের তীর তাহার লৌহজালিক ভেদ করিয়া বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ হইতে একটা শুষ্ক হিক্কার ন্যায় শ্বদ বাহির হইল। তারপর সে ঘোড়ার পিঠ হইতে টলিয়া পড়িয়া গেল। নরাধম কোকবর্মা জানিতেও পারিল না যে তাহার লালসা-কলুষিত পঙ্কিল জীবনের অবসান হইয়াছে।

জয়নাগ কিন্তু নিমেযমধ্যে ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিজের ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া পশ্চাদ্দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। বজ্র দ্বিতীয় শর লইয়া ধনুতে যোজনা করিয়াছিল, কিন্তু শরসন্ধান করিবার পূর্বেই জয়নাগ লক্ষ্যের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তোরণশীর্ষে যাহারা বজ্রের এই অদ্ভুত লক্ষ্যবেধ দেখিয়াছিল তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সাধারণ ধানুকী আশী হস্ত পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ করিতে পারে, মধ্যম ধানুকী দেড় শত হস্ত পর্যন্ত পারে। কিন্তু অসামান্য শক্তি না থাকিলে দুই শত হস্ত দূরস্থ শত্রুকে লৌহজালিক ভেদ করিয়া বধ করা অসম্ভব। যোদ্ধৃগণের উৎসাহ শত গুণ বর্ধিত হইল, এমন ধনুর্ধরের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া গৌরব আছে।

বজ্ৰ ধনু প্রত্যর্পণ করিয়া তোরণশীর্ষ হইতে নামিয়া গেল। সে মনে বিশেষ কোনও উল্লাস

অনুভব করিল না, কেবল ভাবিল— রাজা হয়ে অন্তত একটা সকার্য করেছি।

ওদিকে কোকবর্মার তীরবিদ্ধ দেহ পথের উপর পড়িয়া ছিল, তাহার ঘোড়াটা পলায়ন করিয়াছিল। শত হস্ত পশ্চাতে বিস্ময়াহত সেনাদলের সম্মুখে জয়নাগ নিজ অধীনস্থ সেনানীদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রাসাদের রক্ষীরা যত অল্পসংখ্যক হোক তাহারা যুদ্ধ করিবে, স্বেচ্ছায় তোরণদ্বার খুলিয়া দিবে না। জয়নাগের সঙ্গে হস্তী নাই, দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপযোগী যন্ত্র নাই। এখন কী কর্তব্য?

ক্রমে সূর্য চক্রবালরেখা স্পর্শ করিল; রাত্রির আর বিলম্ব নাই। প্রাসাদের রক্ষিসৈন্যদের মুখেও উদ্বেগের ছায়া পড়িল। তাহারা নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে জল্পনা করিতে লাগিল : রাত্রি হইলে প্রাসাদ রক্ষা করা কিরূপে সম্ভব হইবে? অন্ধকারে গা ঢাকিয়া শত্রু যদি পাঁচ দিক দিয়া প্রাকার উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করে তবে তাহাদের নিবারণ করার উপায় কি? একবার তাহারা তোরণদ্বার খুলিয়া দিতে পারিলে আর রক্ষা নাই, পুরীর সকলকে মরিতে হইবে।

বজ্র বদ্ধ তোরণদ্বারের সম্মুখে কুঞ্চিত ললাটে পদচারণা করিতেছিল এমন সময় বাহিরে দূরে বহুজনের কলকোলাহল উত্থিত হইল। কোলাহল ক্রমশ কাছে আসিতেছে। তোরণশীর্ষ হইতে একজন যোদ্ধা ডাকিয়া বলিল— ওরা আক্রমণ করতে আসছে।

নীচে হইতে একজন নায়ক প্রশ্ন করিল— কতজন?

তিন চারশো। একটা গো-শকট ঠেলে নিয়ে আসছে, বোধহয় তোরণদ্বার ভাঙ্গবার জন্য।

বজ্র ত্বরিতে প্রাকারে উঠিয়া একবার দেখিয়া আসিল। তারপর নিম্নে দ্বাররক্ষীদের বলিল— তোমরা প্রস্তুত থাকো। ধনুর্বাণ রাখো, তরবারি নাও। আমি যা আদেশ করব তাই করবে।

আক্রমণকারীরা কাছে আসিতেছে। তাহারা লক্ষ্যান্তরে আসিলে প্রাকার হইতে নিক্ষিপ্ত শর তাহাদের মধ্যে গিয়া পড়িতে লাগিল; তাহারা বামহস্তে বর্ম তুলিয়া ধরিয়া শর নিবারণ করিতে লাগিল। দুই চারিজন হতাহত হইল, কিন্তু তাহাদের গতি রুদ্ধ হইল না।

তোরণদ্বারের ভিতর দিকে পঞ্চাশজন অসিধারী যোদ্ধা অপেক্ষা করিয়া রহিল। তারপর শত্রুদল গো-শকট ঠেলিয়া সবেগে দ্বারের উপর আঘাত করিল। দ্বার অটুট রহিল বটে কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে বারম্বার এইরূপ আঘাত পাইলে দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় বার গো-শকট দ্বারের উপর সবেগে প্রহৃত হইল। তারপর বাহির হইতে উচ্চ পুরুষ কণ্ঠস্বর আসিল— শোন সবাই। তোমরা পুরী রক্ষা করতে পারবে না। যদি দ্বার খুলে দাও, যোদ্ধারা সকলে মুক্তি পাবে, জয়নাগ সকলকে নিজ সেনামধ্যে স্থান দেবেন। কিন্তু যদি বাধা দাও, বাতি দিতে কাউকে রাখব না। যদি ইষ্ট চাও দ্বার খুলে দাও।

কিছুক্ষণ দ্বারের উভয় পক্ষ নীরব, কোনও শব্দ নাই। তারপর বজ্র তরবারি নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল—দ্বার খুলে দাও।

বজ্রের পশ্চাতে যে পঞ্চাশজন রক্ষী ছিল তাহারা তাহার অভিপ্রায় বুঝিল। সকলে তরবারি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া দাঁড়াইল।

দ্বার খুলিয়া গেল। এত শীঘ্র দ্বারোন্মোচনের জন্য শত্রু প্রস্তুত ছিল না, তাহারা ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া রহিল। এই অবকাশে বজ্র ও তাহার দল সিংহনাদ করিয়া তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল।

অতর্কিত আক্রমণে প্রথমেই শত্রুদলের অনেক সৈনিক কাটা পড়িল। তারপর প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বজ্রের পক্ষে পঞ্চাশ, বিপক্ষে তিন শত। কিন্তু বজ্র একা এমন মত্তহস্তীর মত যুদ্ধ করিল যে কেহই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার সৈন্যগণও তাহার আদর্শে উদ্দীপ্ত হইয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিল। শত্রুপক্ষ যেন হতবুদ্ধি হইয়াই পলাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় অর্ধদণ্ড যুদ্ধ হইবার পর জয়নাগের দল গো-শকট ফেলিয়া মূল সৈন্যদলে ফিরিয়া গেল। বজ্রের রক্ষিদল বিজয়োল্লাসে শকট টানিয়া ভিতরে আনিল এবং আবার তোরণদ্বারে ইন্দ্রকীলক আঁটিয়া দিল।

বজ্র সম্পূর্ণ অক্ষতদেহে ছিল; তাহার পক্ষের কয়েকজন যোদ্ধা অল্পবিস্তর আহত হইয়াছিল, কেহ মরে নাই। সকলে মহোল্লাসে বর্জকে ঘিরিয়া কলরব করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাদের উল্লাস অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। একজন প্রবীণ যোদ্ধা অগ্রে আসিয়া বর্জকে সম্বোধন করিয়া বলিল— মহারাজ, আপনার মত বীরের পাশে যুদ্ধ করতে করতে আমরা প্রত্যেকে প্রাণ দিতে পারি। কিন্তু প্রাণ দিয়ে লাভ কি? আপনাকে রক্ষা করতে পারব না। ওরা অসংখ্য, আমরা মাত্র দুই শত। শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হবে।

বজ্র বলিল— তোমাদের ইচ্ছা কি?

নায়ক বলিল—আমরা আপনার বেতনভুক্, যতক্ষণ আদেশ করবেন ততক্ষণ যুদ্ধ করব। কিন্তু প্রাসাদ রক্ষা করা যাবে না। আমাদের প্রাণ তো যাবেই, আপনারও প্রাণ যাবে। তার চেয়ে আপনি যদি গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করেন তখন আমাদের আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না। আমরা যেমন ইচ্ছা করতে পারব।

বজ্র একটু চিন্তা করিয়া বলিল— আমিও নিরর্থক নরহত্যা চাই না। কিন্তু কোদণ্ড মিশ্র আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। তুমি এস আমার সঙ্গে।

দুইজনে সভাগৃহের অভিমুখে চলিল। কুহু পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত প্রাসাদের মধ্যে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া বজ্রের সঙ্গে চলিল।

সভাগৃহ প্রায় অন্ধকার। কোদণ্ড মিশ্র বেদিকার উপর পূর্ববৎ শুইয়া আছেন। বহুক্লান্ত বৃদ্ধ গভীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু এখন না জাগাইলে নয়। বজ্র তাঁহার কাছে গিয়া ডাকিল—আর্য কোদণ্ড মিশ্র!

কোদণ্ড মিশ্র উত্তর দিলেন না। বজ্র আবার ডাকিল, এবারও তিনি নীরব। তখন বজ্র তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেখিল অঙ্গ হিমবৎ শীতল। কোদণ্ড মিশ্র আর জাগিবেন না।

বজ্র কুহুর দিকে ফিরিয়া বলিল— কুহু, যাঁর জন্য যুদ্ধ তিনি নিজেই চলে গেছেন। সুতরাং আমাদের পালাতে আর বাধা নেই। সেনানায়ককে বলিল— তোমরা দুর্গের দ্বার খুলে দাও। যুদ্ধ শেষ হয়েছে।

–

কুহু ও বজ্র যখন স্নানঘাটে আসিল তখন দিনের চিতা নিভিয়া গিয়াছে, আকাশ হইতে যেন সেই চিতার ধূসর ভস্ম নদীর জলে ঝরিয়া পড়িতেছে। যে দশজন যোদ্ধাকে বজ্র ঘাট রক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিল তাহারা তখনও ঘাটের স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া শত্রুর প্রতীক্ষ করিতেছিল। শত্রু কিন্তু আসে নাই। হয়তো এদিক দিয়া আক্রমণের কথা জয়নাগ চিন্তা করেন নাই, কিম্বা নৌকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। পরিপূর্ণ প্রস্তুতির পূর্বেই আক্রমণ করিতে হইয়াছে বলিয়া এই অবস্থা।

বজ্র যোদ্ধাদের বিদায় দিল। তারপর দুইজনে ঘাটের কোণের দিকে গেল। স্তম্ভের ছায়াতলে ডিঙি বাঁধা আছে, দড়ি খুলিয়া উভয়ে আরোহণ করিল।

কুহু বলিল, কিন্তু কোথায় যাব তা তো জানি না।

বজ্ৰ বলিল, আমি জানি। দাঁড় আমায় দাও।

দাঁড়ের টানে ডিঙি স্রোতের মুখে পড়িল, তারপর স্রোতের টানে সঙ্গমের দিকে ভাসিয়া চলিল।

বজ্ৰ শিরস্ত্রাণ খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিল, বুক হইতে সাঁজোয়া খুলিয়া নদীতে বিসর্জন দিল।

তরবারিও সেই পথে গেল। সে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বাঁচলাম।

দুইজন ডিঙির দুই প্রান্তে বসিয়া আছে, অস্পষ্টভাবে পরস্পর দেখিতে পাইতেছে। কুহু জিজ্ঞাসা করিল তোমার দুঃখ হচ্ছে না?

বজ্র বলিল— না। তোমার হচ্ছে নাকি?

কুহু বলিল— কি জানি। আমরা যে বেঁচে আছি এই আশ্চর্য মনে হচ্ছে।

বজ্র বলিল—আমার আশ্চর্য মনে হচ্ছে এতদিন নিজেকে চিনতে পারিনি। কিন্তু এবার পেরেছি। আমি শশাঙ্কদেবের পৌত্র, মানবদেবের পুত্র বটে, কিন্তু আমার প্রকৃত পরিচয়— আমি মধুমথন।

ডিঙি দুই নদীর সঙ্গমস্থলে আসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ জলের প্রবল কল্লোলধ্বনি হইল, ডিঙি টলমল করিয়া দুলিতে লাগিল; তারপর ভাগীরথীর প্রবলতর স্রোতের মধ্যে গিয়া পড়িল। বজ্র তখন দুই হাতে বৈঠা লইয়া উজান টানিয়া চলিল।

আকাশে তারা ফুটিয়াছে; অন্ধকারে চক্ষু অভ্যস্ত হইলে অল্প দেখা যায়, পশ্চিমের তীর নিকটে। ডিঙি আলোকহীন রাজপুরীর প্রাকাররেখা ছাড়াইয়া চলিল। গতি কিন্তু অতি মন্দ; দাঁড়ের জোরে যেমন দুই হাত আগে যাইতেছে, স্রোতের টানে তেমনি এক হাত পিছাইতেছে।

কুহু জিজ্ঞাসা করিল— কোথায় যাচ্ছ?

দাঁড় টানিতে টানিতে বজ্র বলিল— রাঙামাটির মঠে। সেখানে আমার একজন বন্ধু আছেন, হয়তো দেখা পাব। তারপর গ্রামে ফিরে যাব।

অনেকক্ষণ কথা হইল না। অন্ধকারে কেবল ছপছপ দাঁড়ের শব্দ।

সহসা কুহু বলিল— আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে? বলিয়াই অন্ধকারে জিভ কাটিল।

বজ্রের নিকট হইতে উত্তর আসিল না। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল; তারপর বজ্র কথা বলিতে আরম্ভ করিল। কুহুর প্রশ্নের উত্তর দিল না; মৌরীতীরের ক্ষুদ্র গ্রামটির কথা, মায়ের কথা, গুঞ্জার কথা, চাতক ঠাকুরের কথা বলিতে লাগিল। যেন কাহাকেও শুনাইবার জন্য বলিতেছে না, আপন মনে বলিয়া চলিয়াছে। জলের কলধ্বনির মধ্যে কুহু কান পাতিয়া শুনিল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহারা রাঙামাটির মঠের ঘাটে পৌঁছিল। বিস্তৃত ঘাটের পাশে বিপুলকায় চৈত্য আকাশে মাথা তুলিয়া আছে, চিনিয়া লইতে কষ্ট হইল না।

ঘাটে জনমানব নাই, সংঘ সুপ্ত। বজ্র ডিঙি ঘাটের পৈঠার উপর টানিয়া তুলিয়া রাখিল, যাহাতে স্রোতে ভাসিয়া না যায়। তারপর দুইজনে শুষ্ক সোপানের উপর পাশাপাশি বসিল। সংঘের কাহাকেও এখন জাগানো চলিবে না, নিশাবসান পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

কুহু বলিল— মধুমথন।

কী?

তুমি চলে যাবে, তারপর আমি কি করব, কোথায় যাব বলে দাও।

স্নেহে ও করুণায় বজ্রের বুক ভরিয়া উঠিল, সে বাহু দিয়া কুহুর পৃষ্ঠ জড়াইয়া লইয়া বলিল— চল, কুহু, তুমি আমার সঙ্গে গ্রামে চল।

কুহু ধীরে ধীরে বলিল—না, আমি ভুল বলেছিলাম। তোমার সঙ্গে গ্রামে গেলে তোমার জীবনে অনেক দুঃখ অশান্তি আসবে, তাতে কাজ নেই। কিন্তু একদিন আমি যাব তোমার কাছে। যখন আমার আর যৌবন থাকবে না, তখন যাব। ততদিন আমাকে মনে থাকবে?

বজ্র গাঢ় স্বরে বলিল— থাকবে। আমি যাদের ভালবাসি তাদের ভুলি না।

কুহু নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু বজ্র তাহার অশ্রু দেখিতে পাইল না।

ক্রমে দীর্ঘ রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। গঙ্গার বুক-ছোঁয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, পূর্বাকাশে যেন একটু লালিমার স্বপ্ন। সংঘের ভিতর নিদ্রোত্থিত মানুষের ক্ষীণ সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইল। বজ্ৰ বলিল—কুহু, এবার তোমায় যেতে হবে। ডিঙি ভাসিয়ে একেবারে গঙ্গার আয়ির ঘাটে যেও, সেখানে কিছুদিন লুকিয়ে থেকো। তারপর অদৃষ্ট যেদিকে নিয়ে যায়।

কুহু বলিল—সেই ভাল। আমার তো আর কেউ নেই যার কাছে যাব।

বজ্র বাহু হইতে অঙ্গদ খুলিয়া কুহুকে দিল, বলিল— এটা রাখো। দেখলে আমাকে মনে পড়বে।

কুহু অঙ্গদটি আঁচলে বাঁধিল। আলো ফুটিতেছে, দুজনে অনচ্ছভাবে পরস্পর মুখ দেখিতে পাইতেছে। কুহু জলভরা চোখ তুলিয়া বলিল— শুধু অঙ্গদ দেখলে তোমাকে মনে পড়বে? না হলে পড়বে না?

বজ্র কুহুকে দুই বাহু দিয়া বুকের কাছে তুলিয়া লইল, তাহার অধরে চক্ষে ললাটে চুম্বন করিয়া নামাইয়া দিল।

কুহু কিছুক্ষণ বজ্রের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিল, তারপর ডিঙিতে গিয়া উঠিল। ডিঙি স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল।

মণিপদ্ম বজ্রকে ঘাটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া চমকৃত হইয়া গেল।

আপনি ফিরে এসেছেন!

মণিপদ্ম বজ্রের হাত ধরিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল; তাহাকে আহার্য দিল। বজ্ৰ বলিল— কানসোনায় টিকতে পারলাম না, পালিয়ে এলাম।

মণিপদ্ম বিমনাভাবে বলিল— হ্যাঁ, আমরাও শুনেছি কি যেন গোলমাল হয়েছে। তারপর উৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া বলিল—আর্য শীলভদ্র কাল সমতট থেকে ফিরে এসেছেন। এবার আমরা নালন্দা যাব।

কবে?

তা জানি না। আর্য শীলভদ্র জানেন।

বজ্র তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া বলিল—ভাই, তাঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দাও। তাঁকে কিছু বলবার আছে।

মণিপদ্ম বজ্রকে শীলভদ্রের নিকট লইয়া গেল। শীলভদ্র পূর্বের ন্যায় গন্ধকুটির কোণের প্রকোষ্ঠে অবস্থান করিতেছিলেন। বজ্র প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলে শীলভদ্র তাহার মুখ ক্ষণেক অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর বলিলেন— কর্ণসুবর্ণের সংবাদ কিছু কিছু পেয়েছি। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভুক্তভোগী। সব কথা বল।

বজ্র সকল কথা বলিল। শুনিয়া শীলভদ্র দীর্ঘকাল নীরব রহিলেন, শেষে হাত নাড়িয়া যেন এ প্রসঙ্গ মন হইতে সরাইয়া দিয়া বলিলেন— বুদ্ধের ইচ্ছা। এখন কি করবে স্থির করেছ?

বজ্ৰ বলিল— আপনার কি উপদেশ?

শীলভদ্র বলিলেন—আমি আগে যা বলেছিলাম এখনও তাই বলি। গ্রামে ফিরে যাও। আর তোমার নাম যে বজ্রদেব তা ভুলে যাও।

বজ্ৰ নীরবে চাহিয়া রহিল। শীলভদ্র বলিলেন—কিন্তু পথঘাট এখন তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়। রাজা হবার পর তোমাকে সকলেই দেখেছে, সকলেই চিনতে পারবে। এ পথ দিয়ে ক্রমাগত সৈন্য যাতায়াত করছে, তারা সব জয়নাগের সৈন্য। একটু চিন্তা করিয়া বলিলেনকিন্তু তুমি এক কাজ করতে পার। কাল প্রভাতে আমি নালন্দা যাত্রা করব, আমার সঙ্গে কয়েকজন ভিক্ষু থাকবেন। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাকে তাহলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম।

শীলভদ্রকে নিজের কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে বজ্রের মন ক্লান্তি ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইল, আর কাজ নাই সংসারে ফিরিয়া গিয়া। এই মহাপুরুষের সঙ্গে জ্ঞানের মহাতীর্থে চলিয়া যাই, বুদ্ধের শরণ লই। তিনি আমাকে শান্তি দিবেন। মণিপদ্ম যে আনন্দের স্বাদ পাইয়াছে আমিও সেই আনন্দের স্বাদ পাইব।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল নিজ গ্রামের কথা। চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল চিরপ্রতীক্ষমানা মায়ের মুখ। অর্ধেক জীবন যাহার নিষ্ফল প্রতীক্ষায় কাটিয়াছে বাকি অর্ধেক জীবনও তাহার তেমনিভাবে কাটিবে! স্বামীহারা অভাগিনী পুত্রকেও ফিরিয়া পাইবে না? আর গুঞ্জা! গুঞ্জা দিনের পর দিন ন্যগ্রোধ বৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়া তাহার পথ চাহিয়া থাকিবে—

বজ্র মস্তক নত করিয়া বলিল— যে আজ্ঞা। আমি আপনার সঙ্গে যতদূর সম্ভব যাব, তারপর গ্রামের পথ ধরব।

সেদিন বজ্র সংঘের একটি প্রকোষ্ঠে রহিল।

সারাদিন সংঘের সম্মুখস্থ পথ দিয়া দলবদ্ধ সৈন্যগণের যাতায়াত। পদাতি গজ অশ্ব, অধিকাংশই কর্ণসুবর্ণের দিকে যাইতেছে। সমবেত পদধ্বনির গমগম শব্দ, হস্তীর গলঘণ্টা, চিৎকার কোলাহল। সংঘে কিন্তু কেহ প্রবেশ করিল না, কোনও উৎপাত করিল না।

বজ্র নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই সকল শব্দ শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিল— জয়নাগ প্রাসাদ অধিকার করিয়াছেন, নগর তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছে। নগরের উপর অধিকার দৃঢ় করিবার জন্য তিনি আরও সৈন্য আনিতেছেন। হয়তো যুদ্ধ বাধিবে। যে সকল সেনাপতি দণ্ডভুক্তির সীমানা রক্ষা করিতেছে তাহারা রাজধানী পতনের সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসিবে—

বজ্রের জল্পনা সর্বৈব মিথ্যা নয়, কিন্তু তাহার পক্ষে যাহা অনুমান করা সম্ভব নয় এরূপ অনেক ঘটনাও ঘটিতেছিল।

দণ্ডভুক্তি-অবরোধকারী সেনাপতিদের নিকট রাজধানী পতনের সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। তাঁহারা প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন; তারপর তাঁহাদের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। কেহ বলিলেন, জয়নাগ যখন কর্ণসুবর্ণে গিয়াছে তখন দণ্ডভুক্তি আক্রমণ করিব। কেহ বলিলেন, কর্ণসুবর্ণে ফিরিয়া গিয়া যুদ্ধ দিব। কেহ বলিলেন, রাজাই নাই, কাহার জন্য যুদ্ধ করিব? মতভেদ বাড়িয়াই চলিল। ইতিমধ্যে, দণ্ডভুক্তিতে জয়নাগের যে সৈন্য ছিল তাহারা তীব্রবেগে আক্রমণ করিল। একতাহীন হতোৎসাহ সেনাপতিগণ নিজ নিজ সৈন্য লইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহাদের ফিরিবার স্থান নাই, উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যগণকে শাসন করিবার শক্তি নাই, তাহাদের বেতন দিবার সামর্থ্য নাই। সৈন্যগণ এরূপ অবস্থায় যাহা করে তাহাই করিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া নিজের দেশ লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সমগ্র দেশে গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

চতুর জয়নাগ আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিলেন না; ইহাতে তাঁহার ইষ্ট বই অনিষ্ট নাই। তিনি জানিতেন সৈন্যগণের এই উদ্ধৃঙ্খলতা একদিন শান্ত হইবে। এখন তাহাদের আশ্রয় নাই, একদিন তাহাদের আশ্রয়ের প্রয়োজন হইবে। তখন তাহারা নূতন রাজার পতাকাতলে আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিবে। নূতন রাজার রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হইবে।

–

পরদিন প্রাতঃকালে যাত্রারম্ভ করিতে কিছু বিলম্ব হইল। শীলভদ্রের সঙ্গে সমতট হইতে দুইটি চৈন ভিক্ষু আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও নালন্দা যাইবেন। সর্বসুদ্ধ দশ বারোজন যাত্রিক। মণিপদ্ম বজ্রকে চৈনিক বেশ পরাইয়া দিয়াছিল, যাহাতে তাহাকে সহজে কেহ চিনিতে না পারে; অঙ্গে চীনাংশুকের কষায়বর্ণ অঙ্গাবরণ জানু পর্যন্ত লম্বিত, মাথায় খুঁড়তোলা কানঢাকা শিরস্ত্রাণ।

যাত্রারম্ভ হইল। অগ্রে অশীতিপর শীলভদ্র দুইজন চৈন ভিক্ষুকে দুই পাশে লইয়া পদব্রজে চলিয়াছেন, তাঁহাদের পিছনে এক সারি ভিক্ষু। মাঝে চারিটি অশ্বতর দীর্ঘ পথের পাথেয় বহন করিয়া চলিয়াছে। চৈনিক শ্রমণদ্বয় বহু তালপত্রের পুঁথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন; সেগুলি দুইটি গর্দভের পৃষ্ঠে বাহিত হইতেছে। জন্তুগুলির পশ্চাতে মণিপদ্ম ও বজ্র তাহাদের তাড়না করিয়া লইয়া যাইতেছে। সর্বশেষে দুই সারি ভিক্ষু।

যাত্রিদল রাজপথ ধরিয়া উত্তর দিকে চলিল।

পথে সৈন্যদলের চলাচল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ পদাতিক সৈন্য, মাঝে মাঝে যূথবদ্ধ হস্তী অশ্ব বা রথ যাইতেছে। সকলের গতি কর্ণসুবর্ণের দিকে। কদাচিৎ বাতাবাহী একক অশ্বারোহী ঘোড়া ছুটাইয়া উত্তর মুখে যাইতেছে। তাহারা সকলে আপন আপন কর্মে ব্যগ্রনিবিষ্ট, পীতবাসধারী ভিক্ষুদের কেহ বিরক্ত করিল না।

মণিপদ্ম হ্রস্বকণ্ঠে বজ্রের সহিত নানা কথা বলিতে বলিতে চলিয়াছে। তাহার মুখে চোখে আনন্দ ক্ষরিত হইতেছে; সে যেন তাহার জীবনের চূড়ান্ত অভীপ্সা লাভ করিয়াছে, আর কিছু তাহার কাম্য নাই।

বজ্র চলিতে চলিতে নতমুখে শুনিতেছে, কিন্তু সব কথা শুনিতে পাইতেছে না। তাহার মন অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে দোল খাইতেছে। একদিকে বিম্বাধর বটেশ্বর কুহু শিখরিণী কোদণ্ড মিশ্র, অন্যদিকে মা গুঞ্জা চাতক ঠাকুর। এই দুইয়ের মাঝখানে যেন যুগান্তরের ব্যবধান। কতদিন হইল সে গ্রাম ছাড়িয়া

আসিয়াছে। এক মাস? এক বৎসর? দশ বৎসর? মাস বৎসর দিয়া এই সময়ের পরিমাপ হয় না। যখন আসিয়াছিল তখন তাহার মন ছিল শিশুর মত, আর এখন–?

সন্ধ্যার পূর্বে তাহারা বনের কিনারায় পৌঁছিল। পথের পশ্চিমে বন; এই বনের ভিতর দিয়া রত্তি ও মিত্তি তাহাকে পথ পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছিল। শীলভদ্র স্থির করিলেন এই স্থানেই রাত্রি যাপন করিবেন।

বন দেখিয়া বজ্রের মন অস্থির হইয়াছিল, সে শীলভদ্রের কাছে গিয়া বলিল— এই বন পার হয়ে আমি এসেছিলাম, আমার গ্রাম বনের পরপারে। যদি অনুমতি করেন এখনি যাত্রা করি।

শীলভদ্র জিজ্ঞাসা করিলেন— বন কত বড়?

বজ্র হিসাব করিয়া বলিল— এক দিনের পথ।

শীলভদ্র বলিলেন— তবে আজ রাত্রিটা আমাদের সঙ্গে থাকো। কাল সকালে যেও।

ভাগীরথীর তীরে একটি বৃক্ষতলে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হইল। ক্রমে সূর্য অস্ত গেল; আকাশে কৃশাঙ্গী চন্দ্রকলা দেখা দিয়াই অস্তমিত হইল। পথে সৈন্যদলের যাতায়াত থামিয়া গিয়াছে। বজ্র অশান্ত মন লইয়া রাজপথের এক প্রান্তে বসিয়া বনের পানে চাহিয়া রহিল।

রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হইলে বজ্র লক্ষ্য করিল, বনের গভীর অন্তর্দেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু দেখা যাইতেছে। সম্ভবত আলোক নয়, আগুন; অসংখ্য বৃক্ষকাণ্ডের অন্তরাল হইতে আলোকবিন্দু বলিয়া মনে হইতেছে। তারপর নিস্তব্ধ বাতাসে যেন অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ভাসিয়া আসিল। বজ্র অবহিত হইয়া শুনিল, আবার অশ্বের হ্রেষা শুনা গেল।

বজ্র গিয়া শীলভদ্রকে বলিল। শীলভদ্র বৃক্ষতলে বদ্ধাসন প্রস্তরমূর্তির ন্যায় উপবিষ্ট ছিলেন। অদূরে ভিক্ষুগণ চুল্লী জ্বালিয়া রাত্রির জন্য রন্ধন করিতেছিলেন, চুল্লীর চঞ্চল প্রভা তাঁহার অস্থিসার মুখের উপর সঞ্চরণ করিতেছিল। তিনি বজ্রের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন— বোধহয় একদল সৈন্য ওখানে লুকিয়ে আছে। কোন্ দলের সৈন্য বলা যায় না; জয়নাগের দলও হতে পারে, অপরপক্ষও হতে পারে। তা সে যে পক্ষই হোক, কাল তোমার বনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া হবে না। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে। আরও উত্তরে বন শেষ হয়ে মাঠ আরম্ভ হয়েছে। সেই মাঠ বোধহয় পশ্চিমে মৌরী নদীর তীরে গিয়ে শেষ হয়েছে। তুমি মাঠ ধরে পশ্চিমে গেলে গ্রামে পৌঁছতে পারবে।

রাত্রে বজ্ৰ ভাগীরথীর সৈকতে শয়ন করিয়া জ্যোতিঃচর্চিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে বিস্ময়াবিষ্ট চিন্তার ক্রিয়া চলিতে লাগিল—আজ আমি মুক্ত আকাশের তলে শুইয়া আছি। কাল রাত্রে ছিলাম রক্তমৃত্তিকার সংঘারামে। তার আগের রাত্রে কোথায় ছিলাম? সংঘের ঘাটে কুহুর সঙ্গে। তার আগের রাত্রে? কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে। তার আগে? রাজপুরীতে–! কি বিচিত্র সঙ্গতিহীন মানুষের জীবন!!

প্রাতে আবার যাত্রা আরম্ভ হইল।

তীব্র সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাত। পথ যতই উত্তরে যাইতেছে ততই জনবিরল হইতেছে। বজ্র আসিবার সময় যেমন দেখিয়াছিল তেমনি দেখিতে দেখিতে চলিল, ভাগীরথীর বুকে ছোট ছোট ডিঙা ও ভরা ভাসিতেছে, দুই একটা বহি পালের ভরে চলিয়াছে; নদীর উচ্চ পাড়ে গাঙ-শালিকের ঝাঁক কোটরের চারিপাশে কিচিমিচি করিতেছে; একটা সারস পাখি জলের কিনারায় নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া আছে। বজ্ৰ ভাবিল, এই কি সেই পাখিটা, যাইবার সময় যাহাকে দেখিয়াছিলাম? পাখিটা কি সেই অবধি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

বেলা দ্বিপ্রহরে যাত্রিদল বনের উত্তর প্রান্তে পৌঁছিলেন। বনের কোল হইতে মাঠ আরম্ভ হইয়াছে— সীমাহীন শ্যামলতা—কালবৈশাখীর অকালবর্ষণ তৃণগুলিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। বজ্র এই তৃণের বর্ণ দেখিয়া যেন চিনিতে পারিল ইহা তাহার গ্রামের গোচারণ মাঠের তৃণ! এই প্রান্তরের পরপারে তাহার একান্ত আপনার বেতসগ্রাম।

এই স্থানে সকলে মধ্যাহ্নের আহার সম্পন্ন করিলেন। তারপর বজ্র চৈনিক ছদ্মবেশ খুলিয়া নিজ বেশ পরিধান করিল; মণিপদ্মকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিল; শীলভদ্রের পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। শীলভদ্র তাহার স্কন্ধে হাত রাখিয়া স্নেহগম্ভীর স্বরে বলিলেন— বৎস, সংসারে ফিরে যাও, এখনও তোমার অনেক কাজ বাকি আছে। সংসারকে ভয় কোরো না, তাকে জয় কোরো। আর মহাকারুণিকৈর করুণার জন্য হৃদয়ের দ্বার সর্বদা খুলে রেখো। কখন তাঁর কৃপা আসবে কেউ জানে না; দেখো যেন এসে ফিরে না যায়।

সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়াছে। বজ্রের ক্লান্তি নাই, জনহীন প্রান্তর দিয়া যতই সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ততই তাহার অধীরতা বাড়িতেছে। ঐ বুঝি মাঠের সীমান্তে তাহার গ্রাম দেখা যায়! না—গ্রাম নয়, কয়েকটি ববুর বৃক্ষ সারি দিয়া দিগন্তরেখার উর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে।

সূর্যের প্রখর শুভ্রতা ক্রমে পীতাভ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাপের কিছুমাত্র হ্রাস নাই। বজ্রের সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে। ববুরশ্রেণীর বিরল ছায়াতলে ক্ষণেক বিশ্রাম করিলে অঙ্গের ঘাম শুকাইত, কিন্তু বজ্ৰ থামিতে পারিল না। গৃহের এত কাছে আসিয়া থামা যায় না।

আরও ক্রোশেক পথ চলিবার পর বজ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে দৃষ্টি পড়িল, দিগন্তের কাছে। সোনার সূতার মত কি যেন ঝিমিক্ করিতেছে। বজ্র নিস্পন্দ হইয়া চাহিয়া রহিল। ঐ আমার মৌরী নদী! এতক্ষণে দেখা দিয়াছে।

বজ্র দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ দৌড়িয়া থামিল, চক্ষু হইতে ঘর্ম কলুষ মুছিয়া আবার দেখিল। হাঁ, মৌরী নদীই বটে। কিন্তু গ্রাম কোথায়? বজ্ৰ নদীর রেখা অনুসরণ করিয়া উত্তর দিকে চক্ষু সঞ্চালন করিল। —একস্থানে উচ্চভূমি নদীর সুবর্ণসূত্রকে অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বেতসগ্রাম! কিন্তু গ্রামের মাথার উপর আকাশে যেন একটা কালো মেঘ স্থির হইয়া আছে। মেঘ? না ধূম?

বজ্র আবার ছুটিয়া চলিল।

মৌরী নদীর তীরে বেতসগ্রাম। কিন্তু গ্রাম আর চেনা যায় না। কুটিরগুলি একটিও নাই, তাহাদের স্থানে

এক স্তূপ করিয়া ভস্ম পড়িয়া আছে। ভস্মতূপ হইতে এখনও মৃদু ধূম উত্থিত হইতেছে। জীবন্ত মানুষ নাই, এখানে ওখানে কয়েকটা মৃতদেহ পড়িয়া আছে।

কাল প্রাতে হঠাৎ একদল সৈন্য আসিয়াছিল, সংখ্যায় প্রায় এক হাজার। পূর্বে ইহারা অগ্নিবর্মার সৈন্য ছিল, এখন যূথভ্রষ্ট নায়কহীনভাবে লুঠপাট করিয়া বেড়াইতেছে। গ্রামের লোক তাহাদের আসিতে দেখিয়া অধিকাংশই পলায়ন করিয়াছিল। সৈন্যগণ প্রায় নির্বিবাদে গ্রামের সঞ্চিত শস্যাদি লুঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তারপর কুটিরগুলিতে আগুন দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

আজ অপরাহ্নে ভস্মীভূত গ্রামের প্রান্তে দাঁড়াইয়া বজ্ৰ ক্ষণকালের জন্য পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। এ কি! এই তাহার বেতসগ্রাম! কেমন করিয়া এমন হইল! গ্রামের লোক সব কোথায়? মা কোথায়? গুঞ্জা কোথায়?

উন্মাদের মত বজ্র ভস্মচক্রের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইল আর মা মা বলিয়া চিৎকার করিল, কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। মৃতদেহগুলা সব পুরুষের। বজ্র একে একে তাহাদের চিনিল। গ্রামের মহত্তর। আরও দুইজন বৃদ্ধ, যাহারা পলাইতে পারে নাই। গ্রামের কর্মকার রাজীব, কুম্ভকার শ্রীদাম। একটি মৃতদেহ এমনভাবে পড়িয়া আছে যে তাহার মুখ দেখা যাইতেছে না; বজ্ৰ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে উল্টাইয়া দেখিল— মধু! যে-মধুর সহিত গুঞ্জার জন্য তাহার লড়াই হইয়াছিল, সেই মধু। মধু গ্রাম রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়াছে। বজ্র মধুর দুই বলিষ্ঠ বাহু ধরিয়া সবলে নাড়া দিতে দিতে বলিল— মধু! মধু! মা কোথায়? গুঞ্জা কোথায়?

মধুর নিকট হইতে উত্তর আসিল না। বজ্র কিছুক্ষণ মধুর মৃত মুখের পানে পাগলের মত চাহিয়া রহিল, তারপর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ কি জীবিত নাই? চাতক ঠাকুর! তিনি কোথায়? তিনি তো পলাইবার লোক নয়—

বজ্র দেবস্থানের অভিমুখে ছুটিল।

দেবস্থানে চাতক ঠাকুরের একচালা অক্ষত আছে। বজ্র প্রবেশ করিয়া দেখিল ঠাকুরের শুষ্ক শীর্ণ দেহ এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে; তাঁহার মাথায় ও দেহে রক্ত শুকাইয়া আছে। বজ্র তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া আর্তস্বরে ডাকিল— ঠাকুর! ঠাকুর।

ঠাকুরের দেহে তখনও প্রাণ ছিল, তিনি কোটরগত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। বজ্রকে দেখিয়া তাঁহার ওষ্ঠ একটু নড়িল—বজ্র এসেছিস! ওরা বেঁচে আছে— পলাশবনের মধ্যে!

এইটুকু বলিবার জন্যই তিনি বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহার মাথা বামদিকে হেলিয়া পড়িল, ক্ষীণ বক্ষস্পন্দন থামিয়া গেল।

সূর্য তখন পাটে বসিয়াছে। দিগন্তে শোণিতোৎসব চলিতেছে। রাক্ষসী বেলা।

বজ্র বনের দিকে ছুটিল। বনের আগে বাথান। বজ্র দেখিল, বাথানের আগড় খোলা; পূর্বে যেখানে শতাধিক গরু থাকিত সেখানে মাত্র গুটিকয় রহিয়াছে। অন্য গরুগুলি মাঠে চরিতে গিয়া আর ফিরিয়া আসে

নাই, রাখালের অভাবে বনে জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছে।

পলাশবনে প্রবেশ করিয়া বজ্র কোন দিকে যাইবে ভাবিয়া পাইল না। রাত্রির আসন্ন, অল্পক্ষণ পরেই অন্ধকার হইয়া যাইবে। কিন্তু চাতক ঠাকুর বলিয়াছেন, উহারা বাঁচিয়া আছে। বজ্র চিৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকিতে বনের একদিকে ছুটিল— মা! মা! গুঞ্জা! গুঞ্জা!

অবশেষে বহুদূর বনের মধ্যে গিয়া বজ্র ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে দাঁড়াইয়া পড়িল। দেহে আর শক্তি নাই, চিৎকার করিয়া ডাকিবার শক্তি নাই। এদিকে বন ছায়াচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, দূরে ভাল দেখা যায় না। বজ্রের অজ্ঞাতসারে চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। কী করিবে সে এখন? কোথায় তাহাদের খুঁজিয়া পাইবে? তাহারা কি আছে?

ও কী! বজ্র উচ্চকিত হইয়া চাহিল। দূর হইতে কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল–মধুমথন!…অস্পষ্ট ছায়া কুহেলির মধ্য দিয়া কে ঐ ছুটিয়া আসিতেছে—মুক্তবেণী প্রেতিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার পা দুটি যেন মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে না। গুঞ্জা!

বজ্রও পাগলের মত ছুটিল— কুঁচবরণ কন্যা।

মধুমথন।

দুইটা জ্বলন্ত উল্কা যেন পরস্পর সংঘৃষ্ট হইয়া এক হইয়া গেল।

–

গতকল্য ঊষাকালে চাতক ঠাকুর দক্ষিণের দহে পদ্মফুল তুলিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অতদূর যাইতে হইল না, পথেই তিনি দেখিলেন অসংখ্য অস্ত্রধারী পুরুষ নদী পার হইতেছে। মৌরী নদী এখানে অগভীর; কোথাও হাঁটু জল, কোথাও কোমর পর্যন্ত।

দেখিয়া চাতক ঠাকুর ছুটিতে ছুটিতে গ্রামে ফিরিলেন। গ্রামে সংবাদ রাষ্ট্র হইল। প্রথমে গ্রামবাসীরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল; ঠাকুর ঠিক দেখিয়াছেন তো? বুড়া মানুষ, হয়তো কি দেখিতে কি দেখিয়াছেন। কয়েকজন যুবক আগ বাড়িয়া দেখিতে গেল।

চাতক ঠাকুর রঙ্গনার কুটিরে গিয়া বলিলেন— রাঙা বৌ, গ্রামে দসুয আসছে, তোমরা এই বেলা পালাও, নইলে পরে আর পালাতে পারবে না। যা পারো সঙ্গে নিয়ে যাও, পলাশবনের মধ্যে লুকিয়ে থাকো। আমি এদিকে রইলাম, যদি ভালয় ভালয় বিপদ কেটে যায়, তোমাদের ডেকে আনব।

ওদিকে যাহারা দেখিতে গিয়াছিল তাহারা একদণ্ড পরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরিয়া আসিল। গ্রামে ভয়ার্ত হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। মেয়েরা যে যেদিকে পাইল পলাইতে লাগিল; পুরুষেরাও তাহাদের পিছু লইল। ছেলে বুড়া স্ত্রী পুরুষ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতে শুরু করিল। দুই চারিজন বেতসকুঞ্জে লুকাইল; অনেকে নদী সাঁতরাইয়া পরপারে চলিয়া গেল।

কেবল মুষ্টিমেয় পুরুষ গ্রাম ছাড়িল না, লাঠি ভল্ল মুদগর যাহা পাইল হাতে লইয়া দাঁড়াইল। চিরদিনই পৃথিবীতে এক জাতীয় লোক আছে যাহারা নিজের বিপদ চিন্তা করে না; মৃতুয নিশ্চয় জানিয়াও রুখিয়া দাঁড়ায়। অকারণে বা তুচ্ছ কারণে মৃতুয বরণ করিয়া তাহারা চিরঞ্জীব হইয়া আছে। তাহাদের লইয়া কোনও কবি মহাকাব্য লেখেন নাই; তাহারা যুগে যুগে মৃতুযঞ্জয়, তাই তাহাদের লইয়া মহাকাব্য লেখার প্রয়োজন হয় না।

মার মার শ্বদ করিয়া দসুযদল গ্রামে প্রবেশ করিল। ক্ষুধাক্ষিপ্ত সশস্ত্র জনতা; যুক্তিহীন, বিবেকহীন; আপন উদগ্র প্রয়োজন ছাড়া তাহারা কিছুই বোঝে না। সম্মুখে কয়েকজন অস্ত্রধারী পুরুষ দেখিয়া হিংস্র

তরঙ্কুপালের মত তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল; প্রত্যেক গ্রামবাসীকে পঞ্চাশজন দস্যু আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধের প্রহসন অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, গ্রামের সকলেই মরিল। কেবল চাতক ঠাকুর নিরস্ত্র ছিলেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ মরিলেন না, মরণাহত হইয়া পড়িয়া রহিলেন, তারপর অতিকষ্টে দেবস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

দস্যুগণ গ্রামে সঞ্চিত সমস্ত খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া কুটিরগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিল। আপন দুষ্কৃতির চিহ্ন আগুন দিয়া মুছিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

পলাশবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র স্থান ঘন তরুশ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এত ঘন এই তরুবেষ্টন যে রাত্রিকালে আগুন জ্বালিলে বাহির হইতে দেখা যায় না।

আজ এই স্থানে আগুন জ্বলিতেছিল। চুল্লীর আগুন; তিনটি প্রস্তর খণ্ডের মাঝখানে থাকিয়া কচিৎ শিখা-প্রক্ষেপ করিয়া জ্বলিতেছিল। চুল্লীর উপর মৃৎপাত্রে অন্ন সিদ্ধ হইতেছে, তাই কোনও দিক দিয়াই আগুন বাহির হইতে পারিতেছিল না, পিঞ্জরাবদ্ধ বন্দীর মত ছিদ্রপথে অঙ্গুলি বাহির করিয়া আবার টানিয়া লইতেছিল।

আবদ্ধ আগুনের শিখায় স্থানটি অস্পষ্টভাবে আলোকিত। বৃক্ষের কাণ্ডগুলি স্তম্ভের মত ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে, ইহারাই যেন এই বনগৃহের প্রাচীর।

বনগৃহে দুইটি মানুষ রহিয়াছে। ইহাদের দেখিয়া সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে হয় না; যেন ইহারা কোন্ অবাস্তব স্বপ্নলোকের অধিবাসী। এই মানুষ দুটি রঙ্গনা ও মানব। দস্যুর আক্রমণে পলাইয়া আসিয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছে।

রঙ্গনা উনানের উপর নত হইয়া হাঁড়িতে কাঠি দিতেছে। তাহার মুখের উপর মুগ্ধ আলোর খেলা। মুখখানি তেমনি মধুরসুন্দর, কিন্তু যেন ইহলোকের নয়, পরীরাজ্যের স্বপ্নাতুর মুখ, রূপকথার বিস্ময়মুকুলিত মুখ। রঙ্গনার দেহ-মন যেন বাস্তবতোক ছাড়িয়া কল্পলোকে চলিয়া গিয়াছে।

মানব কিছুদূরে একটা গাছের স্তম্ভে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে ভাল দেখা যাইতেছে; দেহের অস্থিপঞ্জরের উপর অস্পষ্ট আলোক ক্রীড়া করিতেছে; দীর্ঘ রুক্ষ চুল মুখের উপর। পড়িয়া মুখের অধিকাংশ ঢাকিয়া দিয়াছে। মানব স্থির হইয়া বসিয়া আছে, নড়িতেছে না। যেন উৎকর্ণ হইয়া কিছু শুনিবার যত্ন করিতেছে।

রাঙা!

রঙ্গনা মানবের পাশে গিয়া বসিল, একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল। মানব তাহার একটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে লইল, বলিল— গুঞ্জা অনেকক্ষণ জল আনতে গেছে, এখনও ফিরল না কেন?

রঙ্গনা বলিল—এখনি ফিরবে। নদী তত কাছে নয়।

ভাবনা হচ্ছে।

তুমি ভেব না। গুঞ্জা এল বলে।

খুব অন্ধকার হয়ে গেছে কি?

হ্যাঁ। কিন্তু গুঞ্জা পথ চেনে।

দুইজন কিছুক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া নিশ্চল বসিয়া রহিল। তারপর মানব কথা কহিলবজ্র যদি ফিরে আসে, সে কি করে জানবে আমরা বনে লুকিয়ে আছি?

রঙ্গনার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল—চাতক ঠাকুর আছেন।

চাতক ঠাকুর কি আছেন? থাকলে আমাদের খবর নিতেন না?

সহসা মানব খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল, একাগ্র হইয়া শুনিল। বলিল— কারা আসছে! দুজন—

পদধ্বনি রঙ্গনা শুনিতে পায় নাই। সে সত্রাসে নতজানু হইয়া মানবকে দুই বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া লইল। এবার মানব তাহাকে আশ্বাস দিল ভয় পেও না। হয়তো গুঞ্জা আর চাতক ঠাকুর

কয়েকটা স্পন্দিত মুহূর্ত কাটিয়া গেল। যাহারা আসিতেছে তাহাদের পদশব্দ এখন স্পষ্ট শুনা যাইতেছে। তারপর গুঞ্জা আর বজ্র তরুস্তম্ভের আড়াল হইতে আলোকচক্রের মধ্যে প্রবেশ করিল। গুঞ্জার বাষ্পোচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল— মা, দেখ কে এসেছে!

তীরবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় রঙ্গনা উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর অশ্রুবিকৃত স্বরে নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া গিয়া পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল।

রঙ্গনার সুদীর্ঘ প্রতীক্ষ্ণ এতদিনে শেষ হইল।

মাতাপুত্র কিছুক্ষণের জন্য জগৎ ভুলিয়া গেল। ক্রমে বজ্রের কর্ণে একটি কণ্ঠস্বর বারবার প্রবেশ করিয়া তাহাকে সচেতন করিয়া তুলিল— বজ্র! পুত্র! পুত্র!

পুরুষের কণ্ঠস্বর, গভীর আবেগে অবরুদ্ধ। বজ্র চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল তরুতলের অস্পষ্ট ছায়ায় এক দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। দুই বাহু বাড়াইয়া ভগ্নস্বরে ডাকিতেছে—পুত্র! পুত্র!

বজ্র মাতার দেহ এক হাতে জড়াইয়া পুরুষের দিকে অগ্রসর হইল। কাছে গিয়া চিনিতে পারিল, এ সেই অন্ধ ভিক্ষুক, যাহাকে সে কর্ণসুবর্ণ যাত্রার পথে বনের অন্তিকে দেখিয়াছিল। ভিক্ষুকের অক্ষি-কোটর হইতে অশ্রু বিগলিত হইয়া পড়িতেছে।

বজ্রের কণ্ঠেও প্রবল বাষ্পোচ্ছাস উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। সে ব্যাকুল চক্ষে মায়ের পানে চাহিয়া বলিল— এ কে?

রঙ্গনা কম্পিত অধরে অস্ফুট স্বরে বলিল—তোমার পিতা-মহারাজ মানবদেব।

বজ্রের সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সে নতজানু হইয়া পিতার জানু আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সে রাত্রে চারিজনের কেহই ঘুমাইল না, চুল্লীর আগুনের প্রভায় পরস্পর হাত ধরিয়া জাগিয়া রহিল; যে হারানিধি তাহারা ফিরিয়া পাইয়াছে তাহা আবার হারাইয়া না যায়। অতীত আতঙ্কের স্মৃতি, বর্তমানের পরিপূর্ণতা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা মিলিয়া চারিটি হৃদয়কে এক করিয়া দিল।

বজ্র তাহার কর্ণসুবর্ণ প্রবাসের কাহিনী বলিল। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে বলিল, যেন কেহ আঘাত পায়। শুনিয়া মানব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল— আমার পুত্র গৌড়ের সিংহাসনে বসেছে হোক একদিনের জন্য আমার আর দুঃখ নেই। কিন্তু আর্য শীলভদ্র যথার্থ বলেছেন, আজ থেকে ওকথা ভুলে যেতে হবে। আমরা গৌড়দেশের সামান্য গ্রামবাসী, এই আমাদের পরিচয়। আমাদের রক্ত জনসাধারণের রক্তের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে, এই আমাদের গৌরব। রাজৈশ্বর্য চিরন্তন নয়, মনুষ্যত্ব চিরন্তন। আমাদের নাম লোকে ভুলে যাক ক্ষতি নেই, আমাদের মনুষ্যত্ব যেন যুগ-যুগান্তর ধরে গৌড়বঙ্গের অন্তরে বেঁচে থাকে।

তারপর মানব আপন কাহিনী বলিল। দীর্ঘ বিংশ বৎসরের কাহিনী। একটা মানুষ কী দুঃসহ দুঃখভোগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহারই ইতিহাস।

রঙ্গনাকে ফিরিয়া আসিবার আশ্বাস দিয়া মানব কর্ণসুবর্ণে উপনীত হইল। রাজধানী রক্ষার জন্য নূতন সৈন্যদল গঠন করিবার পূর্বেই ভাস্করবর্মা বিজয়ী সেনাদল লইয়া কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করিলেন। নগর রক্ষা হইল না। মানব রাজপুরী সুরক্ষিত করিয়া শেষবার যুদ্ধ করিল।

ভাস্করবর্মা দুই দিন রাজপুরী অবরোধ করিয়া তৃতীয় দিনে নদীর ঘাটের পথে পুরীতে প্রবেশ করিলেন। পুরী অধিকৃত হইল; মানব রক্তাক্ত কলেবরে যুদ্ধ করিতে করিতে বন্দী হইল।

মানব যদি যুদ্ধে মরিত তাহা হইলে ভাস্করবর্মা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু সে জীবন্ত বন্দী হইয়া ভাস্করবর্মাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। পরাজিত শত্রু-রাজাকে হত্যা করা রাজধর্ম নয়, তাহাতে সকল রাজার জীবনই সংশয়ময় হইয়া পড়ে। অথচ শত্রুর শেষ রাখিতে নাই। ভাস্করবর্মা এক কূটকৌশল অবলম্বন করিলেন। গভীর রাত্রে মানবের চক্ষু অন্ধ করিয়া তাহাকে প্রাকার হইতে ভাগীরথীর জলে নিক্ষেপ করা হইল। প্রকাশ্যে রটনা করা হইল, যুদ্ধকালে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তির ফলে মানবের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকৃত তত্ত্ব চারি পাঁচজন ব্যতীত কেহ জানিল না।

অন্ধ অবস্থায় ক্ষতবিক্ষত দেহে নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও মানব মরিল না। একদল বেদিয়া ভেলায় নদীপার হইতেছিল, তাহারা সন্তরমান মানবকে তুলিয়া লইল।

ভাগীরথীর পূর্বতীরে বন-বাদাড়ের মধ্যে বেদিয়ারা কিছুদিনের জন্য ডেরাডাণ্ডা ফেলিল। তাহাদের যত্ন ও শুশ্রুষায় মানবের দেহত জোড়া লাগিল। সে সারিয়া উঠিয়া বিপদের বন্ধু বেদিয়াদের নিকট আত্ম-পরিচয়

প্রকাশ করিল।

পরিচয় শুনিয়া বেদিয়ারা ভয় পাইয়া গেল। তাহারা অতি দীনপ্রকৃতি, সকল সমাজের অপাংক্তেয়, রাষ্ট্রনীতি-ঘটিত কোনও ব্যাপারে তাহারা থাকে না। তাহারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া মানবকে স্নানের ছলে গঙ্গাতীরে লইয়া গেল এবং উচ্চ পাড় হইতে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। *

অন্ধ মানব ভাগীরথীর স্রোতে ভাসিয়া চলিল। সমস্ত দিন ভাসিয়া চলিবার পর সন্ধ্যার সময় অর্ধমৃত অবস্থায় সে কূল পাইল। বহুদূর দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহারই ঘাটে সারারাত্রি পড়িয়া রহিল।

পরদিন হইতে মানবের দীর্ঘ পরিব্রজন আরম্ভ হইল। যষ্টি হস্তে অন্ধ ভিক্ষুক দেশে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কত নদী পার হইয়া কত রাজ্যে গেল, বঙ্গাল, সমতট, পুন্ড্রবর্ধন, প্ৰাগজ্যোতিষ। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বারবার ফিরিয়া আসিল। কিন্তু মানবের প্রব্রজ্যা শেষ হইল না।

মানব একবার যে ভুল করিয়াছিল তাহা আর দ্বিতীয়বার করিল না, কাহাকেও নিজের পরিচয় দিল না। এখন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বেতসগ্রামে ফিরিয়া আসা।

সে সসংকোচে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করিত—ভাই, বেতসগ্রাম কত দূর? কিন্তু বেতসগ্রামের উদ্দেশ কেহ দিতে পারিত না। অন্ধ ভিক্ষুককে অনেকেই দয়া করিত; কেহ অন্ন দিত, কেহ ছিন্ন কন্থা দান করিত, কিন্তু বেতসগ্রামের সন্ধান কেহ দিতে পারিত না। মানব অধিক প্রশ্ন করিতেও সাহস করিত না। কি জানি যদি কিছু সন্দেহ করে!

এইভাবে বিশ বছর কাটিয়াছে। ভাগীরথী যে কতবার মানব পারাপার করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দণ্ডভুক্তি বর্ধমানভুক্তি কঙ্কগ্রামভুক্তি, সর্বত্র সে বিচরণ করিয়াছ, কিন্তু বেতসগ্রামের সন্ধান পায় নাই।

তারপর একদিন নদীতটে বজ্রের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। বজ্র তাহাকে নিজ অন্নের ভাগ দিল, বেতসগ্রামের পথ দেখাইয়া দিল—

বিশ বছর পরে রঙ্গনার নিকট মানবের শপথ উদযাপন হইল।

রঙ্গনা এ কাহিনী পূর্বে শুনিয়াছিল, দ্বিতীয়বার শুনিয়া তাহার চোখে আবার অশ্রুর নীরব ধারা নামিল। কাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিল না; চারিজন একসঙ্গে কাঁদিল।

পরিশিষ্ট

পরদিন বজ্র চাতক ঠাকুরের দেহ মৌরীর তীরে দাহ করিল। শুদ্ধ শান্ত নিরীহ ঠাকুরের দেহ ভস্ম হইয়া গৌড়বঙ্গের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল।

বাকি দেহগুলি মৌরীর জলে বিসর্জন দিতে হইল। সকলকে দাহ করিবার মত ইন্ধন নাই।

তারপর তাহাদের নূতন জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। নূতন জীবনযাত্রার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নাই; পুরাতন রথের যে চক্ৰ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাহাই সংস্কৃত হইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সেই পথ, সেই রথ। পুরাতনের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন হইল না।

দস্যুর ভয়ে যাহারা পলাইয়াছিল তাহার কেহ কেহ ফিরিয়া আসিল, কিন্তু ভস্মাবশেষ গ্রামের অবস্থা দেখিয়া অধিকাংশই আবার চলিয়া গেল। দুই চারিজন রহিল।

বজ্র পুরাতন গৃহের ভিত্তি পরিষ্কার করিয়া আবার কুটির বাঁধিল। পূর্বে দুইজনের উপযোগী কুটির ছিল, এখন চারিজনের উপযোগী কুটির হইল। রঙ্গনা নদী হইতে জল আনিয়া মাটিতে ঢালিয়া কাদা করিল, অন্ধ মানব পা দিয়া কাদা দুলিয়া পিণ্ড করিল; গুঞ্জা বেতসবন হইতে বেতের চঞ্চারী কাটিয়া আনিয়া দিল। সকলে মিলিয়া কুটির নির্মাণ করিল।

বর্ষা নামিল। ধান্য ও ইক্ষুর ক্ষেত্র আদ্র্র হইয়া নূতন শস্য উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু কে বপন করিবে? বীজ কোথায়? গুঞ্জা অতি যত্নে কয়েক মুঠি ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, বজ্র তাহাই ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিল। যে কয়টি গাভী বাথানে অবশিষ্ট আছে তাহাদের দুগ্ধই এখন এই কয়টি প্রাণীর প্রধান আহার্য-পানীয়।

বর্ষা কাটিয়া শরৎ আসিল। ধানের শীষ লক্ লক্ করিয়া বাড়িতে লাগিল। ইক্ষুক্ষেত্রে পুরাতন মূল হইতে আপনি অঙ্কুর বাহির হইল।

বজ্র বনে গিয়া হরিণ ময়ূর শিকার করিয়া আনে; সুযোগ পাইলে গুঞ্জা তাহার সঙ্গে যায়। রঙ্গনা আর মানব কুটির-দেহলিতে হাত-ধরাধরি করিয়া বসিয়া থাকে। মানব রঙ্গনার মুখ অঙ্গুলি বুলাইয়া অনুভব করে, তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে।

কর্মহীন মধ্যাহ্নে বজ্র বেতসকুঞ্জে গিয়া একাকী শুইয়া থাকে। অতীতের কথা ভাবে। কি বিচিত্র এই জীবন! কখনও নিষ্কম্প নিস্তরঙ্গ, কখনও উত্তাল তরঙ্গসংকুল।...কুহু এখন কী করিতেছে?...রানী শিখরিণীর কি পরিণাম হইল?...আর্য শীলভদ্র ও বন্ধু মণিপদ্ম কি এতদিনে নালন্দায় পৌঁছিয়াছেন;...তাহার দিবাস্বপ্ন শেষ হইতে পাইত না। গুঞ্জা আসিয়া তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত; গদগদ কণ্ঠে বলিত—আমাদের চেয়ে সুখী আর কি কেউ আছে?

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা। পথ এখনও শেষ হয় নাই। হে চির-সারথি, যে-পথে তোমার রথ লইয়া চলিয়াছ কোথাও কি তাহার শেষ আছে?

---

* গোপা বেদেনীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া মরিয়াছিল।

সমাপ্ত

বইটি ভাল লাগলে অবশ্যই কিনবেন

অথবা

অন্যকে উপহার দিবেন

Table of Contents